৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪২৫

স্যুইৎজারল্যান্ডের এঙ্গেলবার্গ গ্রামে প্যারাগ্লাইডিং - আলোকচিত্রী শ্রীমতী সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

☐ ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২৫ ~

পরণে সবুজ শাড়ি আর ব্লাউজ। মাজা মাজা গায়ের রঙ। বয়স সত্তরের আশপাশে হবে। প্রায় সাদা হয়ে যাওয়া চুল পরিচ্ছন্ন করে পিছনে বাঁধা, দুদিকে কানের পাশে বড় কালো ক্লিপ দিয়ে আটকানো। মুখে সর্বদাই হাসি লেগে রয়েছে। চোখ দুটো হাসছে যেন সর্বক্ষণ। স্বচ্ছন্দ হিন্দি বলছেন। নিজেই বললেন, জেন্ডার-এ গন্ডগোল হয়, তবে চলে যায়। মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে সাত ঘন্টার দূরত্বে এক গ্রামে বাড়ি। ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে এসেছেন। বাহাত্তর জনের দলে গ্যাংটক, দার্জিলিং ঘুরে এখন কলকাতায় যাচ্ছেন - এনজেপি থেকে রাতের পদাতিক এক্সপ্রেসের স্লিপার কোচে। নিজের পরিবার থেকে তিনি একাই - আমাদের কামরাতেও তাই। সঙ্গীদের টিকেট অন্য অন্য কামরায় পড়েছে। কথায় কথায় মনে হল স্বামী-পুত্র হয়তো মারা গেছেন। তবে পথেই আপনজন গড়ে নিচ্ছেন অনায়াস গল্প করার ঢং-এ। সাইড লোয়ার বার্থে মুখোমুখি বসা মালদার বাসিন্দা অল্পবয়স্ক ছেলেটি ফোনে তাঁর নম্বর সেভ করে 'আন্টি মাদ্রাজ' নামে। বলে, কাল ফোন করব কিন্তু আন্টি।

ঊনআশি সালে একবার ছেলের চাকরির সূত্রে শিলিগুড়ি এসেছিলেন। তখন পঞ্চাশ টাকা ঘরভাড়া। কিন্তু সেই ঘরে এই এত বড় বড় 'কিড়া' ছিল - আঙুলে মাপ দেখান। সেই ভয়ে কদিন বাদেই পালিয়ে গেছিলেন। সেবারেও দার্জিলিং এসেছিলেন, কিন্তু এখন আর ভালো করে মনে নেই সেকথা।

তবে ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে ঘোরা মানে তো ওই কোথাও নিয়ে গিয়ে এক দুই তিন চার এই এই দেখো ব্যস, হয়ে গেল - আঙুল নাড়িয়ে দেখান তিনি। বারো হাজার টাকা নিয়েছিল। তারপর খাওয়া খরচ এটা ওটা সব আলাদা, কুড়ি হাজার পেরিয়ে গেছে। বলছেন, কিন্তু সবই হাসিমুখে।

হাতের কাছে একটা ব্যাগ। ওরই থেকে বেরোচ্ছে চাদর কিম্বা টুকিটাকি খাবার। আর সিটের নীচে আরেকটা ব্যাগ। সাইড লোয়ারে একটু কাত হয়ে ঠেসান দিয়ে বসে কখনও বাঙালি সহযাত্রীর সঙ্গে হিন্দিতে, আবার কখনওবা নিজের দলের কেউ দেখা করতে এলে তামিলে গল্প করে যাচ্ছেন।

আর আমি দেখছিলাম এক চিরন্তন ভ্রমণকারীকে ওই মাদ্রাজিনীর মধ্যে।

চরৈবেতি...

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"রাত্রি থাকিতেই জাগিয়াছি। আমরা তিনটী মহিলা খুব পুরু কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া একটু দূরবর্ত্তী উচ্চশৃঙ্গে চলিলাম। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোল আমাদের শরীর মনে যেন নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিল। যে অভিনব দৃশ্য সম্মুখে বিরাজমান, তাহা দেখিতে দেখিতে সত্যই আপনাকে ভুলিতেছি। এ অতুলনীয় দৃশ্যের এক কণাও চিত্রিত করা ভাষার সাধ্য নহে।"

- শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসুর কলমে "বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ"

"যদি একটা গাড়ি লগে-লগেই থাকে তবে একবারে সিমলা থেকে মানালি ঘুরে রোহ্‌তাং ঘুরে সোলাং ঘুরে বশিষ্ঠ ঘুরে হিড়িম্বা-মনু-মণিকরণ-নগ্‌গর-কুলু সমস্তটা ঘুরে, একরাত মান্ডিতে কাটিয়ে সোওজা কালকা পৌঁছে যাওয়া যাবে, সুবিধাও হবেক আর সস্তাও হবেক মনে হয়। এই ধরনের প্রি-ডমিনেন্ট 'মনে হওয়া'কে সাইডে রেখে সিমলা-মানালি আসুন, কেননা খোড়া খোড়া করে আরও অনেক অ্যাডজাস্ট করা বাকি এখনও!"
কাঞ্চন সেনগুপ্তের হিমাচল ভ্রমণকাহিনি "খোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে"-র দ্বিতীয় পর্ব

~ আরশিনগর ~

শিলাইদহ থেকে সাগরদাঁড়ি
- শীলা চক্রবর্তী

আহালদাড়ায় একবেলা - সঞ্চারী সরকার

~ সব পেয়েছির দেশ ~

হামটা পাসের হাতছানি
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনায় মোড়া দেশ – শরণ্যা ব্যানার্জী

অথঃ ভুবনেশ্বরকথা – তপন পাল

মিজোরামে নতুন বছর – সুবীর কুমার রায়

~ ভুবনডাঙা ~

জুরিখ থেকে আল্পসের তিত্‌লিস হিমবাহে – সুদীপা দাস ভট্টাচার্য

~ শেষ পাতা ~

স্মৃতির ম্যাকলাস্কিগঞ্জ – আশুতোষ ভট্টাচার্য

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 18 **AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu**

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

[উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত বামাবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা স্বর্ণপ্রভা বসু (১৮৬৯-১৯১৮) কবিতা ও গদ্য লেখার পাশাপাশি লিখেছেন ভ্রমণকাহিনিও। লিখতেন ছোটদের 'মুকুল' পত্রিকাতেও। ভগবানচন্দ্র বসু ও বামাসুন্দরী দেবীর বড় মেয়ে স্বর্ণপ্রভা ছিলেন বাংলার প্রথম যুগের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই লজ্জাবতী লতা হাত দিলে এমন নুইয়ে পড়ে কেন তা লক্ষ্য করান তাঁর ভাই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে। শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিক ও সমাজসংস্কারক স্বামী আনন্দমোহন বসুর সবরকম কাজেকর্মে পাশে থেকেছেন চিরকাল।

আজকের বাঙালি পর্বতপ্রেমীদের পাহাড়ে চড়ার হাতেখড়ি হয় সান্দাকফু-ফালুট ট্রেকিং দিয়ে, এখানে রইল প্রায় একশো কুড়ি বছর আগের 'ছন্দকফ-ফেলুট' ভ্রমণের গল্প। লক্ষণীয় যে ভোরের 'তরুণ অরুণ-আভায়' এভারেস্ট শৃঙ্গের রাঙিয়ে ওঠার কথা বললেও কাঞ্চনজঙ্ঘার বিষয়ে আলাদা করে উল্লেখ করেননি লেখিকা।]

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

২৩এ নবেম্বর, ১৮৯১ সাল

মানুষের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না - যত পায়, তত চায়। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। পূর্ব্বে এক মাস কাল দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গসুখ মনে হইত। এবার ৭ মাস স্বভাবের ক্রীড়াভূমি হিমালয় শিখরে বাস করিতেছি, তথাপি আরও ৫০০০ হাজার ফিট উচ্চ ফেলুট সৃঙ্গে যাইবার জন্য মন নিতান্ত ব্যগ্র হইল। বন্ধুগনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কেবল যে বিফল-মনোরথ হইলা, তাহা নয়; তাঁহারা যতদূর সম্ভব, আমার উৎসাহ-প্রদীপ্ত হৃদয়ে নিরাশার শীতল জল নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। পথের ভীষণ দুর্গমতার কথা শুনিয়া নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, ব্যগ্রতা আরও প্রবল হইল। ৩টী ইংরেজ মহিলা সহযাত্রী জুটিলেন। গোপনে যাত্রার উপযোগী আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। ক্রমে দুইটী ভদ্রলোক ও একটী স্বদেশীয়া মহিলাও আমাদের দলভুক্ত হইলেন। হৃদয়ের অদম্য উৎসাহ-স্রোত স্থানে স্থানে অনেক বাধা পাইল। ফেলুট যাইবার পথে ২টী ডাক বাঙ্গলা আছে। যাত্রীদিগকে তথায় রাত্রিবাসের অধিকার লাভের জন্য পূর্ব্বেই টাকা জমা দিয়া পাস গ্রহন করিতে হয়। আমরা পাস লইতে যাইয়া শুনিলাম, রুষিয়ার মহাসম্ভ্রান্তবংশীয় দুইজন ব্যারণ ও কাউন্ট ইতিপূর্ব্বেই ৭ দিনের জন্য বাঙ্গলা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। দুঃখের সহিত যাত্রার দিন পরিবর্ত্তন করিলাম। এ ঘটনা আমাদিগের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল বলিতে হইবে, কারন দুই দিনের মধ্যে বড় বৃষ্টি হইয়া আকাশ অতি পরিষ্কার হইল। প্রকৃতি যাত্রার জন্য আমাদিগকে যেন সাদরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২২এ নবেম্বর সোমবার যাত্রার দিন নিশ্চিত হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে আমরা কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ হইলাম। ১ম, একজনের আদেশে সকলকে চলিতে হইবে। ২য়, পথের সুবিধা অসুবিধার জন্য কেহ কাহাকে দোষ দিতে পারিবেন না; পথে যে কষ্ট ঘটে, সকলে অম্লানবদনে বহন করিবেন। ৩য়, প্রত্যেকে নিজ নিজ আহারীয় ও শীতবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইয়া যাত্রা করিবেন। ২২এ নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময়ে উঠিয়া প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুপ্রভাত দেখা দিল। অদূরে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে বালসূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেন আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আহারাদি সমাধা করিয়া প্রস্তুত হইলাম। সহযাত্রিগণের দোষে যাত্রা করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। আহারীয় দ্রব্য ও শীতবস্ত্র যত পারিলাম, সঙ্গে লইতে ত্রুটি করিলাম না। প্রচণ্ড শীতের যে বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে এক এক বার ভয় হইল, পাছে বা হিমে জমাট হইয়া যাই। জুতার ভিতর তূলা পুরিয়া পরিলাম, সমস্ত ঠিক্ হইল; তবু ডাণ্ডিওয়ালাদিগের দেখা নাই। (যাঁহারা দার্জ্জিলিং না গিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, এ শ্রেণীর লোকগুলি কি অদ্ভুত জীব)। আমরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। উৎসাহের বেগে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিলাম, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হইল না। এমন সময়ে আমাদের বন্ধু ডাণ্ডিওয়ালাগণ দেখা দিল। তাহাদের অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর না করিয়া আমরা রওনা হইয়াছি দেখিয়া সকলেই একটু বিনীতভাব ধরিয়াছিল। আজ যে পথ দিয়া চলিতেছি, তাহা কোন মতেই দুর্গম বলিতে পারি না। আমাদের দলটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ৬টী ঘোড়া, ৯টী ভদ্রপুরুষ মহিলা এবং ২৫ জন সহিস, ঘাসিয়াড় ও ডাণ্ডিওয়ালা লইয়া চলিয়াছি। পাহাড়ী লোকেরা এ নাতিক্ষুদ্র দলটী ভাল করিয়া দেখিবার আশায় কুটীর ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরাও শ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় কখন কখন আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। স্বভাবের কি মনোহর দৃশ্য! এমন নীল আকাশ আর কখনও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। ইচ্ছা হয়, এখানেই থাকিয়া যাই। অদূরে উচ্চ নীলবর্ণ গিরিমালা প্রাচীরশ্রেণীর ন্যায় ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া যেন আকাশ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। প্রকৃতির এই ক্রীড়াভূমিতে বসিয়া সেই মহান্ শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশল চিন্তা করিতে করিতে এ ক্ষুদ্র মন অনন্তভাবে ডুবিয়া যাইতেছে। বেলা প্রায় ৩-৩০ সময়ে আমাদের প্রথম বিশ্রাম-স্থান সুখিয়াপুখরী পঁহুছিলাম।

স্থানটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষপূর্ণ, তাহার ছায়ায় তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্রামগৃহটী এত ক্ষুদ্র যে, কি করিয়া এতগুলি লোকের স্থান সমাবেশ হইবে, ভাবিতে পারি না। তথাপি এ গৃহটীতে মাথা রাখিবার স্থান পাইয়াই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি। একটু বিশ্রামের পর রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহার শেষ করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। ঘন বৃক্ষশ্রেণী ছাড়া দ্রষ্টব্য আর কিছুই নাই। রাত্রিতে আমরা ৬টী মহিলা এমন ভাবে শয়ন করিলাম যে পায়ে দেওয়াল ঠেকিল। ৩টী ভদ্রলোক অনেক কষ্টে পাশের একটী ঘরে কোনমতে স্থান করিয়া লইলেন। আজকার দিনত বেশ উৎসাহে কাটিল।

২৪ নবেম্বর

রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া প্রস্তুত হইতেছি। আজ বড় দুর্গম পথ - ১৮ মাইল দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আশ্রয়-স্থান ডাক বাঙ্গলায় পঁহুছিতে হইবে যত শীঘ্র পারি, একটু চা পান করিয়া মধ্যাহ্নের আহার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। শীতের প্রকোপে ডাণ্ডিতে বসিয়া যাওয়া অসাধ্য। হাত, পা একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে বোধ হইল। ডাণ্ডি হইতে নামিয়া অতি দ্রুত চলিলাম। প্রায় এক মাইল হাঁটিবার পর শরীর একটু গরম বোধ হইল। ক্রমাগত উপরে উঠিতেছি বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমাদের সহযাত্রী একটী ইংরেজ মহিলার উৎসাহের সীমা নাই। তিনি সকলের অগ্রে দৌড়িতেছেন এবং ফেলুট পঁহুছন পৃথিবীর মধ্যে অতি সহজ-সাধ্য কাজ বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে।

ক্রমে আমরা ইংরেজ ও নেপাল রাজ্যের সন্ধিস্থলে পঁহুছিলাম। অদূরবর্ত্তী স্তম্ভগুলি ইংরেজ অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা ইংরেজ রাজ্য ছাড়িয়া নেপালের সীমাস্থিত একটা পাহাড়ে উঠিয়া নেপাল রাজ্য দেখিতে পাইলাম। ঐখানে বসিয়াই মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে ডিম ও দুগ্ধ পাইয়া অতি আহ্লাদের সহিত ক্রয় করিলাম।

অর্দ্ধ ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করিলাম। এবার পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবরোহণ করিতে হইবে। উপরে উঠা অপেক্ষা নিম্নাবতরণ কষ্টকর ও বিপদ্‌জনক। ঘোরতর জঙ্গলের অভ্যন্তরে সঙ্কীর্ণ পথ। এখানে সূর্য-কিরণ কোন দিন প্রবেশ করিয়াছে, বোধ হয় না। পথের পাশে ভয়ঙ্কর খাদ, চাহিতে ভয় হয়। একটি গড়াইলে কোথায় যাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িব, ঠিক্ নাই। ঘোড়াগুলি স্বাভাবিক সংস্কারের অধীন হইয়া কেমন পা টিপিয়া টিপিয়া নামিতেছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমরাও অতি সন্তর্পণে চলিতেছি। জোঁকের যে ভয়ানক বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই অধিক সতর্ক হইয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতেছে যেন কত জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়া লইল। অমনি মোজা খুলিয়া সন্ধান করিতেছি। পরম সৌভাগ্য যে কল্পনার সাহায্যে কষ্টভোগ ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে একটীও জোঁকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যে জোঁকের ভয়ে এখানে আসিব কিনা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার দৌরাত্ম্য একবারও ভোগ করিতে হয় নাই। নামিতে নামিতে বোধ হইতেছে, যেন মুখ থুবড়িয়া আছাড়িয়া পড়িব। উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া একপ্রকার পাখী এমন পরিষ্কার শিশ দিতেছিল, যেন ঠিক্ মানুষের গলার স্বর বলিয়া ভ্রম হইল। পাখীর কণ্ঠে এমন মিষ্ট স্বর আর কখনও শুনি নাই। ক্রমে এত ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম যে, কি নীল আকাশ, কি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমাদের সহযাত্রী বাঙ্গালী মহিলা আজন্ম কলিকাতায় প্রতিপালিতা; কখন বাঘ, ভালুক, কি গণ্ডার বাহির হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করে, তিনি কেবল সেই কল্পনায় ব্যস্ত। এ পথে কেন আসিলেন, বলিয়া ক্রমাগত স্বামীকে অনুযোগ দিতেছেন। আমিত ব্যাপারখানা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির। আমোদে পথ-কষ্ট ততটা বোধ হইল না। আমাদের ঘোড়াটা হাঁটিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া বিদ্যুদ্‌বেগে নীচের পথে ছুটিয়া গেল। এমন ঢালু পথ যে, একবার দৌড়িলে শরীরের বেগ সংযত করা অসাধ্য। পাশে ভয়ঙ্কর খাদ, এক অঙ্গুলী ওদিকে সরিলেই নিশ্চিত মৃত্যু। ঘোড়াটিকে মৃত অবস্থায় খাদে পতিত দেখিব ভাবিয়া অগ্রসর হইতে পা চলিল না। অবশেষে পর্ব্বতের মূলদেশে উপত্যকা ভূমিতে পঁহুছিয়া যখন দেখিলাম, অন্যান্ন ঘোড়ার সহিত আমাদের প্রিয় টম অক্ষতশরীরে বিশ্রাম করিতেছে, তখন কত আহ্লাদ হইল, বর্ণনা করিতে পারি না। কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

এবার অবরোহণ শেষ করিয়া কেবলই উচ্চে উঠিতে হইবে। উপত্যকা-ভূমিতে অর্দ্ধঘন্টা বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। সেই ঘোর শীতের মধ্যেও পথশ্রমে ঘাম ছুটিল। একটু চলিয়া ঘোর তৃষ্ণাতুর হইলাম, অথচ এ পথে ঝরণা নিতান্ত বিরল। কতক্ষণে ঝরণা পাইব, কেবল সেই চিন্তায় ব্যাকুল। সঙ্গে যে দুই একটী লেবু ছিল, তাহাতে কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা দূর করিলাম। এক এক মাইল পথ যেন দ্বিগুণ বোধ হইল। বেলা প্রায় ৪-৩০ সময়ে আমাদের বিশ্রাম-স্থান টংলু শৃঙ্গে পঁহুছিলাম। কি মনোহর দৃশ্য! চারিদিক্ দেখিয়া পথ-কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গে মুকুটের ন্যায় ডাক-বাঙ্গালা বিরাজ করিতেছে। গৃহটী সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত। বড় বড় কুঠরীতে খাট চেয়ার ইত্যাদি গৃহসজ্জা প্রচুর রহিয়াছে। পাক ও আহারাদির পাত্রও অনেক পাইলাম। একটী মহা অসুবিধার বিষয় যে এক মাইল না গেলে জল পাওয়া যায় না। অগত্যা তথায় জলের জন্য লোক পাঠাইয়া আমরা সূর্য্যাস্তের মনোহর শোভা দেখিবার জন্য নিকটস্থ পর্ব্বত-চূড়ায় উঠিলাম। দার্জ্জিলিং সহরের গৃহাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইল। দূরবীক্ষণ-যোগে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ কত নিকটে দেখিলাম - মনে হইল যেন হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারি। বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া দেখি উঠানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন হাসিতেছে। অন্ধকারের সহিত শীতের দুরন্ত প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক কুঠরীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে তাই রক্ষা, নতুবা হয়ত শীতে জমিয়া যাইতাম। বিনামূল্যে যত ইচ্ছা কাঠ জ্বালাইতে পারা যায়। এই সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেন্টকে কতই ধন্যবাদ দিলাম। চিমনীর আগুনে পরম আহ্লাদে রন্ধন করা গেল। সারারাত্রি বোধ হয় ৫।৬ মণ কাঠ জ্বালাইয়াছি। চিমনীর নিকট খাট আনিয়া শয়ন করিলাম। জল জমে কি না দেখিবার জন্য দুই গ্লাস জল বাহিরে রাখিয়া দিলাম। ৪টার সময়ে আবার যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। গ্লাসের জল ঠিক্ পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়াছে দেখিয়া কত আহ্লাদ হইল, বলিতে পারি না। তাপ ২৯ ডিগ্রীর উপরে উঠিল না দেখিয়া আরও আশ্চর্য্য বোধ করিলাম।

২৫এ নবেম্বর বুধবার সূর্যোদয় দেখিবার জন্য আবার উচ্চ শৃঙ্গে উঠিলাম। এবার বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুরন্ত শীতে পা দুইটী হঠাৎ একেবারে অবশ হইয়া গেল, ঠিক্ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইলাম। সে পার উপর কোন মতেই শরীরের ভার রাখিয়া দাঁড়াইতে পারি না। এ দিকে যাত্রার জন্য সঙ্গীরা ডাকিতেছেন। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া পা দুখানি অনেক সেঁকিতে সেঁকিতে সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা হইতে মুক্তি পাইলাম। ৭-৩০ সময়ে ছন্দকফু অভিমুখে চলিলাম, এই মনোহর দৃশ্য ছাড়িয়া যাইতে মন চলিতেছে না।

২৫ এ নবেম্বর, বুধবার

বালসূর্য্য কিরণে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। যে দিকে চাই, নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে স্বভাব সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছে, কোন্ দিকে চাহিব? তুষারপাতে দুরারোহ সঙ্কীর্ণ পথ অতি পিচ্ছিল হইয়াছে, উপরে মাথা তুলিয়া চলিতে চলিতে ২।৪ বার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম! আজও ১৫ মাইল না চলিলে আশ্রয়স্থান পাইব না বলিয়া অতি দ্রুত চলিতেছি। পথে দুধ ও ডিম পাইয়া আগ্রহের সহিত ক্রয় করিলাম। প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিবিড় জঙ্গল ছাড়িয়া আজ বাঁশবনে পড়িয়াছি। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল বাঁশের জঙ্গল; ক্বচিৎ ২।৪ টা ওক কি পাইন বৃক্ষ পাষাণময় পর্ব্বতগাত্র হইতে উঠিয়া আকাশের দিকে শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। তুষারপাতে বাঁশের পাতাগুলি ধবল বেশ ধরিয়াছে। বাঁশের ফুল আর কখনও দেখি নাই, আজ প্রথম দেখিয়া মনে বিশেষ আনন্দ হইল। ফল হইতে ঠিক্ চাউলের ন্যায় শাঁস বাহির করিয়া চিবাইয়া দেখিলাম সেও ঠিক্ যেন চাউল। শুনিয়াছি বাঁশের ফল দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ। দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঁশের ফলে অনেকের জীবন রক্ষা হয়। আমরাও এই ফল কতক সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আজ দুর্গম পথের বর্ণনা সম্ভবে না। পথ এতই সঙ্কীর্ণ যেন দুই খানা পা পাশাপাশি রাখার স্থান হয় না। পর্ব্বতের উপর মহোচ্চ পর্ব্বত-দেহ বেষ্টন করিয়া কত বক্রভাবে ঘোরাণ পথ, পার্শ্বেই ৬০০০।৭০০০ হাজার ফিট নীচু খাদ, চাহিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দুরারোহ পথ দেখিয়া মনে হয় না যে এ পথে উঠিবার ক্ষমতা হইবে। উচ্চ শৃঙ্গ আরোহণে ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, মানুষের বসতিচিহ্নের নামমাত্রও দেখিলাম না। দুরন্ত শীতে পাহাড়ের গায়ের তৃণরাশি যেন অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে "বড় বেগুম" (এক প্রকার লালবর্ণ ফুল) ফুটন্ত অবস্থায় দেখিবার আশায় ইউরোপের নানাস্থান হইতে ভ্রমণকারিগণ এখানে আগমন করেন, তাহার শত শত গাছ পাষাণময় পর্ব্বত-দেহে জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ভুবনবিখ্যাত ফুল দেখা ভাগ্যে ঘটিল না। এপ্রিল মাস ফুল ফুটিবার সময়, সুতরাং গাছ দেখিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। উপরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক অনুভব করিতেছি। মাঝে মাঝে হাঁপানির ন্যায় বোধ হয়। শুনিলাম, উচ্চপদস্থ কোনও সৈনিক পুরুষ অনেক আড়ম্বর ও ব্যয় করিয়া "ছন্দকফ" যাত্রা করিয়াছিলেন। টংলু পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াই শুষ্ক (রাচুমোঠ) উচ্চ শৃঙ্গে উঠিবার ফলে তাঁহার নাক মুখ দিয়া এমন রক্তস্রাব আরম্ভ হইল যে, প্রাণের দায়ে তিনি দলবলশুদ্ধ দার্জ্জিলিং ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। বলশালী সৈনিকের যখন এদশা ঘটিল, তখন আমার ন্যায় দুর্ব্বলা নারীর ভাগ্যে ফেলুট দর্শন ঘটে কি না এক একবার ভাবিতে লাগিলাম। যাহাহউক যে অদম্য উৎসাহ লইয়া দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, পথের দুর্গমতা দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত যেন আমাকে গন্তব্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে সকলেই একান্ত পীড়িত হইয়া বাঁশবনের ঘন ছায়াতে আহার ও বিশ্রামের জন্য বসিলাম। এখানেও জল নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। একটী অতি সঙ্কীর্ণ জলধারা পর্ব্বতগাত্র বহিয়া পড়িতেছে, তাহাও এত পঙ্কিল যে এত তৃষ্ণাতুর হইয়াও সে জল পানে প্রবৃত্তি হয় না। ঘোড়াগুলি জল দেখিবামাত্র পা দিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটু গর্ত্ত করিয়া জল পান করিতে লাগিল। পশুদিগকে ঈশ্বর যে স্বাভাবিক সংস্কার দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমাদের সহযাত্রী একটী ভদ্রলোক একটু বেশী স্থূলকায় বলিয়া পথকষ্টে বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এখানে আমরা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, তিনি একবারেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, এবং হয়ত বা এখানেই ভ্রমণের শেষ হয় ভাবিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় অধিকক্ষণ তাঁহাকে এ নিরাশ ভাবে থাকিতে হয় নাই। প্রচুর আহারের ফলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে নববল সঞ্চারিত হইল। আমাদের মত এতগুলি কোমল দুর্ব্বল জীব লইয়া কি করিয়া উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিবেন, এখন তিনি কেবল সেই গুরুতর ভাবনায় ব্যস্ত। তাঁহার উদ্বেগ দর্শনে আমরা ৬টী মহিলা যে সমস্বরে ধন্যবাদ জানাইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার জন্যই আমরা বাস্তবিক চিন্তিত। কারণ, যে ক্ষীণকায় ঘোড়াটী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে গত দুইদিন যথাসাধ্য কর্ত্তব্যের গুরু বোঝা বহিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ তাহার ধৈর্য্য পরাভব মানিয়াছে। এতেক গুরুভার প্রভুকে বহন করা তাহার সাধ্যাতীত কাজ, তাহার উপর সেই ভার লইয়া এই দুরারোহ পার্ব্বতীয় পথে উঠা কত দুষ্কর। বেচারা অন্য উপায় না দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে, হঠাৎ প্রভুকে লইয়া একেবারে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। আরোহীর আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া আমরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, একটু অপ্রস্তুত হওয়া ভিন্ন তাঁহার অন্য

ক্ষতি ঘটে নাই। তিনি আর কি করিবেন, লজ্জা ঢাকিবার জন্য উঠিয়াই ঘোড়ার অকর্ম্মণ্যতার যথেষ্ট নিন্দা ও তাহাকে বিলক্ষণ কশাঘাত করিয়া নিজ উপস্থিত বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিলেন। টলুং নদের জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা সতর্ক না হইয়া যত ইচ্ছা পান করিয়াছিলাম, আজ তাহার ফলভোগ করিতেছি। সকলেরই অসুখবোধ হইতেছে। সঙ্গে ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া ৩।৪ ঘন্টার মধ্যে অনেক সুস্থ হইলাম। ঠিক্ গোধূলির সময় ছন্দকফ বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সঙ্গিনী একটী মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পশ্চাতে রহিয়াছেন, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাণ্ডি পাঠান গেল। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি পঁহুছিয়া আমাদের সকল উদ্বেগ দূর করিলেন। উঠানের একটা গামলার ভিতর অনেক বরফ জমিয়াছিল, প্রকাণ্ড একখণ্ড বরফ তুলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। এক্ষণে পানীয় জলের ঝরণা অতি নিকটে শুনিয়া তথায় যাইয়া দেখি, জল জমিয়া পাষাণের ন্যায় কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। একটী ভদ্রলোকের তাহা দেখিয়া বিলাতের কথা মনে পড়িল। তিনি বরফরাশির উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া সজোরে পড়িয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে বরফের উপর দাঁড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের লোকেরা বড় বড় কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে উপরের বরফের স্তর ভাঙ্গিয়া যেই জল তোলে, অমনি তাহা জমিয়া যাইতে লাগিল, দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল, গ্রীষ্মতাপিত কলিকাতাবাসিগণ এত বরফ দেখিলে কতই কৃতার্থ বোধ করিতেন। আমরা তাপের অধিকার অতিক্রম করিয়া তুষারের রাজ্যে পঁহুছিয়া যেন নূতনজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এবার গৃহের অভ্যন্তরে পঁহুছিয়া শয্যাদি ও আহারের শৃঙ্খলাতে ব্যস্ত হইলাম। এই বাঙ্গালাটী আকারে বিলক্ষণ ক্ষুদ্র, কুঠারীগুলি পূর্ব্ব বাঙ্গালার ন্যায় আরামজনক নয়।

চিমনীতে প্রকাণ্ড আগুন জ্বালিবার ফলে শীতের প্রভাব তত অনুভব করিলাম না। রন্ধনশালে যাইয়া পাক করা দুষ্কর, চিমনীতেই পাকাদি করিয়া পরম আহ্লাদে আহার করা গেল। এখানে তরল অবস্থায় জল পাওয়াই কঠিন, পয়ানপাত্রে ঢালিতে ২ জল জমিয়া যাইতেছে। আজ আমাদের গন্তব্য সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছিয়াছি। ফেলুট এখান হইতে ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী, কিন্তু উচ্চতর নয়।

২৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। রাত্রিতে চিমনিতে এত কাঠ দিয়াছিলাম যে, দেখিলাম সকাল পর্য্যন্তও ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়া স্নানাদির পর বাহির হইয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম; সম্মুখের উচ্চ পাহাড় হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গ হীরকের ন্যায় ঝকমক করিতেছে। বালসূর্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কখন কখন মাঝে মাঝে তাহাকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে সাজাইতেছে। প্রকৃতির এমন রমণীয় শোভা দেখিয়া আপনাকে ভুলিতেছি। এখানে অন্ততঃ দুই তিন দিন থাকিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। দার্জ্জিলিং ছাড়া পর্য্যন্ত আহার বিভাগের ভার সাধারণতঃ আমার উপর পড়িয়াছিল। আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই কোনও কাজে হাত না দিয়া কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিব স্থির করিলাম উচ্চ একটা পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া সেই অনন্ত দেবের অনন্ত প্রসারিত রাজ্যে অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলাম। সাংসারিক চিন্তা আপনা হইতে হৃদয় ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া অনন্ত দেবের পূজার স্থান প্রশস্ত করিয়া দিল। এদিকে আমাদের বাঙ্গলায় আহারাদি ও যাত্রার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। উপর হইতে বিলক্ষণ গোল শুনিতেছি। প্রকৃতির শোভায় মন প্রাণ এতই মুগ্ধ যে আহারাদির ইচ্ছা একেবারেই নাই। তথাপি আমার প্রভুভক্ত চাকর অনেক পরিশ্রমে সেই দুরারোহ শৃঙ্গে কিঞ্চিৎ আহার আনয়ন করিল। আমি তাহাকে সেই আহার পুরস্কার দিলাম। সে পাইয়া মহা সন্তুষ্ট, নিমেষে ভোজনপাত্র শূন্য করিল। অনেকবার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও আমি নামিলাম না। উপর হইতে দেখি, সহযাত্রিগণ জিনিস পত্র বাঁধিয়া সত্য সত্য রওনা হইতেছেন, কাজেই ধীরে ধীরে দলের সহিত একত্র হইলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ** মহাশয়ের উপর কুলীদিগকে ডাকিয়া দ্রব্যাদি বোঝাই, কোথায় কি আছে দেখা ইত্যাদি ভার পড়িয়াছিল। আসিয়াই দেখি, যুগান্তর উপস্থিত। ক্রমাগত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার কপালে ঘাম ছুটিতেছে, 'এমন বিশৃঙ্খলতার মধ্যে চলা ভার, এমন কি দার্জ্জিলিং ফিরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর' ইত্যাদি অনেক বলিলেন। এত সহজ কাজে পুরুষদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে ভাবি নাই, সুতরাং বিলক্ষণ হাসিতে লাগিলাম। পুরুষবর কাহারও প্রতি ক্রোধ ঢালিতে না পারিয়া নিরুপায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাঠি প্রহার করিতে করিতে ক্রোধাগ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করিলেন। আজ যে অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছি, পরিচিত লোকে দেখিলেও ম্যাকবেথের ডাইনী বলিয়া ভয়ে দূরে পলাইতেন। ফটোগ্রাফ তুলিবার সুবিধা থাকিলে নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব ছবি তুলিয়া বন্ধুগনকে উপহার দিতাম। প্রথমতঃ অত্যন্ত মোটা সাড়ী ও জেকেট পরিয়া আয়তন দ্বিগুণ হইল, তাহার উপর মাথা কপাল সব ঢাকিয়া ৩।৪ খানা শাল জড়াইলাম। হাতে মোটা পশমের দস্তানা। দুই হাতে দুই খানা বাঁশের লাঠি ভর করিয়া চলিতেছি। আশঙ্কা হয়, এই বর্ণনা পড়িয়া অনেকে ভয় পাইবেন। আজ ঘোড়াগুলিকে অতি সাবধানে লইয়া যাইতে হইল, কারণ সম্মুখের পর্ব্বতসকল একোনাইট প্রভৃতি নানা প্রকার তীব্র বিষের গাছড়াতে পূর্ণ। ঘাসের সহিত অজ্ঞাতে এ বিষ আহার করিয়া অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন তেজস্কর বিষের গাছ দেখিলাম যাহার আঘ্রাণেই জীবন শেষ হয়। দুরন্ত শীতের কথা কি বলিব? এত কাপড়ে ঢাকা, তবু শীতে যেন অবশ করিয়া তুলিতেছে। এক একবার বোধ হইল শরীরের রক্ত বুঝি জমিয়া গেল। শরীর গরম করিবার জন্য অত্যন্ত বেগে দৌড়িয়াও কিছু হইল না, অবশেষে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলাম। চা প্রস্তুত হইল। তাহা পান করিয়া কত আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। দার্জ্জিলিং থাকিতে শুনিয়াছিলাম, ১০।১৫ মিনিট পরে পরে ব্রাণ্ডি প্রভৃতি তেজস্কর সুরাপান ভিন্য ফেলুট-যাত্রিগণ বাঁচিতে পারে না। আমরা এ কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী ** মহাশয় মহিলাদিগকে মোমের পুতুলী ভিন্ন ভাবিতে পারেন না। পথিমধ্যে আমরা মারা গেলে তিনিই সকল নিন্দার ভাগী হইবেন ইত্যাদি অনেক চিন্তা করিয়া এক বোতল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পথে কাহাকেও একটু বসিতে দেখিলেই নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতেন, "একটু ঔষধ খান, নতুবা আপনার ফেলুট পঁহুছান ভার। আমাকেই শেষটা অপদস্থভাবে ফিরিতে হইবে দেখিতেছি।" ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্য অতি মহৎ হইলেও আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই। একটি বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে দার্জ্জিলিং হইতে ক্ষুদ্র শিশিতে কিঞ্চিৎ আদার আরক আনিয়াছিলাম, আজ এই ঘোর শীতে তাহা খুব কাজে লাগিল। অল্প পরিমানে পান করিয়া বেশ গরম বোধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ঘন মেঘ আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। বৃক্ষশ্রেণী পর্ব্বতচূড়া কিছুই দেখা যায় না - এমন কি ৩।৪ হাত দূরস্থ পদার্থও দেখিতে পাই না। যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইহার মধ্যে আবার তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় তুষারকণাতে শাল পূর্ণ করিলাম। কোন্ পথে চলিব, দূর হইতে কিছুই দেখা যায় না। তথাপি শীতের তাড়নায় সকলেই দ্রুতগতিতে চলিলাম। আজ পথে প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী পাইন ভিন্ন অন্য বৃক্ষ দেখি নাই। গাছগুলি যেন সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। পথ ক্রমেই অধিক দুর্গম হইতেছে - এমন কি আরোহী লইয়া যাওয়া দুষ্কর বুঝিয়া ঘোড়াগুলি আপনা হইতে থাকিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ পথ একেই তুষারপাতে পিচ্ছিল, তাহার উপর আল্‌গা পাথর পড়িয়া শতগুণ দুর্গম হইয়াছে। ডাণ্ডিওয়ালাগণ আমাকে লইয়া খাদে গড়াইতে গড়াইতে বাঁচিয়া গেল। এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলাম। ঘোর মেঘমালা ভেদ করিতে করিতে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমরা ফেলুট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। লক্ষ্যস্থানে সকলে নিরাপদে পঁহুছিলাম বলিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিল বলিবার নহে। সর্ব্বাগ্রে সেই মঙ্গলময় বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়া শয্যাদির শৃঙ্খলায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাত্রির অন্ধকারে বাহিরের কিছুই দেখা গেল না। এই বাঙ্গলাটী অন্যান্য বাঙ্গলা হইতে উৎকৃষ্ট। কুঠরীগুলি বেশ বড় বড়; গৃহসজ্জা, পাক ও ভোজন পাত্র যথেষ্ট পাওয়া গেল। গ্লাস-ঢাকা বারাণ্ডা এত লম্বা যে দৌড়িয়া শরীর গরম করিতে লাগিলাম, হাতের অঙ্গুলীর মাথায় অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইল, ভাবিলাম ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। পুনরায় সেই আদার আরক পান করিলাম। চিমনীর আগুনে পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। প্রত্যুষে যে মনোহর দৃশ্য দেখিব, কল্পনা চক্ষে তাহা চিত্রিত করিতে করিতে অনেক রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

২৭এ নবেম্বর, শুক্রবার।

ক্রমে সুপ্রভাত দেখা দিল। প্রকৃতি যে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন, তাহা দেখিতে মন নিতান্ত ব্যগ্র। রাত্রি থাকিতেই জাগিয়াছি। আমরা তিনটী মহিলা খুব পুরু কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া একটু দূরবর্ত্তী উচ্চশৃঙ্গে চলিলাম। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোল আমাদের শরীর মনে যেন নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিল। যে অভিনব দৃশ্য সম্মুখে বিরাজমান, তাহা দেখিতে দেখিতে সত্যই আপনাকে ভুলিতেছি। এ অতুলনীয় দৃশ্যের এক কণাও চিত্রিত করা ভাষার সাধ্য নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত শিল্পী প্রকৃতি-দেহ অমূল্য ভূষণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিত হইবে আশ্চর্য্য কি? পর্ব্বতদেহে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডগুলি এমন ভাবে লাগিয়া আছে যে, মনে হয় এখনই গড়াইয়া পড়িবে; অথচ কতশত বৎসর হইতে যে এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা একখণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণে বসিয়া নীরবে একদৃষ্টিতে স্বভাবের রমণীয় সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতেছি। আজ আমাদের সম্মুখে এমন এক নূতন রাজ্য প্রকাশিত, যাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে কল্পনাতেও আঁকিতে পারি নাই। দার্জ্জিলিং হইতে তুষারমণ্ডিত যে সকল গিরিমালা দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া কতই মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাদের দীর্ঘতা ও উচ্চতা ভাবিয়া কতই বিস্মিত হইয়াছি। সে সকল পর্ব্বত ব্যতীত আরও কত নূতন গিরিমালা তুষারের অমল শুভ্রবসনে শরীর ঢাকিয়া আজ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বোচ্চ এভারেষ্টশৃঙ্গ পূর্ণমাত্রায় নিজ সৌন্দর্য্য খুলিয়া দেখাইতেছে। এমন মেঘ ও কুয়াসা-শূন্য দিন অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষার-মণ্ডিত উন্নত শির যেন স্বর্গের পথে মিশিয়া গিয়াছে। এই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা কতশত ক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। মাথার উপর মেঘশূন্য অনন্ত নীলাকাশ, তাহারই নীচে ক্রমশঃ উচ্চ প্রাচীরশ্রেণীর ন্যায় সুদূর-প্রসারিত গিরিমালা, নিম্নে ভয়ঙ্কর খাদ, এ সকল আমার ক্ষুদ্র মনে কেবলই এক অনন্ত অসীম ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে। এ স্বর্গভূমিতে পঁহুছিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদয়ও যেন সাগরের ন্যায় তরঙ্গময় ও প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের রাজত্ব এখানে তিষ্ঠিতে পারে না। চারিদিকে এক অনন্তের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। এ সকল যাঁহার হস্তে গঠিত হইয়াছে, তিনি কত বড় মহান্, কত অসীমশক্তিশালী! যে হস্তে তিনি এ অসীম রাজ্য গড়িয়াছেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও সে হস্তেরই

রচনা, ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিতেছি। এ অনন্ত রাজ্যে দাঁড়াইয়া নিজকে কি ক্ষুদ্রই দেখিতেছি! এক বন্ধু বলিয়াছিলেন "পর্ব্বত ও সমুদ্র না দেখিলে ঈশ্বরের অসীম ভাব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না" আজ আমি তাহার সত্যতা বুঝিলাম। পূর্ব্বকালে ঋষিমুনিগণ এ হিমাচলে বসিয়া নিরাহারে সেই অনন্ত দেবের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন শুনিয়াছি, আজ এ দৃশ্য দেখিয়া সে কথা আর কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির এ নন্দনকাননে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিষয়চিন্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র সাংসারিক ভাব আপনা হইতেই পলাইয়া যায় - মানুষের মন সেই অনন্তদেবের অসীম ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের শোভা ধারণ করে।

ক্রমে বালসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণমালা, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তরুণ অরুণ-আভা সর্ব্বাগ্রে এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষারমণ্ডিত উচ্চ শিরে পতিত হওয়াতে ক্ষণে ক্ষণে ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রতিফলিত দেখিতেছি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তুষাররাশি উজ্জ্বল হীরকস্তূপের ন্যায় ঝলসিতেছে। চাহিতে চাহিতে চক্ষে ধাঁধা লাগে। চারিদিকের দৃশ্য স্বর্গের অনন্ত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। আমাদিগকে আজই যে স্বভাবের এ নন্দনকানন হইতে বিদায় লইতে হইবে, একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। মনে ভাবিতেছি, এমন স্থানে বাস করিলে মানব স্বর্গের জীব হইতে পারে। স্বভাবের এ অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় আপনা হইতেই স্বর্গের পথে ধাবিত হয়।

সংসার-ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছি। হৃদয়ে যে উচ্চভাব হইয়াছে, তাহার কতক অংশ লইয়াও যদি গৃহে ফিরিতে পারি, নিজকে ধন্য মনে করিব। কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, এ দৃশ্য ছাড়িয়া যাই। অন্ততঃ দুই দিন থাকিবার জন্য দলের অধিনায়িকাকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিলাম। বিশ্রামদিন রবিবার দার্জ্জিলিঙে না কাটাইলে চলিবে না বলিয়া, তিনি কোন মতেই আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কাজেই আমরা যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। মধ্যাহ্নভোজনের পর আহার-দ্রব্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। যে লোক আহার-দ্রব্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে গোপনে খাদ্যগুলি নিঃশেষ করিয়াছে, স্পষ্ট বুঝিয়াও কিছু বলিলাম না। অধিনায়িকার পরামর্শে নূতন পথ ধরিয়া দার্জ্জিলিং ফিরিয়া চলিলাম। তাঁহার ধারণা যে, এপথে গেলে অন্ততঃ ১৫।১৬ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে। নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিব ভাবিয়া আমরাও প্রফুল্ল হইলাম। দলনেত্রীর বর্ব্বর সহিস আমাদের পথ-প্রদর্শক, তাহার একটী কথাও বুঝিতে পারি না। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে সেই গগনস্পর্শী গিরিমালা, সেই অমল শুভ্র এভারেষ্ট-শৃঙ্গ, সকলেরই নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছি। পথের বর্ণনা সম্ভবপর নয়। এখন কেবল নীচে নামিতেছি। এমন উচু নীচু পথ যে, খালি ডাণ্ডি লইয়াই লোকগুলি আছাড়িয়া পড়িতেছে। কোমর পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্তের মত স্থানে নামিয়া উপরে উঠি, আবার গর্ত্তে পড়ি। এই সুগম পথে কত দ্রুত চলা সম্ভব, সহজেই অনুমান করা যায়। ক্রমে আমরা পর্ব্বতের মূল দেশে নিবিড় বাঁশবনে যাইয়া পড়িলাম। সেই গগনভেদী পর্ব্বত-চূড়া, সুনীল আকাশ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া সূর্য্য-কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম। বর্ষার সময়ে বোধ হয় স্থানগুলি জলে পূর্ণ ছিল, কারণ এখনও পদভরে মাটী বসিয়া যাইতেছে। বন্য জন্তুর সাক্ষাৎলাভ একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এ কয়দিনের অল্পাহারে ঘোড়াগুলি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল, আজ অপর্য্যাপ্ত বাঁশপাতা আহার করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইতেছে। দলের অধিনায়িকা আশা করিয়াছিলেন, ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলেই আজ রাত্রির জন্য ফরেষ্ট বাঙ্গালায় বিশ্রামস্থান পাইবেন। কিন্তু প্রায় ১০ মাইল পথ আসিয়াও যখন মনুষ্যের বসতি-চিহ্ন লক্ষিত হইল না, তখন সকলেরই ধারণা জন্মিল পথ হারাইয়াছি। এখন কোথায় আশ্রয়স্থান, কতদূর গেলে লোকের মুখ দেখিব, দার্জ্জিলিং আর কতদূর সকলই অনিশ্চিতের মধ্যে দাঁড়াইল। এত দুর্গম পথও আমোদে চলিতেছিলাম, বিপথে পড়িয়াছি শুনিয়া মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তথাপি ভয়ে আকুল না হইয়া সকলেই সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদের সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান্ পাহাড়ী ছিল, রাত্রির অবস্থানের উপযুক্ত একটী স্থান দেখিবার জন্য তাহাকেই অগ্রে পাঠান গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমরা ক্রমেই ঘোর দুর্গম পথে প্রবেশ করিলাম। পথ বলা যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই। বর্ষার জলে ধৌত হইতে হইতে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। কখন তাহাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূল অবলম্বনে উপরে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে ভীমকায় বৃক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও নীচের সুড়ঙ্গের পথে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছি। কাপড় জুতা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে। সহযাত্রী একটি মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কোন মতেই চলিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে ৩ জন যাত্রী পশ্চাতে রহিলেন। ৩ টী মহিলা পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি ডাণ্ডি-ওয়ালা-গুলিকে লইয়া সেই বনপথে চলিতেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে চলিতে পারিলাম না। তাহারা অনেক আগে চলিয়া গেল। কত ডাকিয়া উত্তর পাই না। সেই নিবিড় জঙ্গলে আমি একাকিনী জঙ্গল ভেদ করিয়া দক্ষিণে কি বামে অগ্রসর হইব জানি না। এখন গৃহে বসিয়া সেই অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হইতেছি, কিন্তু তখন মনে এমন এক অপূর্ব্ব সাহস জন্মিয়াছিল যে, তাহার বলে এই প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হইয়া পড়ি নাই। দিবসেও যে দুর্গম পথে চলা ভার, রাত্রির অন্ধকারে সে পথে কি কষ্টে একা চলিতেছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। একটু শব্দ শুনিলেই আশঙ্কা হয় যে, হয়ত বা ভালুক আসিতেছে। ভালুকের দৌরাত্মের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম, তাই ভালুকের কথা মনে পড়িতেছিল। ২।৩ মাইল এই ভাবে চলিতে চলিতে অগ্রগামী মহিলাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেন মৃতদেহে জীবন পাইলাম। রাত্রিটা এই ঘোর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সহিত কাটাইতে হইবে ভাবিতেছি। পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে, আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি সহযাত্রী মহিলাদের আশা-জনক কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম, ঘোর অন্ধকারে কোথায় যাইয়া পড়িব, ঠিক্ নাই। হঠাৎ দূরের আলোক দৃষ্টে প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমাদের লোকেরাই যে বুদ্ধি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিতেছে, তাহাতে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পশ্চাতের যাত্রীদের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। একটী লণ্ঠন দিয়া ৩ জন লোককে তাঁহাদের অনুসন্ধানে পাঠান গেল। এদিকে আলো হস্তে লইয়া আমরাও অগ্রসর হইতেছি। সম্মুখে একটু সমতল ভূমি দেখিয়া তথায় রাত্রি কাটাইব স্থির করিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সহযাত্রী মহিলাগণ তখনও আশ্রয়স্থান পাইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা কতকদূর যাইয়াই আমাকে আহ্বান করিলেন। এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না; তথাপি অগ্রসর হইলাম। একটী ভুটীয়া রমণী সহাস্য মুখে হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে তাহার বাঁশের কুটীরে লইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত আতিথ্যলাভ করিয়া অবাক্ হইলাম। গৃহখানি কেবল বাঁশে গঠিত, অধিকাংশ স্থান শস্যে পূর্ণ। বসিতে স্থান পাইয়া যে আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। এখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সহযাত্রীদের জন্যই যত চিন্তা হইতেছে। প্রায় একঘন্টার পর সকলেই নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎলাভে যত না আনন্দ জন্মে, ৯ জন সহযাত্রী একত্রিত হইয়া তদপেক্ষা আনন্দিত হইলাম। এত ক্লান্তির মধ্যে আহার-চিন্তা আসিল না। শয়নের একটু স্থান পাইলেই কৃতার্থ হই। আশ্রয়দায়িনী ভুটীয়া নারী আমাদিগকে সুখী করিতে কত ব্যস্ত! মুখ ধুইবার জল ঢালিয়া দিতেছে। আহারের কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, যেন আমরা কুটুম্বভাবে আসিয়াছি। আমরা প্রথমে আহারের অনিচ্ছা জানাইলাম, সে কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে ৬ সের আলু সিদ্ধ ও ৩ সের চমরী গরুর দুধ আনিয়া দিল। সঙ্গে কিছু মাখন সম্বল ছিল, তাহার সাহায্যে সেই সিদ্ধ আলু যে তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল, বর্ণনা করিতে পারি না - রাজভোগেও এত তৃপ্তি হয় না। এখন শয়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইলাম। একখানা কম্বল ঝুলাইয়া কুটীরের সেই সঙ্কীর্ণ স্থান দুই ভাগ করা গেল। এক অংশে পুরুষগণ ও অন্য অংশে আমরা ৬টী মহিলা আশ্রয় লইলাম। পথের কথা বলিতে বলিতে আমাদের মধ্যে হাসির লহরী উঠিল। আজ জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। যে নূতন অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা চিন্তা করিতে করিতে একবারও নিদ্রা আসিল না। কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হিমালয়ের ঘোর জঙ্গলে ভুটীয়াগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব, কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই প্রতিকূল অবস্থাতেও মন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে নাই, বরং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

২৮এ নবেম্বর, শনিবার

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। ভুটিয়া স্ত্রীলোকটি ভুট্টার রুটী ও কতকগুলি আলু সিদ্ধ সঙ্গে দিল। আমরা তাহাকে ৫টী টাকা দিয়া ও কৃতজ্ঞতাসূচক অনেক কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তার কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। ভুটীয়া-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভদ্রবংশীয়া মহিলাদের যে সদ্গুণ থাকা উচিত, ইহাতে তাহার অভাব দেখিলাম না। ভুটীয়া স্ত্রীলোকটী সেই অজ্ঞাত রাজ্যে পথ দেখাইবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিল। পাহাড়ের নীচে অনেক চমরী গাভী দেখিলাম। পূর্ব্ব দিনের পথশ্রমে যথেষ্ট ক্লান্ত আছি, এমন কি, পার ব্যথায় চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আশা, হয়ত একটু ভাল পথ পাইব। ভাল পথ পাওয়া দূরে থাকুক, এমন স্থান দিয়া চলিতে হইতেছে যে পূর্ব্ব দিনের কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হইল। গভীর গর্ত্তে নামিয়া অগ্রসর হইতেছি, ঝরনার জল পড়িয়া তাহা কর্দ্দমপূর্ণ ও পিছল হইয়াছে। সঙ্গিনী একটী মহিলা দুই একবার পড়িয়া যাইয়া আর হাঁটিবেন না স্থির করিলেন। আমরা মহা বিপদে পড়িলাম, কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই ভুটীয়া স্ত্রীলোকের আত্মীয়া একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে পিঠে বহন করিতে সম্মত হইল। এ দুর্গম পথে একজন মানুষ পিঠে করিয়া চলিতে পারিবে, কোন মতেই বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সে আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সঙ্গিনীকে পিঠে বাঁধিয়া এমন দ্রুতবেগে চলিয়া গেল যে, আমরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কত হাসিলাম, বলিতে পারি না। বহুদূর হইতে ঘোর তুফানের মত শব্দ শুনিতে শুনিতে পর্ব্বতবাহিনী এক ভীমস্রোতা নদীর তটে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডে বাধা পাইয়া ফেনরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কি ভীম রবে ছুটিতেছে! শব্দে কর্ণ বধির হইয়া গেল। স্রোতের বেগ দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়। নদীগর্ভে পাষাণস্তূপ পড়িয়া আছে। একটা শিলাখণ্ডে বসিয়া নদীর নির্ম্মল জলে হাত মুক ধৌত করিলাম, পথশ্রান্তি যেন একবারে দূর হইল। পর্ব্বতের মূল দেশ হইতে উপরের শোভা কি রমণীয় দেখাইতে লাগিল! পারাপারের জন্য দুই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড একত্রে বাঁধা রহিয়াছে। সন্তরণে অপটু বলিয়া জলে আমার বিশেষ ভয়। বৃক্ষকাণ্ডের উপর দিয়া কেমন করিয়া এ ভীমস্রোতা নদী পার হইব ভাবিয়া অত্যন্ত ভয় হইল। ঘোড়াগুলি সাঁতার দিয়া স্বচ্ছন্দে পার হইয়া গেল, দেখিয়া

কিঞ্চিৎ সাহস জন্মিল, ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদে অপর পারে পৌঁছিলাম। এ পারের পথের কথা বলিবার নহে। যাঁহারা সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহার দুর্গমতা উপলব্ধি করা দুষ্কর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শিকড় অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি, আবার হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছি। একবার নামা উঠাতেও দুর্গম পথ শেষ হইল না। ৫, ৬টা উচ্চ পর্ব্বত এই প্রকার কষ্টে অতিক্রম করিলাম। এবার কোথায় একটু ভাল পথ, দেখিয়া আশা জন্মিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে যাইয়া পড়িলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদের নিকট শুনিলাম, - এই ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠা ভিন্ন পথ নাই। শরীরে যত টুকু বল অবশিষ্ট ছিল, এ কথা শুনিয়া তাহাও যেন ছাড়িয়া গেল। সমস্ত দিন প্রায় আহার ঘটে নাই বলিলেই হয়। তাহার উপর ঘোর পরিশ্রম। একটু বিশ্রাম লাভের জন্য আমরা ৪ জন যাত্রী পর্ব্বততলে বসিলাম। সেই ভুট্টার রুটী আহার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এত কদর্য্য যে তত ক্ষুধার সময়েও তাহা মুখে দিতে পারিলাম না। মরুয়া বীজের কিছু খই সম্বল ছিল, তাহা অতি উপাদেয় বলিয়া আহার করা গেল। ডাণ্ডিওয়ালাগন এ পথে আসার একান্ত বিরোধী ছিল, এখন আমরা যত ক্লান্ত হইতেছি, তাহারাও আপনাদের অভিজ্ঞতার গর্ব্ব করিতে করিতে আমাদিগকে তত নিন্দা করিতেছে। দলের অধিনায়িকা আমাদিগকে এই পথে আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ইহাদের অধিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কষ্টের সময়ে লোকগুলির নিন্দাবাদ শুনিয়া আরো বিরক্ত হইতেছি, কিন্তু তাহাদের আলাপ যেন কিছুই বুঝিতে পারি না, এই ভাণ করিতেছি। সঙ্গী ভদ্রলোক পাথরের উপর গড়াইয়া পড়িলেন। ডাণ্ডিওয়ালাগণ যদি তাঁহাকে পিঠে বহিয়া চলে, ভাল, নতুবা তিনি কদাচ উঠিতে পারিবেন না। জন্মস্থান ও দূরস্থ পিতা মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিলাপধ্বনিতে সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে অস্থির। আমরা এত ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিলে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক বলিয়া কতই উপহাসের ভাগী হইতাম। এই ভদ্র লোকটী সঙ্গী না হইলে এত হাসিবার সুযোগ ঘটিত না, পথশ্রান্তি দ্বিগুণ কষ্টকর হইত, এজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। তিনিও এমন শান্তপ্রকৃতি যে, সকলকে এত হাসিতে দেখিয়া একদিনও ধৈর্য্যহারা হন নাই, বরং এতগুলি শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। যাহা হউক, এতক্ষণ বিশ্রামের পর, ঝরণা-অধিরোহণ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলগা পাষাণস্তূপ বহিয়া ভয়ঙ্করবেগে জলস্রোত নামিতেছে, তাহার উপর চলা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার; সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বস্ত্রাদি ও জুতা একেবারে ভিজিয়া গেল। দুইটী ঘোড়া উলটিয়া নীচে পড়িতেছিল, আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইল। ৬টী ঝরণা অতিক্রম করিয়া প্রায় সূর্য্যাস্তের সময়ে ঘোর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী একটী জনশূন্য ভগ্ন গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সকল দিকের দরজা বন্ধ, অগত্যা শার্শি ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইল। গৃহটী দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু একেবারে গৃহসজ্জাশূন্য; তথাপি যে আশ্রয় পাইলাম ইহা ভাবিয়া আমরা কতই কৃতজ্ঞ। আহার সামগ্রী একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে, সুতরাং কিছু সংগ্রহ না করিলে পরদিন পথ চলা দুষ্কর। ৬মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ৩টী টাকা দিয়া লোক পাঠাইলাম। অনেক রাত্রিতে সে ⁄২ সের চাউল মাত্র লইয়া ফিরিল। এমন মোটা চাউল কখনও দেখি নাই, কিন্তু ক্ষুধার সময়ে তাহাই কত উপাদেয় বোধ হইল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিশ্রাম করিতে গেলাম। অত মোটা চাউলের অন্ন আহার করার ফলে সহযাত্রী বালিকাটী নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। এমন স্থানে তাহাকে পীড়িত দেখিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া অনেক সুস্থ বোধ করিল। রাত্রিশেষে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে, পীড়িত বালিকাকে লইয়া যাত্রা করা উচিত কিনা, চিন্তা করিতে লাগিলাম। আজ এ বাঙ্গালায় থাকিলেও আহারীয় দ্রব্য মিলিবেনা। অগত্যা যাওয়াই স্থির হইল।

২৯শে নবেম্বর, রবিবার ৭টা

আবার অপরিচিত পথে চলিলাম। বৃষ্টির জলে পথ কর্দ্দমময়। গর্ত্তগুলি জলপূর্ণ। কিছুদুর যাইয়াই এক প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বদিন ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছিল, আজ নীচে অবতরণ শতগুণে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঝরণার মাঝে যে প্রকাণ্ড পাথর রহিয়াছে, লম্ফ দিয়া তাহার উপর পা রাখিতেছি। আলগা পাথর শরীরের ভারে গড়াইয়া যাইবে ভয়ে দুই পাশের জঙ্গল জড়াইয়া ধরিয়া নামিতে চেষ্টা করিলাম। কি ভয়ানক ব্যাপার! ইহা যে বিছুটীর জঙ্গল জানিতাম না। আমাদের দেশীয় বিছুটী ইহার কাছে কোথায় লাগে। দেখিতে দেখিতে দুই হাত ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইল। যে স্থানে বিছুটীর পাতা লাগিয়াছিল, তাহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল। ঝরণা ধরিয়া অনেকদূর যাওয়ার পর এক নদীর ক্ষুদ্র স্রোতে পঁহুছিলাম। এবারও কাপড় ইত্যাদি ভিজিয়া গেল। অনেক দূর এভাবে চলিলাম। জুতা ও বস্ত্রের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব? সহযাত্রী ভদ্রলোক কেবল অদৃষ্টের নিন্দায় ব্যস্ত। বরাবর পিতামাতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১২টার সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত পীড়িত হইয়া নদীকূলে একটু সমভূমিতে পঁহুছিলাম। আহার ভিন্ন পথ চলা অসাধ্য ভাবিয়া, যে অল্প পরিমাণ মোটা চাউল সম্বল ছিল, তাহা দ্বারা রান্না করা গেল। কোন কোন সহযাত্রী নদীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। কত কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তির সহিত সেই অন্ন আহার করিলাম। নদী পার হইয়া আবার পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। পথে কত প্রকাণ্ড ঝরণা অতিক্রম করিলাম। পর্ব্বতের নিম্নদেশ এলাচের জঙ্গলে পূর্ণ, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই এলাচ গাছ দেখিলাম। সম্মুখে ভুটিয়াদের কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্টে নিতান্ত আশ্বস্ত হইয়া তথায় পঁহুছিলাম। আশা ছিল, দার্জ্জিলিং কয় মাইল দূরবর্ত্তী তাহারা নিশ্চয় বলিয়া দিবে। দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টাতে একটী কথাও বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে সক্ষম হইলাম না। বিষন্ন হৃদয়ে আবার গন্তব্য পথে চলিতে হইল। আজ পর্ব্বতের মূলদেশে ৫।৬ টা নদী অতিক্রম করিলাম। দূরে ধানের ক্ষেত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই ধান ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিলাম। পাকা ধানের সুগন্ধ কি মনোহর! দুই একটী পাহাড়ীর দেখা পাইয়া জানিলাম, পুলবাজার নামক স্থান নিকটবর্ত্তী। অত্যন্ত উৎসাহে চলিলাম। কিন্তু পুলবাজারের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। আবার ঘোর জঙ্গলে পড়িতে হইল। কখন কখন দুই একজন লোক দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের কথায় নির্ভর করিয়া কেবলই নিরাশ হইতেছি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "পুলবাজার কয় মাইল?" উত্তর "দুই মাইল।" আমরা বলি, না ১০ মাইল হইবে; তাহারাও বলে "হাঁ ১০ মাইল।" প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন এরূপ নিরাশাজনক উত্তর পাইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইতেছি। স্থির করিলাম, পথের দূরত্ব সম্বন্ধে কাহাকেও আর জিজ্ঞাসা করিব না। বাঁশবন ও ঝরণা অতিক্রম করিতে করিতে নিতান্ত দুর্গম স্থানে পঁহুছিলাম। আবার সহযাত্রিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে হইল। এমন বক্রপথে একত্র চলা অসাধ্য। আমার সঙ্গী ডাণ্ডিওয়ালা ও মুটেগণ যমদূতের ন্যায়, তাহাদিগকে লইয়া চলিতে চলিতে মনে কত আশঙ্কা হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এমন স্থানে পঁহুছিলাম, যে স্থানে এক পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পাষাণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। পশ্চাতে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিয়াও দেখা পাইলাম না, অগত্যা ধীরে ধীরে ভগ্ন পথে অবতরণ করিতেছি। নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিব সে আশা হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে নিরাপদে সেই ভয়ঙ্কর স্থান অতিক্রম করিলাম। সম্মুখে বিজন বনের অন্তরালে ভগ্ন পথ, সহযাত্রীদের কাহারও দেখা নাই, অথচ তাঁহাদের অপেক্ষায় এই অন্ধকার মধ্যে ডাণ্ডিওয়ালাদের সহিত বসিয়া থাকাও ভয়ানক। অন্ধকারে পথ দৃষ্ট হয় না, অতি সাবধানে চলিলাম। প্রাণের দায়ে ডাণ্ডিওয়ালাদের ধর্ম্মজ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্য ঈশ্বর, পরকাল, পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করা গেল; কিন্তু তাহাদের মনে যে কোন একটা ভাব জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম, এরূপ বোধ হয় না। ভুটিয়াদের ধর্ম্মজ্ঞান আশ্চর্য্য ধরণের। তাহাদের ভূতের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তাহারা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ভূতের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। আমরা চলিতেছি, পর্ব্বতের যে স্থানে প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে সেই স্থানে ভূতের বাস বলিয়া ডাণ্ডিওয়ালাগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া প্রাণপণে দৌড়িতেছে। আমিও সেই সুযোগে তাহাদিগকে ঈশ্বরের শক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। হায়! কুসংস্কারের অধীন হইয়া জীবন্ত মনুষ্য যে কত হীনদশাগ্রস্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিলাম। এই ভীমকায় বলিষ্ঠ লোকগুলি ভূতের ভয়ে এত কাতর, যে আমি ভূত তাড়াইবার যে কোন উপায় বলিব, তাহাই করিতে প্রস্তুত। এ দিকে যত হাঁটিতেছি, দুর্গম পথ আর শেষ হয় না। রাত্রিও অধিক হইল, "পুলবাজার" নিকটে, কেবল এ আশায় নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এক জন সহযাত্রীরও দেখা পাইলাম না। একটা নিবিড় বাঁশবন ভেদ করিয়া চলিতেছি। এমন সময়ে কোন বন্যজন্তুর এমন একটা ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি কর্ণের প্রবেশ করিল যে, আমার শরীরের ধমনীগুলি কম্পিত হইয়া উঠিল, এমন একটা বিষম আতঙ্কের অবস্থা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। তথায় দাঁড়াইয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে দ্রুতগতিতে চলিলাম। নদীস্রোত চলিয়াছে বলিয়া নিম্নভূমির ধান্যক্ষেত্রগুলি ভয়ানক কর্দ্দম পূর্ণ। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া চলিতে যে কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। জুতা কখন কখন কর্দ্দমে বদ্ধ হইয়া খসিয়া থাকে, আজ যে কোন লোকালয়ে পঁহুচা ভাগ্যে ঘটিবে, সে আশা মনে একবারও জাগিতেছে না। এমন ঘোর প্রতিকূল অবস্থায়ও যেন এক নূতন বল পাইয়া চলিতেছি। এ দিকে দুরন্ত শীতে হাত পা শরীর অসার করিয়া তুলিতেছে। হঠাৎ দূরে আলো দেখিয়া প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল, কতকগুলি শুষ্ক বাঁশপাতার আলো জ্বালাইয়া দ্রুতপদে চলিলাম। "ওগো তাঁহারা আসিতেছেন" আমার সহযাত্রী ভগ্নীর এই স্বর যেন সেই ঘোর শ্রান্তি ও নিরাশার মধ্যে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। যে পুলবাজারের অন্বেষণে এত ঘুরিয়াছি, এখন সেই পুলবাজার পঁহুছিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পিতাকে কত ধন্যবাদ দিলাম। দুইটী সহযাত্রী অগ্রে পঁহুছিয়া আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এত বিলম্ব দেখিয়া বিপদ আশঙ্কায় কতই উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন! আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন, সকলেই বুঝি একত্র আসিয়াছি। আশ্রয়স্থানে পঁহুছিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। যে ৬ জন সহযাত্রী পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের কষ্ট ভাবিতে ভাবিতে মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ঘোর অন্ধকারে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাত্রির মধ্যে পঁহুছিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ হইতে লাগিল। একান্তমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘন্টা পরে দূরে কথা শুনিয়া আশা হইল, তাঁহারা আসিতেছেন। সকলকে নিরাপদে পঁহুছিতে দেখিয়া যে অসীম আনন্দ জন্মিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। দলের অধিনায়িকা আমাদের কষ্ট দেখিয়া নিজকে শত দোষী ভাবিতেন। এবার এত কষ্টের পর একত্রিত হইয়া আমাদের গলা জড়াইয়া আনন্দের আতিশয্য বশতঃ কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতিকূল অবস্থা আমাদের বন্ধুতা যেন শত গুণ দৃঢ় করিয়া দিল। পরস্পরকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া গৃহাদির শৃঙ্খলায় ব্যস্ত হইলাম। "পুলবাজার" প্রকৃত পক্ষেই একটী বাজার। এখান হইতে অনেক আহারীয় দ্রব্য প্রতি সপ্তাহে দার্জ্জিলিং প্রেরিত হয়। মাড়োয়ারী

মহাজনগণ বাজারের একমাত্র অধিবাসী। তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন; তাহা কদাচ ভুলিব না। এক মহাজন আমাদের রাত্রিবাসের জন্য নিজের দ্বিতল ঘর ছাড়িয়া দিলেন। পরিষ্কৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া যে আরাম অনুভব করিলাম, কোন কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমাদের কথা বুঝিতে পারে, এমন লোক পাইয়া, কতদূর আশ্বস্ত হইলাম, তাহা কেবল আমরাই অনুভব করিতে পারি। সেই মহাজন লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া উপহার দিলেন। আহার করিয়া বোধ হইল, এমন উপাদেয় দ্রব্য জন্মেও যেন আস্বাদন করি নাই। শুনিলাম, দার্জ্জিলিং এখান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী, পরদিন ৪।৫ ঘন্টার মধ্যে অনায়াসে পঁহুছিতে পারিব। সকলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের আনন্দে নিদ্রা আসিল না। আজ আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন, পথের কষ্ট ও এক এক জনের আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে যে হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহা বলিবার নহে। গৃহে ৩টী শিশুর সরল স্নেহপূর্ণ মুখ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এত ব্যগ্রতা বোধ হইতেছে যে, এ ঘোর রাত্রিতেও যাত্রা করিতে প্রস্তুত। এক সপ্তাহের অধিক কাল পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমার সংবাদও কেহ জানেন না, আমিও কোন সংবাদ রাখি না। নানা চিন্তার তরঙ্গ হৃদয়ে খেলিতে লাগিল। হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চমকিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম।

৩০শে সোমবার প্রভাত-সময়ে স্বভাবের শান্তিপূর্ণ ছবি প্রাণে নব উৎসাহ ঢালিয়া দিল। আজই গৃহে পঁহুছিয়া বন্ধুবান্ধব ও সন্তানদের স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিব, ভাবিতে ভাবিতে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিতেছে। একটী ক্ষুদ্রস্রোতা নদী পুলবাজার বহিয়া কুলুকুলু শব্দে চলিয়াছে, আমরা তাহার নির্ম্মলজলে মুখ ধৌত করিয়া তৃপ্ত হইলাম। পুলবাজার পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত; আকাশভেদী পর্ব্বতমালা চারিদিকে মস্তক তুলিয়া রহিয়াছে। নদীর মধ্যে একখানা পাষাণখণ্ডে বসিয়া চারিদিকের নীরব সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইলাম। পূর্ব্বদিবসের পথশ্রান্তির জন্য অনেকেই শীঘ্র শীঘ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত নহেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত, প্রতি মুহূর্ত্ত আমার নিকট দীর্ঘ সময় বোধ হইতেছে। যাত্রীদিগের প্রস্তুত হইবার বিলম্ব দর্শনে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর যাহার যে পরিষ্কার বস্ত্রাদি অবশিষ্ট ছিল, তাহা পরিধান ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সকলেরই সহাস্য মুখ। বেশভূষার পারিপাট্য দর্শনে কে মনে করিতে পারে যে, আমরা এত কষ্টরাশি অতিক্রম করিয়াছি। ঘোড়াগুলি আরোহী পৃষ্ঠে লইয়া সগর্ব্বে বন্ধুর পার্ব্বতীয় পথে উপরে উঠিতেছে। আরোহিগণের কে আগে যাইবেন, বাজী রাখিয়া তাঁহারা বেগে ঘোড়া চালাইতেছেন। ডাণ্ডিওয়ালাগণও আমাকে লইয়া খুব ছুটিয়াছে। আমি সকলের অগ্রে, পশ্চাতের সহযাত্রীদিগকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ক্ষুদ্র পর্ব্বতবাহিনী দুইটী নদী পার হইয়া চাক্ষেত্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এখন কেবল সোজা উপরে উঠিতে হইল। ঘোড়াগুলি ঘামে যেন স্নান করিয়াছে। চাক্ষেত্রের কুলিগণ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া আমাদের বৃহৎ দলটি ভালরূপে দেখিবার জন্য নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কোথা হইতে আসিলাম বারবার কেবল এই একই প্রশ্ন। ক্রমে দার্জ্জিলিং সহরের গৃহগুলি মালার ন্যায় দৃষ্ট হইল। আমাদের হৃদয়ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। প্রায় ১টার সময়ে গৃহে পঁহুছিলাম। সন্তান ৩টীকে নিরাপদ ও সুস্থ দেখিয়া যে অসীম আনন্দ জন্মিল, তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। এতদিন দুঃখ কষ্ট ভোগের পর গৃহের মূর্ত্তি কি মধুর বোধ হইতেছে। প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরচরণে হৃদয় প্রণত হইল। সর্ব্বত্র তাঁহার দয়ার নিদর্শন দেখিয়া কৃতজ্ঞতাভরে হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ দেহে আবার সকলে একত্রিত হইলাম, একথা যত ভাবি, ততই মন কৃতজ্ঞতাসাগরে ডুবিয়া যায়।

ফেলুট হইতে জীবন্ত প্রত্যাগত হইয়াছি শুনিয়া বন্ধুবান্ধব অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণে আমাদের দ্বিগুণ আনন্দ জন্মিল। সন্ধ্যাবেলা ওজন হইতে গিয়া জানিলাম, একসপ্তাহের পরিশ্রমে শরীরের ভার ৵৫ সের কমিয়াছে। এজন্য একটুও দুঃখিত নহি। প্রকৃতির মহান্ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের চক্ষে যে একটা দোষ জন্মিয়াছে, তাহা বলা উচিত।

এখন দার্জ্জিলিং সহরের জেলা পাহাড়, অব্সারভেটরী হিল প্রভৃতি পর্ব্বত বলিয়াই মনে হয় না। রাস্তাগুলি সমতল বোধ হইতেছে; এ পথে দিন রাত্রি চলিলেও যে ক্লান্তি বোধ হইতে পারে, এমন বোধ হয় না। রাস্তার বাহির হইলে হাসি পায়। ফেলুট হইতে প্রত্যাগত হওয়ার কয়দিন পরে বার্চ্চ হিল পার্কে ৯টী সহযাত্রী একত্রিত হইয়া বনভোজন করিলাম। পথের নানা গল্প করিতে করিতে দিনটা পরম সুখে চলিয়া গেল। একটা দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়াছি বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ সম্মান বাড়িয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আমার মনে একটুও গর্ব্বের ভাব আইসে না। পাঠক মনে করিবেন না আমার এ ভ্রমণকাহিনী অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জিত দূরে থাকুক, যেরূপ অভাবনীয় প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও ধৈর্য্যবলে অপরাজিতচিত্তে দার্জ্জিলিং প্রত্যাগত হইয়াছি তাহা বাস্তবিকই স্মরণযোগ্য। মন কষ্টে একটুও দমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, সুবিধা পাইলে আবার আজি "ফেলুট" যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। জীবনে আবার কি তেমন আনন্দের দিন আসিবে?

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈতন্য লাইব্রেরি

[মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

tell a Friend

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - দ্বিতীয় পর্ব

থোড়া অ্যাডজাস্ট কর্ লিজিয়ে

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

হিমাচলের তথ্য ~ *হিমাচলের আরও ছবি*

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

ষষ্ঠ অবস্থানঃ সিমলা থেকে মানালি। বিগ ডিল। সিমলা থেকে মানালি যাব, তারপর মানালিকে কেন্দ্র করে আশেপাশের ডে ট্রিপ। মোটামুটি একটা হিসেব কষে বুঝলাম সার, ছ'জন আছি, যদি একটা গাড়ি লগে-লগেই থাকে তবে একবারে সিমলা থেকে মানালি ঘুরে রোহ্তাং ঘুরে সোলাং ঘুরে বশিষ্ঠ ঘুরে হিড়িম্বা-মনু-মণিকরণ-নগ্গর-কুলু সমস্তটা ঘুরে, একরাত মান্ডিতে কাটিয়ে সোওজা কালকা পৌঁছে যাওয়া যাবে, সুবিধাও হবেক আর সস্তাও হবেক মনে হয়। এই ধরনের প্রি-ডমিনেন্ট 'মনে হওয়া'কে সাইডে রেখে সিমলা-মানালি আসুন, কেননা থোড়া থোড়া করে আরও অনেক অ্যাডজাস্ট করা বাকি এখনও!

নালদেহ্রা থেকে সোজ্জা ম্যালে। ও হো, না না, একবার হনুমান মন্দিরে ঢুঁ মেরেছিলাম। ম্যালের পিছনের পাহাড়ের চুড়োয় গেরুয়া বজরংবলীর সুবিশাল মূর্তি সিমলা এলেই দেখতে পাবেন। বাকি থাকে শুধু পৌঁছে যাওয়া। ভয়ানক রকমের বাঁদরের উৎপাত। মন্দির, মন্দিরসংলগ্ন বাগান কিচ্ছু উপভোগ করতে পারবেন না। ফিরে আসবেন কিষ্কিন্ধ্যাবাহিনীর কিছু গাজ্বালানে কারনামা নিজের মেমোরিতে স্টোর করে। কারণ মোবাইল বা ক্যামেরা কোনোটাই তো বের করতে পারেননি, আর যদি করে থাকেন তবে অক্ষত অবস্থায় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেননি নির্ঘাত! অবস্থা এতোটাই খারাপ। আমাদের সামনে একটি ছেলের ক্যামেরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ছেলেটা ক্যামেরাটা বাঁচাতে পেরেছে, চোখের চশমাটা পারেনি। মুহূর্তের মধ্যে চশমাটা মাঝামাঝি দু'টুকরো করে ওখানেই বসে রইল। এত দ্রুত হল ঘটনাটা যে ছেলেটা তাকিয়ে আছে ভাঙা চশমাটার দিকে। বাঁদরটাও নড়ছে না। আমরা চারপাশের লোকজন থমকে দেখছি কান্ডটা। ছেলেটার পেছনে দাঁড়ানো এক লোকাল 'পাব্লিক'-এর উক্তি চশমা হারানো ছেলেটাকে উল্লেখ করে, 'হম্ লা সক্তে হ্যায় ও চশমা; দোসো রুপয়া লগেগা'! ছেলেটা পেছন ফিরে একবার লোকটাকে দেখে, একবার বাঁদরটাকে, আবার লোকটাকে, আবার বাঁদরটাকে। বোধ করি বুঝে উঠতে পারছিল না কে বেশি বাঁদর! ঠিক এই মুহূর্তে সর্বাঙ্গ চিড়বিড় করে ভেতর থেকে যে সপাট চড়টা উঠে আসছে হাতের তেলোয়, সেটা কার গালে বসানোটা যথাযথ হবে?

বজরংবলীর বিশাল মূর্তি

সেদিন ম্যালে পৌঁছতে বেশ সন্ধেই নেমে এল। বাকিরা একটু এদিক-সেদিক, আমরা দুই বন্ধু গাড়ির খোঁজে আতিপাতি। তাই বলে যে বাসের খোঁজ নিইনি একেবারে তা নয়। ম্যালের গোড়াতেই HPTDC-র বুকিং অফিস। এই বন্ধ হব হব করছিল। জানলাম সাড়ে পাঁচশো টাকা পার হেড টিকিট। সকালের একটাই বাস। আর ছটা টিকিটই পড়ে আছে। পিছনের দিকে। এক্ষুনি কাটতে হবে। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। ম্যালে যত্রতত্র ফ্লাইং প্যাসেঞ্জার, ফ্লাইং ড্রাইভার, ফ্লাইং এজেন্ট, ফ্লাইং গাড়ির মালিকরা... আমরা কোলাইড করলাম মালিকের কর্মচারীর সঙ্গে। মোট সতের হাজার টাকায় পাঁচ দিন সিমলা থেকে ফাইনালি কালকা স্টেশন। এখানে বড় গাড়ি বলতে ট্যাভেরা নয় বোলেরো নয় ইনোভা। ঠিক করে বলতেই পারল না কোন্ গাড়ি দেবে। কর্মচারীর হাত ধরে মালিকের হাতে পড়লাম। সা-জোয়ান, স্টাইলিশ, কানে দুল, দাড়ি-পাগড়িরোহিত এক জাঠ। চোখে-মুখে তৎপরতা। নড়া-চড়ায় এমন একটা চাপা ব্যস্ততা যে কোথাও একটা খুব জরুরি কাজ পড়ে আছে, শুধু আপনার জন্য নেহাতই অদরকারি এই গাড়ি-বুকিং-এর কাজটায় রফা করে দিতে এসেছে, কারণ তার কর্মচারী এটুকুও করে উঠতে পারছে না। এটা রফা হলেই সে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজটায় শিফট করে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে আমরাও কি-অহেতুক তাড়াহুড়ো করতে থাকি। যেন আমরাই অন্যায়রকমভাবে আটকে রেখেছি ওনাকে! ফলে যা হওয়ার তাই হল। পাঁচ দিনের ট্যুর ডিটেইলটা নেওয়ার পরই, ম্যালের রাস্তায় যেটা সতের হাজার ছিল, সোওয়া একতলা বাড়ির দুয়ের'তিন অংশ নীচে রেস্টুরেন্টের জন্য ফেলে রেখে, এই যে একের'তিন অংশে ঘাড় ব্যাঁকা করে কোনোমতে দাঁড়াতে পারা যায় একচিলতে বুকিং অফিস, সেখানে এসে ওই সতের হাজারটাই এক ধাক্কায় হয়ে গেল আঠারো হাজার! কেমন মজা! কিন্তু আপনার কর্মচারী যে বলেছিল... "ও কিস্স্সু zaaনে না"। ব্যাস্, রফা দফা। দুই বন্ধু মুখ চাওয়া-চায়ি করে সাব্যস্ত করলাম, তাও আঠারো হাজার-ও কমই, অন্য জায়গায় তো পঁচিশ বলছিল! এখানে আবার নো কার্ড বিজনেস্। নগদা নগদি এবং এক্ষুনি আট হাজার টাকা লাগবেই লাগবে, বুকিং অ্যামাউন্ট। আমি বসে রইলাম। বন্ধু গেল ক্যাশ তুলতে। টেবিলের ওপাশে মালিক মোবাইলে সিরিয়াস। আগে জানতাম না, এখন জানি ওইরকম সিরিয়াস মুখ নিয়ে ম্যাচিওর

লোকেরা মোবাইলে গেম খেলে থাকে। বন্ধু ফিরে আসার পর অ্যাডভান্স দিয়ে স্লিপ নিয়ে বাইরে বেরোতে যাব, ঝমঝম ঝমঝম অঝোর ধারায়। অগত্যা খানিক্ষণ সেই অপারগ ম্যাজেনাইন ফ্লোরের অফিস ঘরটায় আমরা তিনজন। কথায় কথায় চা-ও এলো। একথা-সেকথা, সিমলায় ভিড়, গাড়ির হাই রেট, রোহতাং-এর বুকিং ব্লা ব্লা ব্লা... এই নিছক সময়-কাটানো গুলতানি থেকে যে দুটো বিষয় আপনাদের সবিস্তারে বলার, তার এক নম্বর হল -

সিমলায় গাড়ি ভাড়াঃ "আপ কলকাত্তা মে ট্যাক্সি করতে হো..." এই ভাবে শুরু করে সেই বুকিং মালিক ওখানে আমাদের বসিয়ে যা বলল, বাংলায় তার ভাবার্থ দাঁড়ায়, কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা আপনাদের থেকে গরীব। ওদের 'মজবুরি' যে আপনি যেমন চাইবেন তেমন পাবেন। এখানে, সিমলায়, গাড়িওয়ালারা বেশিরভাগ নিজেরাই হোটেল বা অন্য কোনো ব্যবসার মালিক। ফ্রী টাইমে গাড়ি চালায়। ওরা ওদের মর্জিমত চার্জ নেয়। পোষালে যায়, না-পোষালে বলে দেয় 'নেহি যানা।' সিমলায় যে রোজগার করে তার না পয়সার 'কমি' আছে, না কাস্টমারের। এই হল বাণিজ্য নগরী সিমলা। আমরা শুনে গেলাম। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না আর, কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কোনও গোপন রোজগার আছে ভাই জানি না, তবে চিত্রটা কলকাতাতেও ভিন্ন নয়। আমাদের অবস্থা... ... থাক বেড়াতে এসে এই অনজান নাদানকে আর কী বলব আমাদের কথা। ছাতা মাথায় দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম, যদিও বৃষ্টি ছাতায় মানছিল না, কিন্তু রাত এবং ঠান্ডা দুই-ই বাড়ছে। আজ রাতটুকু সিমলায় শেষ। কাল সকাল সাতটায় হোটেল থেকে গাড়ি; সোজা মানালি। আজ তাই রেস্টুরেন্টে ডিনার। যা বৃষ্টি, লোক কমে আসছে বন্ধ না করে দেয়। বাকিদের সঙ্গে দেখা করে মনমতো রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম হুড়মুড়িয়ে। ওরা সুবিশাল মেনুকার্ড থেকে অর্ডার দিতে থাকুক, আমি ততক্ষনে আপনাদের বলে নিই দু'নম্বর কথাটা...

রোহতাং জটঃ জটই বটে! ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনালের ফতোয়া অনুযায়ী সারাদিনে মোট বারোশো গাড়ি পারমিট পাবে মানালি থেকে রোহতাং যাওয়ার। যতদূর খেয়াল আছে, এই বারোশোর মধ্যে চারশো ডিজেল গাড়ি (ট্যুরিজমের বাস সহ) আর আটশো পেট্রল গাড়ি। পারমিট অনলাইন। যে-কেউ, যে-কেউ এখন গাড়ির পারমিট বুক করতে পারে, শুধু গাড়ির ডিটেইলটা থাকলেই হবে। কী-দারুণ ব্যাপারখানা! যেদিনের পারমিট চাই, তার আগের দিন যথাবিধি সময় মত পি.সি. বা ল্যাপটপ বা মোবাইল নিয়ে তৈরি থাকতে হবে, সঙ্গে গাড়ি ও ড্রাইভারের ডিটেইল। গাড়ি হিমাচল প্রদেশের হতে হবে। গাড়ির সমস্ত কাগজপত্র 'ওকে' থাকতে হবে। বুকিং সারাদিন দুবার খোলে। একবার বেলা ১২টায় আর একবার বিকেল পাঁচটায়। ট্যুরিজমের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ফর্ম ফিলাপ করে বুকিং নিতে হয় (কেমন চেনা চেনা লাগছে না?)। আজ বেলা বারোটার স্লটে কপাল যদি খোলে তবে কাল ভোরের স্লটে আপনার গাড়ি রোহতাং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারে, কারণ সকাল সাড়ে নটার মধ্যে গোলাবা চেক-পোস্টে আপনার পারমিটে সীলমোহর পড়ে যাওয়া চাই। আর আজ বারোটার বুকিং মিস্ করে যদি বিকেল পাঁচটার বুকিং-এ কেল্লা ফতেহ্ করতে পেরেছেন, তবে কাল সকালে হোটেল থেকে খানিক রয়েসয়ে বেরোলেও পারেন, কারণ আগের লপ্তের গাড়ি নিম্নমুখী না-হতে থাকলে তো আর আপনারা যাওয়ার জায়গা পাবেন না। গোলাবাতে আপনাদের ঘড়ি সেই মোতাবেক সেট রয়েছে। ম্যাগাজিনের এই পাতাটিকে যদি কোর্ট পেপার ধরে নিতে পারেন, তবে আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে, আমার মাতৃভাষায় বোল্ড আর ক্যাপিটালে লিখে দিচ্ছি আপনারা নিজেদের চেষ্টায় কোনও বুকিং-ই করে উঠতে পারবেন না! সিস্টেমটা কিন্তু ভেরি সিম্পল্, যেদিন রোহতাং যাওয়া প্ল্যানে আছে তার আগের দিন সময় মতো বুকিং সাইট খুলে গাড়ি বুক করে নিন, সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন পারমিট আপনার মোবাইলে, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ুন সময় মতো...ব্যস্! রোহতাং ঘুরে চলে আসুন। এই তো ব্যাপার! সেটা এই লেখার পাতায়। বাস্তবতা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ব্যাক-টু সিমলা থেকে মানালিঃ সিমলা থেকে কোনো গাড়ি আমাদের রোহতাং-এর কথা দিতে পারেনি; কেউ না! বাকি সব ঘুরিয়ে দেবে কিন্তু রোহতাং... জানা গেল এ মরসুমে উপরে বৃষ্টি হতে থাকায় রোহতাং এখনো খোলেনি তবে আগামী কাল-পরশুর (২২/২৩ মে ২০১৭) মধ্যে যেকোনো দিন খুলে যাবে।

প্রসঙ্গতঃ বলে নিই সাত বছর আগে যখন দু'জনে এসেছিলাম সেবারও যেই সন্ধে বেলা মানালি পৌঁছেছিলাম তার পরের সকালে সেই মরসুমের জন্য প্রথম গাড়ি চলেছিল রোহতাং-এর উদ্দেশ্যে। এক অভিজ্ঞ ভ্রামণিক বন্ধুর পরামর্শে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল থেকে। রাজযোটক একেই বলে মনে হয়, আমাদের ছোট্ট অল্টো গাড়িটির চালক হিসেবে পেয়েছিলাম এক বড় দিলওয়ালা মানুষকে। মানালি থেকে রওনা হয়ে, সেই সকালে আমাদের গাড়ি থেমেছিল যেখানে, সেখানে নেমেই প্রথম চোখে পড়েছিল "রোহতাং-০" মাইল ফলক। সব্বার আগে। সে মরসুমের টাটকা তুষারঢাকা ভার্জিন ভ্যালি! আমরা সেবার রোহতাং-এ অবগাহন করেছিলাম। সকাল আটটা থেকে পৌনে নটা পর্যন্ত থাকার পর গালের হনুদুটো, নাকের ডগা, ঠোঁট ব্যথা করতে শুরু করল ঠান্ডায়। ফিরে আসতে আসতে দেখলাম সারি সারি গাড়ি। দেখে আফশোস হচ্ছিল, আমরা যতদূর যেতে পেরেছিলাম তার কত্তো নীচে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওদের ড্রাইভারেরা বলছে, 'এ-হি উতর যাইয়ে, এ-হি রোহতাং আগয়া, আগে অউর নেহি যায়গা'!

বেপথু হয়ে এই অভিজ্ঞতাটুকু বলে নিলাম এটুকু বোঝানোর জন্য যে, আমাদের ভেতরে এবারও তেমন ভাবে রোহতাং আস্বাদনের ইচ্ছা... বন্ধুদের ঘোরানোর ইচ্ছা।

সিমলার গাড়িওয়ালারা খুব পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, রোহতাং ঘুরিয়ে দেব, এই পয়সাতেই ঘুরিয়ে দেব, আপনি খালি বুকিংটা নিয়ে নেবেন। ওটা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমরা তবু গাড়ি বুক করলাম পাঁচ দিনের জন্যই। এখন মনে হয় ভুল করেছিলাম। সেই ঝমঝম বৃষ্টি ভেজা সিমলা ম্যালে কথা হোলো পরের দিন সকাল শার্প আটটায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে হোটেলের সামনের রাস্তায়। "সাবজি, আপ জলদি আকে সাইড মে খঢ়া হো যাইয়েগা, নেহিতো উঁহা পুলিশ স্ট্যান্ড করনে নেহি দেতা!" ভালো কথা। গাড়ি বা ড্রাইভারের ফোন নাম্বার দেওয়া গেল না অজানা কোনো কারণবশতঃ (আসলে বুকিং-এর টাকাটা পকেটে ভরে ফেললে কি হবে, ওই মারকাটারি বাজারে না ড্রাইভার পেয়েছে, না গাড়ি। কানে ফোনটা লাগিয়ে খুব একখানা তৎপরনাস্তি ভাবসাব দেখাচ্ছে আমাদের সামনে)। পাওয়ার মধ্যে পেলাম ফিল্ড-অ্যাসিস্ট্যান্টের মোবাইল নাম্বার, কাল সকালে যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যিনি আমাদের গাড়িওয়ালার জিম্মায় করতে সকাল সাড়ে আটটায় পঞ্চায়েত ভবনের ঠিক সামনেটাতে মোতায়েন থাকবেন।

সকাল সোয়া আটটায় ফোনে কনফার্মেশন পাওয়া গেল মালপত্র নিয়ে 'রাস্তায় এসে দাঁড়ান', গাড়ি রওনা হয়ে গেছে, বাসস্ট্যান্ডের কাছে গাড়ি জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে। দশ মিনিটে এসে পড়বে। আমরাও 'ধুত্তেরি, আর আসব না এই ঠাঁয়ে' মেজাজ নিয়ে, সদা হাস্যমুখ বিগলিত মিথ্যুক ম্যানেজ মাস্টারের সঙ্গে বাকি দেনা-পাওনা নিয়ে অল্প-খানিক চিক্‌চিকে বিতন্ডা করেই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ভারি ভারি ব্যাগ পিঠে নিয়ে সর সর সিড়ি বেয়ে উঠে গেলাম রাস্তায়। পঞ্চায়েত ভবনের সামনের রেলিংটার সামনে ফালিমতো ফুটপাথ (আসলে ড্রেনের ওপর স্ল্যাব ফেলা)। রাস্তার পাশে এই জায়গাটাই যাহোক দাঁড়াবার মতো। দেখেশুনে এক ভদ্রলোক ট্যুরিস্টের পাশেই গিয়ে পরের পর আমাদের সাত-আটটা ঝোলা এমন ভাবে রেখে দাঁড়ালাম যেন ব্যাস্, আর কেউ না, এই জায়গাটুকু আমাদেরই লাগবে। যেন ব্যাস্, আর থাকব না এখানে। আমাদের গাড়ি আসবে আর আমরা হুস্ করে চলে যাব মানালি। যেখানে ঘিঞ্জি নেই, গরম নেই, লোক-ঠকানো নেই। পরীর মতো সুন্দর এক দেশ। গায় চাপিয়ে নিয়েছি বাহারি জ্যাকেট। এবার তো বুঝবে ভায়া ঠান্ডা কাকে বলে? এই বানিজ্যনগরী থেকে বেরোনো মাত্রই গাড়ির কাঁচ নামাতে পারবে না! একবার গাড়িটা আসুক। ঘড়িতে পৌনে নটা। বাস স্ট্যান্ডের দিক থেকে যত গাড়ি এলো, তাতে ধারনা হল অন্তত দু'কিলোমিটার রাস্তা তো সাফ হয়ে যাওয়ার কথা! একটা করে ট্যাভেরা বোলেরো সামনে দিয়ে যায় আর আমদের ছ'জোড়া চোখ শকুনের মতো ফলো করতে থাকি যতক্ষণ দেখা যায়। নাঃ, এটাও না। ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টকে এতো ফোন করেছি, সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। দাঁড়াতেই বোঝা গেল, এই শর্মা আসলে আমাদের পাশের সেই ভদ্রলোক ট্যুরিস্টটির জন্যও এসেছে...

বাই দ্য ওয়ে, এত্তো ডিটেলে কেন বলছি বলুন তো? কখন থেকে রগড়ে যাচ্ছি, এখনও কিন্তু সিমলা থেকে বেরোতে পারলাম না! যাঁরা প্ল্যান করছেন সিমলা-মানালি তাঁদের জন্য ডিকোডিফাই করে রাখছি, যাতে আফশোসে গা না কামড়ায়...অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে, অহেতুক সময়ব্যয়ে। সে

যাকগে, যা বলছিলাম -

একটু পরে, দু'পক্ষের চাপে ফিল্ড অফিসারটি আর ওখানে টিকতে পারল না। এদিক সেদিক পান-বিড়ির দোকানে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকছে আর অনবরত ফোন করে যাচ্ছে। আমরা ভাবছিলাম গাড়িওয়ালাকে ফোন করছে, একটু পরে বুঝতে পারলাম সেই মালিক বাবুকে ফোন করছিল নিজে সামাল দিতে না-পেরে। মালিক এসেছে, তার সাথে এক সিরিঙ্গে চামচা এসেছে। তার তিড়িং-বিড়িং মালিকের থেকে বেশি, কারণ তার হাতে ফোন নেই। বুঝতেই পারছেন তার কাছে তাই ফোনের নিশ্চিন্ত আড়ালটুকুও নেই। একথা ওকথা দু'কথা চালাচালি হতেই বেরিয়ে পড়ল, আমাদের ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টটি আসলে এই মালিকেরই ছোট ভাই, পার্ফেক্ট একটি 'অকম্মার ঢেঁকি!' আমরা বলিনি, তার দাদাই স্বীকার করছে। আমাদের সামনে নিজের ভাইকে খুব একচোট বকে-চোকে (বেশ পাকা টাইপের বকা পরিমাণমত কাঁচা শব্দের ব্যবহারে) যে সীনটা প্রস্তুত করা হল তার মর্মার্থ বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হোলো না। আমরাও তো কলকাতা থেকে গেছি, নাকি! তখন প্রায় সাড়ে নটা। ফোন চলছে, কোনও গাড়িই আমাদের জন্য সেই ফোনের পরিষেবা সীমার মধ্যে পড়ছে না। অকস্মাৎ হুস্ করে একটা ট্যাভেরা গোছের কিছু এসে দাঁড়াল! এইত্তো! ওমা! ভেতরে যে আরও লোক বসে। জানা গেল এটাও আমাদের গাড়ি নয়। এটা এসেছে পাশের সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের জন্য। এবার বুঝলাম। তিনি আর তাঁর বৌ শেয়ারে এই গাড়িতে মানালি যাবেন। গতকালই এই মালিকের ভাইকে টাকা দিয়ে সিট বুক করে রেখেছেন, কিন্তু এখন দেখছেন তাঁদের জন্য সামনের যে সিটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই সিট দিতে পারছে না গাড়িওয়ালা। ভদ্রলোক আমাদের থেকেও কমবয়সী এক যুবা। একেতো দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় ঘন্টা দুই, এই রোদে-গ্যাঞ্জামে, আর এখন দেখছেন পেছনের সিটে জায়গা। পরিষ্কার বলে দিলেন 'টাকা ফেরৎ দিয়ে দিন, আমরা যাব না।' তা কি হয়? টিউব থেকে একবার পেস্ট বেরিয়ে গেলে আর কি টিউবে তা ঢোকানো যায়? ভদ্রলোকের এককথা (মালিকের ভাইকে দেখিয়ে) 'ওনাকে আমি টাকা দিয়েছি, উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সামনের সিট দেবেন।' পঞ্চায়েত ভবনের পাশটাতেই পাশাপাশি কতগুলি দোকান আর এটিএম আছে, তবে সেগুলি রাস্তা থেকে ১৪/১৫ টা সিঁড়ি ওপরে। আমাদের ফিল্ড অফিসারটি বেগতিক দেখে এক্কেবারে ওপরের সিড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...নাগালের বাইরে। আর সিড়ির নীচ থেকে তার মালিক-দাদা একবার উর্দ্ধ 'সা'-এ ভাইকে গাল পাড়ে আর পরক্ষণেই খাদের 'সা'-এ কাস্টমার কে রাজি করাতে চায়। তবে কিনা জাঠ বেওসাদার তো, উদারা-মুদারা-তারা সব সপ্তকেই একই রুক্ষ্ম কর্কশ ঝাঁজ থাকে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। পুলিশ বারবার বলছে গাড়ি সরিয়ে নিতে। এর মধ্যেই সিড়িঙ্গে চামচাটি গাড়ির অন্য প্যাসেঞ্জারদের বলে-কয়ে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলেছে মাঝের সিটের জানলার ধার থেকে দুটো জায়গা। এবার মালিক-চামচা দু'জনেই ট্যুরিস্টকে একটু চাপ দিতেই থাকল, "থোড়াতো অ্যাডজাস্ট করনা হোগা, থোড়াতো অ্যাডজাস্ট কর্ লিজিয়ে।" ভদ্রলোকেরও কিছু করার নেই। যেতেও হবে। টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে। মালিকের হাতে গোছকরা যে টাকার বান্ডিল মালিক তলোয়ারের মতো বাগিয়ে আছে, তাতে হয়তো ওনার টাকাও রয়েছে। শেষ একবার বললেন, 'এভাবে হয় না। (সিঁড়ির ওপরে থাকা মালিকের ভাইকে দেখিয়ে) উনি টাকা নিলেন, কথা দিলেন, আর এখন..." এর বেশি বলতে পারেননি ভদ্রলোক। চামচাটি গন্ধকঠাসা তুবড়ির মতো চিড়বিড় করে বলে উঠল, "আরে ছোড়িয়ে উসকা বাত্, উ বুরবক্ হ্যায়। উসকো কুছ নেহি আতা। দেখিয়ে ক্যায়সা উপর চঢ়কে খঢ়া হ্যায়!" আর সঙ্গে সঙ্গে আবার দাদার খ্যাচানি। এতোটা দেখে, ওই চুড়ান্ত বিরক্তিকর অবস্থায়ও আমরা হেসে ফেললাম। ভদ্রলোকও আর কিছু না-বলে, মনে হয় বৌকে ডাকতে গেলেন। আমরা মালিককে ছেঁকে ধরলাম আমাদের গাড়ির জন্য। তার একহাতে ফোন আর এক হাতে টাকার গোছা...তলোয়ারের মতো করে ধরা।

আর বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গাড়ি এসে গেল। ট্যাভেরা নয় ইনোভা। বাসস্ট্যান্ডের দিক থেকে নয়, ঠিক উল্টো দিক থেকে এসে দাঁড়াল। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে উঠে পড়লাম। ওখান থেকে কিছুটা বাসস্ট্যান্ডের দিকে গিয়ে খালি জায়গায় সাইড করে দাঁড়াল গাড়ি। দু'একজন নেমে পড়ে মালপত্র ছাদে ও ডিকিতে তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ড্রাইভার উঠে গেলেন ছাদে। এটুকু আসতে আসতে ড্রাইভার জেনে নিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আঠারো হাজারে রফা হয়েছে এবং তাতে তিনি স্পষ্টতঃই অখুশি। আমরা আট হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি আর দশ হাজার দেব কালকায় একথাও পরিষ্কার করে নিলাম। আর আমরা জেনে গেলাম যে, গাড়িটির মালিকই গাড়ি নিয়ে এসেছেন। ওনার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। সকাল আটটার সময় ফোন করে ওনাকে পিড়াপিড়ি করা হয়। উনি এই কড়ারে রাজি হয়েছেন, আমাদের এখান থেকে তুলে উনি মানালির পথে এগিয়ে দেবেন মান্ডি অবধি। মান্ডিতে ওনার ড্রাইভার আমাদের মিট করবেন। তার পরের পাঁচ দিন সেই ড্রাইভার থাকবেন আমাদের সঙ্গে। গাড়ির মালিকের বোনের কোনও অপারেশন আছে দু'দিন পরে। এখানেও গাড়ির মালিক আর ট্রাভেল মালিকের মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যাশিত বচসা। নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। সেই জাঠ্ বেওসাদার সব্বাইকে টুপি-টাপা পড়িয়ে শেষবারের মতো আমাদের গাড়ি চাপড়ে দিয়ে যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, আর আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল মানালির পথে, তখন ঘড়িতে দশটা। মন-মরা ড্রাইভারকে আমরাই বললাম, "কেয়া কিজিয়েগা, থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে!" বাহারি জ্যাকেট খুলে ফেলেছি। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে ফেলেছি। বানিজ্যনগরী সিমলা আর বানিজ্যনগরী কলকাতার মধ্যে এখন পার্থক্য হল শুধু রাস্তার একদিকে পাহাড়ের গা, আরেকদিকে শূণ্য। সিমলার জ্যাম পেরিয়ে গাড়ি যখন খানিক স্বচ্ছন্দ গতিতে, একটু পরেই গাড়ির কাঁচ তুলে দিতে হল। ভাবছেন ঠান্ডা কনকনে পাহাড়ি হাওয়া দিল বুঝি। না মশাই, না। লেখার শুরুতেই সাবধান করেছিলাম এ-বিষয়ে। সিমলা নগরী ও তার পার্শ্ববর্তীতে যানজটের সমস্যা মেটাতে হিমাচল সরকারের তারিফ করার মতো পদক্ষেপ, রাস্তা চওড়া করা। মাইলের পর মাইল, পুরোনো রাস্তার ধারের পুরোনো পুরোনো গাছগুলি কাটা হচ্ছে। সারা রাস্তা ধুলোময়। তাই কাঁচ তুলে দিলাম। জ্যাকেটের পর ভেতরের ফুল-স্লিভ টী-শার্টটাও খুলে ফেললাম। পাতলা ফিনফিনে একটা গোলগলা টী পরনে। মাথা ভাবতে শুরু করেছে, গরম জামা-কাপড়ের এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে নাকি! মন তখনও নিজের মনেই আলাপ ঝালছে, 'মানালি তো বাকি, কুলু তো বাকি'...

সপ্তম অবস্থানঃ গাড়ি হাতবদল হল মান্ডি পেরিয়ে। আমাদের সারথি একশ শতাংশ স্থানীয়। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। যেখান থেকে দায়িত্ব নিলেন তার অদূরেই তাঁর বাসস্থান। আবার নগ্গরের পথ ধরে মানালি ঢুকলে, মানালি পৌঁছানোর অল্প আগেই তাঁর আরও একটি বাসস্থান যেটি নির্মীয়মান। ওনাকে আমরা এর পর থেকে স'বাবু বলে সম্বোধন করে থাকব, কেমন? ওপরের বর্ণনা থেকে হাল্কা অনুমান করতেই পারছেন, সচরাচর বিয়াসের যে পাড় ধরে এসে বেশিরভাগ গাড়ি সিমলা থেকে মানালি ঢোকে এবং সোজা ঢুকে এসে থামে মানালি বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড তথা ম্যালের দোর-গোড়ায়, স'বাবু আমাদের সে-পথে নিয়ে যাবেন না। স'বাবু যেই শুনলেন মানালিতে আমাদের হোটেল নদীর অপর পাড়ে, উনি বেশ কিছুটা ঘুরপথে এসে ওনার নির্মীয়মান বাড়িতে মিনিট কয়েকের হল্ট দিয়ে, আমাদের মানালি ঢোকালেন বাঁ-হাতে বিয়াস, বাঁ-হাতে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউট (মানালি), বাঁ-হাতে ঘড়িতে সাড়ে সাতটা ইত্যাদি রেখে, রাস্তার ডান হাতে আমাদের হোটেল...

মানালি ঢুকতে ঢুকতে গাঢ় সন্ধে। মানালি ঢুকতে ঢুকতে ঘেমে-নেয়ে-ঘাম-বসে আমার বাঁ-নাক বন্ধ, ডান নাক দিয়ে কাঁচা জল গড়াচ্ছে। মানালি ঢুকতে ঢুকতে রাস্তায় একবার বেলা বারোটায়, আবার একবার বিকেল পাঁচটায় একাধিক মোবাইলে জোড়া জোড়া হাত চোখ ক্রেডিট কার্ডে সাধ্য মতো তৎপর হয়েও পরের দিনের রোহতাং বুকিং ধরা যায়নি। রেলের রিজার্ভেশনের চেয়েও দীর্ঘ ফর্ম। সাতান্ন রকমের খোপ। সব পেরিয়ে যেতে পারলেও, পেমেন্টের জায়গা থেকে মিনিটখানেক ঘুরিয়ে (চক্র) ঘুরিয়ে বের করে দেওয়া, কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে সব বুক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি চেনা প্রতিবন্ধকতাগুলি তো আছেই, যা অচিরেই আপনাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে ছাড়বে 'এভাবে সম্ভব না'। তাহলে কিভাবে সম্ভব? ধীরে...এখনো তো আজকের রজনী বাকি। মানালি ঢুকতে ঢুকতেই প্ল্যান করে ফেললাম, কালকের দিনটা তবে সোলাং-বশিষ্ঠ ও অন্যান্য।

আগেরবার ছিলাম হোটেল বিয়াসে। তখনই বিয়াসের পাশের সেতু পেরিয়ে অপর পাড়ের এই রাস্তাটা দেখেছিলাম; বেশ লেগেছিল! গুটিকয় হোটেল নিয়ে একটা সরু পথ কোথায় যেন উধাও! এবার তাই নেট ঘেঁটে হোটেল বুকিং-এর সময় দৈবাৎ বিয়াসের অপর পাড়ে হোটেল পেয়েই ভেতরে বাড়তি একটা উদ্দীপনা ছিল। এবার আগেরবারের সেই উধাও রাস্তাটারই উধাও প্রান্তের দিক হতে ঢুকে এসেছি। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক দেখছি। অলক্ষ্যে আমার চোয়াল ঝুলে গেছে। এই রাস্তাটির সামনের-মাথায় একটি কাঠের পুল। ভালো করে নজর করলে বোঝা যাবে, চঞ্চলা বিয়াসের থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ভোলা-ভালা রাস্তাটা চলে গিয়েছে। বিয়াসই হঠাৎ খুনসুটি করে নিজের পাড় ভেঙ্গে অল্প একটু জায়গা জুড়ে রাস্তাটির নীচের মাটি খেয়ে নিয়ে চলে গেছে। ঠিক যেভাবে বাংলার কোনো কোনো গ্রামে রাস্তা কেটে হাঁ করে দিয়ে আন্দোলন জানানো হয়। ওই হাঁ-এর ওপর দিয়ে কাঠের পুলটা; ভারি রোমান্টিক, কিন্তু রোমান্স চটকে যাবে যেহেতু ওর ওপর দিয়ে দিনের ও রাতের বেশির ভাগ সময়টা সিঙ্গল্-ওয়ে ট্রাফিক। ফল আমাদেরও পেতে হল। দেশপ্রিয় পার্কের দুর্গাপূজাকে হার মানায় যানজট। আর আমি ঝোলা চোয়াল নিয়ে ভাবছি এতো গাড়ি এলো কোত্থেকে? সাত বছর আগে দেখা সেই একপাশে পড়ে থাকা রাস্তাটার দুপাশ ধরে এই প্রাসাদোপম হোটেলিকার সারি, উঁচু উঁচু পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝে ছোট্ট মানালিতে ঝুপ করে নেমে আসা সাঁঝকুয়াশার ঢাকা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে হাজার হাজার ওয়াটের ঝলমলানি! গাড়ির ধোঁয়া খেতে খেতেই খুঁজে পেয়ে গেলাম আমাদের বুক করা হোটেলটি। এখানে নাম নিচ্ছি না, তবে আমরা সন্তুষ্ট। পাঁচ দিনের জন্য গাড়ি নিয়েছি অর্থাৎ গাড়ি আমাদের সঙ্গেই থাকবে, সঙ্গে ড্রাইভার। কিন্তু দশ মিনিটের দূরত্বে যদি ড্রাইভারের নিজের বাড়ি থাকে তবে? স'বাবু জানতে চাইলেন সকালে কটার সময় আসবেন। আমরা তাকে টাইম বলে মাল নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। দুই আর তিন তলা মিলিয়ে তিনটে রুম পেয়েছি। আগামী কাল অন্য রুম খালি হলেই এক ধাপ নামিয়ে আনার ম্যানেজারোচিত সুভব্য আশ্বাস নিয়ে নিজেদের রুমে গেলাম। অভ্যাসমত পর্দা সরিয়ে সরিয়ে ওই অন্ধকারেই আন্দাজ করে নিলাম কোন্‌খান থেকে কেমন ভিউ পাব সকালে। বেশ বুঝতে পারলাম তিন তলায় ওঠা-নামা কষ্টকর হলেও, বাইরে হোটেলগুলোর যা গা-রেষারেষি হাইট তাতে হোটেলের চুড়োয় অবস্থান না করলে সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে মানালির বরফটুপি পড়া প্রকান্ড পাহাড়গুলোর চুড়োয় প্রত্যূষ দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে না। আবার উল্টো দিক দিয়ে এটাও সত্যি, হোটেলের সংখ্যাধিক্যর দরুণই হয়তো এমন মনমত হোটেল সিমলার থেকে অনেক কম দামে পেলাম।

অষ্টম অবস্থানঃ গত সন্ধেয় হোটেলে ঢোকার পর, গরম জলে সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে, গরম গরম দু-দু'কাপ চা খেয়ে যখন আগামী কালের রুট প্ল্যানিং চলছে, তখনই প্রায় রাত নটা বাজে। হেঁটে মিনিট পনেরো, ম্যালে আর যেতে ইচ্ছা করছে না শরীরে ধকল এতোটাই। খিদেও পেয়েছে। প্ল্যান তো চলতেই থাকবে; বুফে খাওয়ার তাড়নায় চলে গেলাম নীচে ক্যাফেটেরিয়ায়। বেশ ভালো। রুমে ফিরে আসতে আসতে ভরা পেটে শরীর ভারি হয়ে এলো। বিছানায় শুয়েছি যখন তখনও নাক দিয়ে কাঁচা জল গড়াচ্ছে। কম্বল গায়ে নেওয়া যাচ্ছে না। চাদরই যথেষ্ট। মানালি, মে মাসের ২৩ তারিখ, রাত সাড়ে দশটা। শুধু কলের জলটা যা কনকনে! ঘুমিয়ে পড়লাম দশ বছর আগেকার হি হি ঠান্ডার কথা ভাবতে ভাবতে।

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের বাগানে

মানালি গেলে কেউ মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ভেতরটা ঘুরে দেখতে যান কিনা জানি না। আগেরবার আমিও যাইনি। এবার সুযোগ হল। আমার বন্ধু এখানকার প্রাক্তন ট্রেনি একজন। তাই 'প্রবেশ নিষেধ' এলাকায় যদি কোনও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ি তবে উদ্ধার করার জন্য বন্ধু আছে। তারই উৎসাহে সকালের চা শেষ করেই হেঁটে হেঁটে আমাদের হোটেল থেকে মাত্র পঁচাশি মিটারখানেক দূরে পৌঁছে গেলাম ইন্সটিটিউটের গেটে। বিয়াস নদীর তীর ধরে প্রায় একর কুড়ির মত জায়গা ঘিরে অটল বিহারী বাজপেয়ী হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট। হাট করে খোলা সাদামাটা লোহার গেট পার করে পিচবাঁধানো রাস্তা ধরে আলগা চালে প্রবেশ করলাম। রাস্তার ঢাল নেমে গেছে। নিশ্চল পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে থাকা সটান গাছের গুড়ির ফাঁক দিয়ে দিয়ে সকালের তেরছা রোদ গায় মেখে মেখে আমরাও গড়িয়ে নামছি। কই কোথাও কোনো 'কাঁহা জায়েঙ্গে আপলোগ' এগিয়ে এলো না তো? প্রবেশ-গেট থেকে গুনে গুনে সতেরো পা ভেতরে ঢুকলেই অনুভব করবেন গাড়ি-বাড়ি-হোটেল-দোকান-শব্দ-দুষণ-ঘড়ির কাঁটা ফেলে রেখে প্রকৃতির নিজস্ব সাধের বাগানবাড়িতে ঢুকে পড়েছেন! অধুনা গেট দিয়ে ঢুকেই প্রবেশপথের বাঁপাশ দিয়ে খান চার/পাঁচ হোটেল/গেস্ট হাউস ভেতরেও রয়েছে। খানিকটা হলেও স্বরোজগার যোজনা। একবার মনে হল, ইস্‌স্ এখানে কেন থাকলাম না। আপনাদের জন্যই বলা, যদি মানালি যান, থাকার জায়গা হিসেবে ইন্সটিটিউটের অতিথিনিবাস বেছে নিতে পারেন। থাকার খরচায় এমন কিছু ফারাক নেই বাইরের হোটেলের থেকে। ভেতরে হোটেল হওয়ার কারণেই হয়তো আমরা এখনো কোনও রকম বাধার সম্মুখীন হইনি। বন্ধু আমাদের দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছে কোথায় ট্রেনি হোস্টেল, কোথায় অডিটোরিয়াম, কোথায় ডাইনিং হল; কোথাও গাছের থেকে টায়ার ঝুলছে, কোথাও আঁকা-বাঁকা সরু কাঠের বিমের ওপর দিয়ে চলা, তারপরেই ঝাঁপ দিয়ে নেমে গুঁড়ি মেরে আড়াআড়ি রাখা প্রতিবন্ধকতার নীচ দিয়ে বুকে হেঁটে যাওয়া, তারপর আবিষ্কার করে ফেলা বুক দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাটির যে-জায়গাটা দেবে গেছে, পরশুর বৃষ্টির জল এখনো অল্প জমে আছে সেখানে, আশ্চর্য! রোদ ঠিক মতো পৌঁছতে পারেনি এখানে। এখানে জমা জলের পাশে শ্যাওলা, শ্যাওলার ওপর বাহারি একটা প্রজাপতি এসে বসেছে। বুকে হাত রেখে স্বীকার করুন আপনি প্রজাপতি ভুলতে বসেছিলেন। যাও বা মনে ছিল, তা হয় হাল্কাআআআ ফিনফিনে সবুজ বা হলুদ বা ধুসর এক-কালারের। অনেক অনেকক্ষণ পর যেন ভেতর থেকে টের পেলাম, 'হ্যাঁ বেড়াতে এসেছি।' দৈনন্দিন থেকে বাইরে কোথাও এসেছি। আর এই এতো এতো কিছু যে বললাম...হোস্টেল, লাইব্রেরি, মিউজিউয়াম, বাগান (উফফফ! বাগান সেকি বাগান! অপার্থিব সারল্যে ভরা) এ সমস্ত কিছু অগাধ প্রকৃতির ঘোমটায় আড়াল। এক অপরিমেয় প্রকৃতি ছাড়া কোনো কিছুই জাহির নয় ইন্সটিটিউটের এই বিশ একর জায়গাটুকুতে! আধঘন্টার ওপর এখানে আছি। বন্ধু আছে বলে আরও বেশি মজা পাচ্ছি, ও গাইড করছে। এক প্রশস্ত জায়গায় দেখলাম প্রায় শ'খানেক ট্রেনি দাঁড়িয়েছে, আমরা যেমন স্কুলে প্রেয়ার গ্রাউন্ডে দাঁড়াই। সঙ্গে রয়েছে গ্রুপ অফ ইন্সট্রাক্টরস্। কিশোর-কিশোরী থেকে নবযুবা পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ট্রেনি তথা ইন্সট্রাক্টর চোখে পড়ল। শুনেছি চল্লিশ বছর বয়সের ব্যক্তিও ট্রেনিং নিতে পারেন। আবার এও শুনেছি একমাত্র এখানেই বয়সের উর্দ্ধসীমা দু-এক বছর

শিথিলও করা হয় সবিশেষ অনুরোধে। এসব আপনাদের জন্য, যাঁরা ভাবছেন ইস্‌স্‌ সময় চলে গেছে!

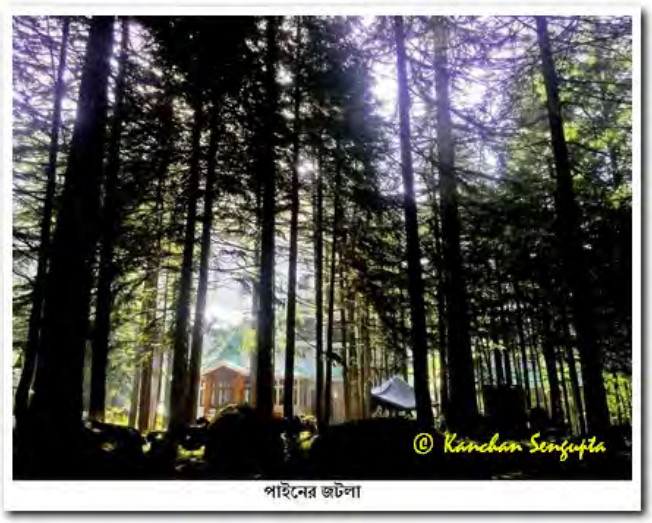

পাইনের জটলা

আমরা এখন রোদের সঙ্গে, গাছের ছায়া, ভেজা মাটির গন্ধ, ফুলের রেণু, আর পাতলা রোমাঞ্চ মেখে বুঁদ হয়ে আছি। এখন সারাদিনের কর্মসূচি ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছোটদের দল যাবে নদীর ধার ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ট্রেক করতে। আর তুলনামূলক বড়দের দল রওনা হল সোলাং অভিমুখে। এই ফুরসতে আমাদের বন্ধুর দেখা হয়ে গেল তার ট্রেনারের সাথে। সামান্য অমায়িক কুশলবিনিময় ও রোমন্থন হল। তারপর আমরা ছোটদের সারিবদ্ধ বড়-সড় দলটার সঙ্গে পায় পায় চলে এলাম নদীর পাড়ের অংশটায়। ছোটদের নির্ঘাত আলাদা আলাদা হাউস আছে, কারণ এক এক দল এক এক রঙের জ্যাকেট পড়ে আছে। উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট কালার। ওদের লাইনটা চৌহদ্দির একেবারে শেষ সীমায় এসে, পাঁচিলের এক ফোকোল গোলে বাইরের বিস্তৃত জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আমরা এখানেই থমকে গেলাম। বিয়াসের শব্দ আসছে কানে। এতো ঘন পাইনের বন আপনি এ-তল্লাটে পাবেন না। ইন্সটিটিউট বুক দিয়ে আগলে রেখেছে এই জঙ্গলটুকুকে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হবেই "হেথা উর্দ্ধে উঁচায়ে মাথা দিল ঘুম...যত আদিম মহাদ্রুম।" অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়াচ আমাদেরও খানিক লাগল। দেখলাম প্রায় দুই মানুষ উঁচু আর পাঁচ/ছয় মানুষ হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালে বেড় দেওয়া যাবে এমন দুটো বিশালাকৃতি পাথর (ওয়ান পিস্‌) পাশাপাশি হাত চারেকের ফারাকে রাখা। বন্ধু বলল, একটাতে উঠে আরেকটায় লাফ দিয়ে আসতে হয়েছিল ট্রেনিং-এর সময়। একটায় ওঠার চেষ্টা করলাম খুব উৎসাহের সঙ্গে। আর পাথরগুলোর এমন গড়ন নীচে দাঁড়িয়ে মনে হবে একটু ঝাঁপালেই উঠে পড়ব। আদতে করতে গিয়ে দেখা গেল বন্ধু পেছন থেকে না ধরলে সেই ফিচেল পাথর আমায় সরসরিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিত তার মসৃণ গা থেকে। বন্ধুর সাপোর্টে অর্ধেক উঠে গেলাম, তারপর পা-গুটিয়ে বসে আছি...এবার নামব ক্যামনে! ওমনি পটাপট আমার অসহায়তার ছবি উঠে গেল মোবাইলে মোবাইলে। কোথা দিয়ে যে ঘন্টা কাবার বোঝাই গেল না। ওদিকে স'বাবু এসে পড়বে এবার। ফেরার পথে চোখে পড়ল, গাছে গাছে হ্যামক টাঙ্গানোর ব্যবস্থা। আর দুটো টেন্টও। অ্যাডভান্সড ট্রেনিং পর্যায়ে এসব থাকে। চোখে পড়ল একটা দোতলা সমান বেয়াড়া দেওয়াল, যার গায় নানাভাবে সিমেন্টের গুট্‌কা লাগানো। মক্‌ রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং-এর জন্য। ওটা আর ট্রাই করার সাধ হয়নি। ফেরার পথে চোখে পড়ল ইন্সটিটিউটের বেড়া, ঝোপ, মোটা মোটা গাছের গুড়ির ফাঁক দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে বরফচুড়ো বলছে 'বেলা হয়ে গেছে, এবার বেরিয়ে পড়।' ফেরার পথে চোখে পড়ল, আমরা বেরোচ্ছি আর ট্রেনিদের একটা দল (ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে-মেয়েরা) সামনের পাহাড় থেকে রক-ক্লাইম্বিং করে ফিরছে, তাদের সারা গায়ে শ্রান্তি ও উল্লাস!

নবম অবস্থানঃ সকালের জলখাবার। পরের দিন ভোরবেলা যদি রোহতাং-এর গাড়ি পাওয়া যায় - ছান্‌বিন্‌। শুনতে পেলাম গতকালও নাকি মাঢ়ী পর্যন্ত পার্মিশন মিলেছে। আজ খুলছে রোহতাং-এর বুকিং। আবার এই মরসুমের প্রথম দিন আমরা যাব রোহতাং...পাব ভার্জিন ভ্যালি! ঘুপচি দোকানে আলুর পরোটা বলে দু'জন গেলাম একদিকে, আরেকজন গেল আরেক দিকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কালকের রোহতাং-এর ইন্তেজাম করে ফেলতে হবে। স'বাবুর তো পোয়াবাহান্ন... কাল সারাদিন শুয়ে-বসে বাড়ির অন্ন। আমরা এদিকে হেদিয়ে মরছি। আরও কত এক্সট্রা গচ্চা যাবে কে জানে! সাত তাড়াতাড়ি গেলাম ম্যালের ওপর ট্যুরিজম্‌-এর অফিসে। অফিসের দরজায় তালা। বারান্দায় এক প্রায় প্রৌঢ় কর্মচারী খাতাপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে বসছেন। বুকিং শুরু হবে কিন্তু বারোটায়। বেলা বারোটার সময়ও যদি আমরা মানালিতে পড়ে থাকি তবে তো... আর ভাবতে ভালো লাগছে না। ওনাকে বললাম আমাদের ছ'জনের ভাড়া আগাম রেখে দিন। জবাব এলো, "নিয়ম নেহি।" রিকোয়েস্ট করলাম, টেবিলের এই ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিন, আমরা যেখানেই থাকি, বারোটায় ফোন করব, ম্যালে পৌঁছেই বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে দেব। "নিয়ম নেহি।" অপারগ হয়ে ওনার সামনে প্রায় ককিয়ে উঠলাম, 'তাহলে আপনিই কোনো উপায় বলুন, কাল না-হলে আমাদের আর যাওয়া হবে না!' "নিয়ম নেহি।" স্যার, কাল আপনাদের বাস যাচ্ছে তো রোহতাং? "হম্‌হে ভি নেয়ি মালুম বুকিং মিলেগা কি নেহি। বাহার সে গাড়ি লে লিজিয়ে।" কোথায় এসে পড়লাম? স্বাভাবিকটা এতটাই অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ যে অস্বাভাবিকটা কত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে! সরকারের বাসে আর আমাদের যাওয়া হচ্ছে না এটা স্পষ্ট। উন্মাদের মত ম্যালের দু'পাশের প্রায় সবকটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ঢুঁ মারছি। থরে থরে কম্পিউটার সাজিয়ে বসে আছে টানটান। যেন অলিম্পিক...হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট...ফাইনাল। লক্ষ্য করে দেখুন, কেউ চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না। শুধু কানে শুনছে, "ভাইয়া রোহতাং জানা হ্যায়, সিক্স পার্সনস, কল্‌কে লিয়ে গাড়ি মিলেগা?" মর্মান্তিক সাইলেন্স। আপনি যখন ভাবছেন আপনার কথা আদৌ শুনল কিনা, ভাবছেন না-থাক বেরিয়ে যাই, তখন উত্তর আসবে, "হাঁ মিলেগা।" আবার পজ্‌। বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বা কথার টোনে আপনি কিন্তু ভরসা পাবেন না। সেই মানালি আর নেই। হাঁ মিলেগা, জরুর মিলেগা, কিঁউ নেহি মিলেগা, আপকো তো বঢ়া গাড়ি লগেগা। ট্যাভেরা দে দেঙ্গে। সুবহ বোলিয়ে কিতনে বজে নিকলেঙ্গে। জলদি নিকলনেসে আরাম সে ঘুমায়েঙ্গে, মাঢ়ী হোকে রোহতাং, লৌটনেকে টাইম মাঢ়ীমে খানা খা সক্‌তে হো, ফির সোলাং, ফির বশিষ্ঠ, ফির গলফ্‌ ক্লাব, ফির টাইম রহনে সে হিড়িম্বা ঘুমা দেঙ্গে... বড় গাড়ি আড়াই হাজার, ছোট গাড়ি দুহাজার, আমি নিজে দরাদরি করে সতেরশোতে ঘুরেছি। মহাশয়, জেনে রাখুন, সেই দিন আর নেই। যে গাড়ি সকালে রোহতাং যাবে সে আর কোথাও নিয়ে যাবে না আপনাকে। আর আপনার যদি বরফ-চাপা কপাল হয়, তবে তো সুব্‌হান-আল্লাহ্‌! মাঢ়ী থেকে তিন-চার কিলোমিটার রোহতাং-এর দিকে গিয়ে যদি বরফে সব ঢাকা থাকে সত্যিই তো গাড়ি বেচারা কি করবে! তখন আমরা ট্যুরিস্টরাই গাড়ি থেকে নেমে "কত দূর...আর কত দূর...রোহতাং" বলতে বলতে থপ থপ করে হাঁটব বরফের ওপর দিয়ে। হাফেরও হাফ ফার্লং যেতেই হাঁফ ধরে আসবে। তারপর ওখানেই 'এই তো বরফ, এই তো রোহতাং' বলে বেশ নাচানাচি করে নেব, ব্যাস্‌। ফিরে এসে হয়ে যাব বেচারা। ভাড়া সেই রোহতাং-এরই গচ্চা যাবে রে! 'গাড়ি তো মাঢ়ী সে আগে গয়া না! আভি রস্তা খুলা নেহি হ্যায় তো হম্‌ কেয়া করেঙ্গে সাব্‌জি? আমরা ওই জন্য খুব পার্টিকুলার ছিলাম। খুব ভালো করে জেনে নিয়াছিলাম যে কাল গাড়ি রোহতাং টপ যাবে কিনা। ২০১০-এ যত অবধি গিয়েছিলাম ওইখানে পৌঁছতেই হবে। তারপর বন্ধুদের নিয়ে স্লিপ কেটে নামব ভার্জিন ভ্যালিতে।

মাছের বাজারে পদ্মার ইলিশ এলে বড় দোকানের বড় দোকানি সবাইকে এক ঢং-এ মাছের দাম বলে না, দেখবেন লক্ষ্য করে। আবার খরিদ্দারের পকেটের জোর থাকুক না থাকুক একবার না একবার ইলিশের দরটা জানা চাইই। দোকানি ঠারেঠোরে তাকিয়ে যদি দ্যাখে পোটেনশিয়াল বায়ার নয়, তাহলে দেখবেন কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাজার বা পনেরোশো বলে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ওতে আপনি দমে গেলেন তো একরকম, আর চেগে গেলেন তো দোকানির মুনাফা! আমরা চেগেই ছিলাম, কিন্তু রথের কারবারিরা এমন দর হাঁকতে লাগল, আঠারা...চৌদা...সাড়ে বারা... আমরা দমেই গেলাম। জাস্ট ভাবতে পারছিলাম না, শুধু মানালি থেকে রোহতাং যাব আর ফিরব বারো হাজার টাকা? দোকানিদের মুখের রেখায়ও সেই মাছবাজারিদের তাচ্ছিল্য হুবহু। এখনও আজকের রোহতাং ট্রিপের বুকিং সেশন শুরু হয়নি, কিন্তু ওরা নির্বিকার...কনফিডেন্ট। আসলে উল্টো দিকের চিত্রটাও সমান করুন। যে-গাড়ি আজ বুকিং পাচ্ছে, সে আগামী সাত-দশ দিনের মধ্যে আর বুকিং পাবে না। তার টার্ন আসবে ঘুরে। এই সাত-দশ দিন সে, তার পরিবার খাওয়া-দাওয়া করবে না? তাই তাদের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না আড়াই হাজার টাকায় রোহতাং ও সংলগ্ন জায়গা

ঘুরিয়ে আনা। তারাও মওকা বুঝে যে-যা পাচ্ছে দর হাঁকছে। ভাড়ার কোনো উর্দ্ধসীমা নেই। পর্যটক যোগানেরও তো কোনো বিরাম নেই! দিনে গড়ে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার ট্যুরিস্ট আসছে মানালিতে। দিনপ্রতি মাত্র বারোশো গাড়িতে কতজন আর রোহতাং গিয়ে উঠতে পারছেন। বাকিরা অপেক্ষা করে থাকছেন সেকেন্ড চান্সের জন্য। এর মধ্যে পরের দিনের আরো নতুন সাত হাজার এসে পড়ছে। গ্রীন ট্রাইবুনাল এসব নিয়ে ভাবছে না। ওদের ভাবার কথাও না। HPTDC এই সমস্যা নিয়ে ঠিক কি ভাবছে সে-এক রহস্য! সিন্ডিকেটের রেট পাঁচ হাজার টাকায় বেঁধে দিয়ে বাকিটা যেন দৈবের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছেন সিন্ডিকেটে যাচ্ছি না কেন! সেখানে বুকিং-এর কোনো গ্যারান্টি নেই। একটা গাড়িও বুকিং না পেতে পারে।

২০১০-এ যে রোহতাং ভ্যালি পেয়েছিলাম

মোটামুটি হার মেনে পরোটার দোকানে ফিরে এসেছি যখন, আরেক বন্ধু খবর আনল, এক জায়গায় পাওয়া গেছে নয় হাজার টাকা। মনে হল সস্তা। মনে হল ঠিক আছে হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটিংটা তবে বাদ। কেনাকাটা তো আগেরবার করেছিলাম। এবার না-হয়... মনে হল এতদূর এসে রোহতাং যাব না? আমাদের জন্যই তো কাল রোহতাং খুলছে... রইল পরোটা, ছুটলাম তিনজনে। অর্ধেক অগ্রিম। সামান্য আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমাদের উদ্ধারকর্তার গোসা হয়ে গেল। 'ছোড়িয়ে, আপকো জানা নেহি হ্যায়' বলেই দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে আবার সাধ্য সাধনা করে ঘরে ফিরিয়ে...থুড়ি তার দোকানে ফিরিয়ে আনা গেল। হাতে গুনে গুনে টাকা দেওয়া হল। আবার এও শুনতে হল যে কাল বা আজ রাস্তায় মিলিটারি বা যে-কেউ যদি জানতে চায় কত টাকায় ভাড়া করেছি গাড়ি, তাহলে যেন বলি পাঁচ হাজার টাকা। "আপ হম্‌কো দেখিয়েগা, হম্ আপকো দেখেঙ্গে" এরূপ বাণী বেরিয়ে এল আমাদের তৎকালীন মসিহার মুখ থেকে। বাধ্য ছেলের মত মাথা নেড়ে, হোটেলের নাম ঠিকানা দিয়ে, বারবার করে ড্রাইভারের নাম্বার দিতে বলে আমরা পরোটা খেতে গেলাম। একে অপরকে হাতে তালি দিয়ে বললাম, তব্বে, অ্যাটলাস্ট রোহতাং যাওয়া হচ্ছে! বাইরে বাইরে ঝলমলে করে রাখলাম মুখমন্ডল, কিন্তু আমার কথা বলতে পারি, ভেতরে আর সেই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম অনুভব করছি না। যেন অপচয় হয়ে গেল আকাঙ্ক্ষার। পরোটা শেষ করে ম্যালের চত্তর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম সিন্ডিকেটের মাইকে রেকর্ডেড ভয়েসে ঘোষণা হয়ে চলেছে, 'দূর-দূরান্ত থেকে আগত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে HPTDC-র পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে হার্দিক শুভকামনা। যাত্রীদের কাছে অনুরোধ কেউ যদি আপনাদের থেকে নির্ধারিত ভাড়ার বেশি ভাড়া চায় তবে আমাদের দপ্তরে এসে অভিযোগ জানাতে পারেন। সকল পর্যটকদের উদ্দেশ্যে... ...' বন্ধু আমার বাঁ কনুইয়ের কাছটা খামচে ধরে বলল, "বল্, ইচ্ছা করে না গিয়ে এই রসিদ দেখিয়ে নালিশ করে দিই, নয়তো থাবড়া মেরে এদের এই মাইকবাজি ঘুচিয়ে দিই?" আমি পাক্কা বানিজ্যিক ভাষায় বন্ধুকে শান্ত করে দিলাম, "থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লে, ইয়ার!"

দশম অবস্থানঃ মূলতঃ রাস্তায়। মানালি ও তৎসংলগ্নর পথে পথে। উপভোগ(আন্তির) অতিশোয়াক্তি না করে নিতান্ত শর্টে ও সাঁটে এই বেড়ানোটুকুর বর্ণনায় যাব। স'বাবুকে বলে রাখাতে ম্যালের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলেন। আমরা রওনা হোলাম সোলাং-এর দিকে। রাস্তা, রাস্তার পাশে নদী, তার ওপাশে ঢেউ-খেলানো পাহাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে বরফ চূড়া - এই মোটামুটি মানালির ভূ-ভঙ্গীমা। আর সামনে কালো মসৃণ পিচ-বাঁধানো... এপথে চলতে চলতে যদি এক পাল ভেড়া এসে আপনার পথ আগলায়, আপনি কি খুব অসন্তুষ্ট হবেন পান্থ? মনে হয় না। বরং আপনা হতেই আপনার মুখে হাসি আর হাতে ডি.এস.এল.আর. চলে আসবে (বা মোবাইল ক্যামেরা)। আমাদেরও এসব ধরতে করতেই দেখলাম সোলাং চলে এল। দেখলাম ভ্যালিটির থেকেও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভ্যালিতে প্রবেশপথের পাশে যে দৈত্যাকার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ চলছে, সেটি। এই সুড়ঙ্গ যাবে রোহতাং পাস। মানালি থেকে গাড়ি নিয়ে পাঁই পাঁই চালিয়ে রোহতাং পৌঁছনো যায় তিন ঘন্টায় (যদি না যানজট...)। এই সুড়ঙ্গ পথে শুনছি কুড়ি-নাকি-চল্লিশ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সেখানে। সে এক প্রকান্ড কর্মকাণ্ড। গাড়ি থেকে যেখানে নামলাম, চারিদিকে থিক থিক করছে গাড়ি। খুব স্বাভাবিক। শুধু কি আমরাই সোলাং দেখতে আসব নাকি! মধ্যে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ধাতব শুঁড়ওয়ালা এক্সক্যাভেটর, হাইড্রা ইত্যাদি। এই দিকটায় যে গুটিকয় সুউচ্চ পাইন এখনো মাথা তুলে খাড়া রয়েছে তাদের একাকীত্ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ২/৩ খানা প্যারাশুট পাক খাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চশমার কাঁচে এক ফোঁটা জল পড়ল। চোখ নামিয়ে নিলাম। বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। এই দিকটায় পুরোটাই রাবিশ্ এখন। রাবিশের ওপরই কার-পার্কিং। এখান থেকে দেখলে মনে হচ্ছে সোলাং ওটি-তে হাফ-সার্জারি অবস্থায়। অমন মনোমোহিনী রূপের অধিকারিণীকে এমন অবস্থায় দেখতে ভালো লাগছে না। আমরা ভেতরে গেলাম।

এই-ই সোলাং?

সোলাং-এর মুখ্য আকর্ষণ বোধহয় এখন প্যারাগ্লাইডিং! তারপর রোপওয়ে। পাহাড়চূড়োয় শিবমন্দির। তারপর বিশালাকার বলের মধ্যে ঢুকে লুটোপুটি খেতে খেতে গড়িয়ে যাওয়া! তারপর খাওয়া-দাওয়া। আর এসবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা। বরফজমা সময়ে না গেলে এই মোটামুটি দস্তুর। এছাড়া ঘোড়াও আছে পাহাড় চড়ার জন্য, তবে এবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কম চোখে পড়ল তারা। যাহোক, এসবের মধ্যে একটা ব্যাপার মিস্ হয়ে যায় প্রায়শই এবং মনের খুব তলায় চলতে থাকে, 'আর কী? আর কিসের জন্যে ছুটে এসেছি এখানে? এটাই কি সোলাং ভ্যালি ঘোরা? কিছু কি বাদ যাচ্ছে?' হতেই পারে এরকমটা মনে, কারণ সত্যিই একটা কিছু বাদ যাচ্ছে, যার জন্য এখানে আসা। আর তা হল, জায়গাটা নিজে। যদি পারেন, নিজেকে এই কোলাহল থেকে সরিয়ে উপত্যকার মাঝটায় গিয়ে দাঁড়ান। মনে মনেই দাঁড়ান, কারণ সশরীরে যেতে পারবেন না ওখানে। ওখানটা ঘেরা আছে, তাও আবার একপাশ কাঁটাতার দিয়ে। ঘেরা জায়গাটায় প্যারাগ্লাইডাররা লাফ দিয়ে পড়ছে। সুতরাং... (আমাদেরই কে-যেন বলল, আচ্ছা আহাম্মকের মতো কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে কেন জায়গাটা? ওই ওপর থেকে যে নীচে আসছে

অনেক সময়ই এদিক ওদিক হচ্ছে। এমনকি ঘেরা জায়গার বাইরেও পড়তে দেখলাম। ওই কাঁটাতারের ওপর যদি পড়ে কি হবে? এর উত্তরে আমাদের মধ্যেই কে একজন বলল, "দাঁত কেলিয়ে বলে দেবে, থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে"। আমরা সবাই সেটা মেনেও নিলাম।)

বাদ দিন, আপনাকে সোলাং দেখাই। মনে মনে মাঝটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এবার যেদিক থেকে প্যারাশ্যুটগুলো রওনা হচ্ছে সেদিক থেকে দেখতে থাকুন, আর ধীরে ধীরে নিজের ডানদিকে ঘুরতে থাকুন। সময় নিন, সময় নিন। ঘোরাটার ওপর নয়, দেখাটার ওপর সময় দিন। ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরার পর অদ্ভুত এক উপলব্ধি হবে। সামনের পাইন আর পাহাড় - জোড়া দৃশ্যের মন্তাজ তো মন ভরাবেই। যে অনুভূতিটুকু আপনার রোমে রোমে রোমাঞ্চ জাগাবে, তা হল আপনার আবিষ্কার। আপনি আবিষ্কার করবেন ছোটবেলায় ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে কতবার ভেবেছেন ওর মধ্যে ঢুকে যাই যদি... আবিষ্কার করবেন সত্যিই আপনি তেমনই এক স্বপ্নময় সিনারির অংশ হয়ে গেছেন। এটাই সোলাং। এটাই হারিয়ে যাচ্ছে। এই মজাটাই মাঠে মারা যাচ্ছে ফূর্তিবাজির চক্করে। প্রকৃতির থেকেও বড় প্রশ্ন "মানুষ খাবে কি?" না না, আপনি আপনার মতো ঘুরুন বাপু, আমরা বেরোলাম সোলাং থেকে। বৃষ্টিও হঠাৎ হঠাৎ কয়েক ঝলক। এক প্লেট করে কাটা ফল, এক গ্লাস করে জুস্ খেয়ে রওনা হলাম বশিষ্ঠ অভিমুখে। বেলা তখন দুপুর গড়াবে গড়াবে। ঠিক হল বশিষ্ঠে মধ্যাহ্নভোজ।

এখানে অধুনা মানালির মূল সমস্যাটা নিয়ে বলে রাখা দরকার। মানালি যাঁরা গেছেন তাঁরা সহজেই ধরতে পারবেন, যাঁরা যাননি তাঁদের জন্য ছবিটা বোঝাবার চেষ্টা করি। মনে করুন মানালি ম্যালটা আসলে আপনার বাড়ি। একতলা হাত-পা ছড়ানো এবং চারিপাশে বাগান সম্বলিত এক সুরম্য বাসস্থান। এবার কল্পনা করুন, আপনার বাড়ির বারান্দা থেকে নামলে বাগান, বাগান পেরোলে ছোট গেট, গেট পেরোলে সামনে দিয়ে চলে গেছে পুরসভার হাই-ড্রেন। আর এই হাই-ড্রেনটা পেরোনোর জন্য আপনার বাড়ির গেটের নাক বরাবর পেতে দেওয়া আছে ঢালাই সিমেন্টের স্ল্যাব। ড্রেন পেরোলেই ড্রেনের সমান্তরাল রাস্তা। সহজেই অনুমেয় যে, আপনি রাস্তা ধরে ডান দিকেই যান বা বাঁ-দিকেই যান, রাস্তায় উঠতে গেলে আপনাকে ওই স্ল্যাবের ওপর দিয়ে ড্রেনটা পেরোতেই হবে। এবার কল্পনা থেকে নেমে আসুন প্লি-z। আপনার সাজানো বাগানওলা বাড়ি ভুলে যান। বারান্দা, গেট ইত্যাদি ভুলে যান। বিপাশার মতো মায়াবী নদীকে পুরসভার হাই-ড্রেনের সঙ্গে তুলনায় টানার জন্য আমায় ক্ষমা করে দিন। আপনার বাড়ির জায়গায় মানালি ম্যালটিকে বসান। ম্যালের যে পাশ দিয়ে বিয়াস বয়ে চলেছে, সেদিকে এসে বিয়াস টপকে যে রাস্তায় আপনি পড়বেন, সেই রাস্তাটিই বাঁ দিকে চলে গেছে বশিষ্ঠ, সোলাং, রোহতাং, উধাও... আর ডান দিকে বাঁক নিলে আমাদের হোটেল, মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট, নগ্‌গর, উধাও... যাক্‌গে! আশাকরি চলনসই মতো বোঝানো গেছে। বুঝতেই পারছেন যেদিকেই যান, নদীটি পেরোতে হচ্ছে। এখানে সিমেন্টের স্ল্যাব নয়, রয়েছে লোহা-লক্করে বাঁধা দুটি সেতু। পাশাপাশি। খুব জোর ফিট-দশেক চওড়া হবে। একটি দিয়ে ম্যাল থেকে নদী টপকাতে হবে, আর অপরটি দিয়ে নদী টপকে ম্যালে প্রবেশ। সমস্যা এখানটাতেই। বাঁদিকে কোন্ সে উধাও থেকে, রোহতাং থেকে, সোলাং থেকে, বশিষ্ঠ থেকে, আরো কত ইত্যকার জায়গা থেকে সারি সারি গাড়ি সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে আসছে মানালি, এরা সব সকালে বেরিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের গাড়ি তো আছেই। আবার ডানদিকেও কোন্ সে উধাও থেকে, কত কত গাড়ি কাতারে কাতারে এসে পৌঁছচ্ছে মানালি। বিয়াস পেরিয়ে ম্যালে ঢুকতে গেলে ওই একটি পুল। আর গোটা দুই কন্‌স্টেবল্। বালি ঘড়ির পেটের মতো অবস্থাটা। ব্রিজের ওপর দিয়ে ধীরে নড়ে-চড়ে যতক্ষনে একটি গাড়ি পার হল, ততক্ষনে আরও সাতটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল ইঞ্জিন বন্ধ করে লম্বা যানজটের পিছনে। গাড়ির সারি হয়তো ছাড়িয়ে গেছেএএএ...

পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়িদের সার বেঁধে প্রতীক্ষা

আমাদের কথাই ধরুন না। সোলাং থেকে এক প্লেট ফল খেয়ে বেরোলাম, বশিষ্ঠে লাঞ্চ করব ভেবে। সোলাং থেকে দু'পা যেতে না যেতেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ির লাইনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন স'বাবু। এবার মানালি বেড়াতে গিয়ে দেখে এলাম, দু-তিন ঘন্টার জ্যাম আম বাত্। দিনবিশেষে বা কপালবিশেষে ছ'ঘন্টাও দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে। সোলাং থেকে বশিষ্ঠ মন্দির মাত্র বারো কিলোমিটারের মত রাস্তা। মানালির দিকে আসতে আসতে, মানালি ঢুকবার কিলোমিটার দেড়েক আগে রাস্তাটা বাঁদিকে তেরছাভাবে বেয়াড়ারকম চড়াই ভেঙে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। গাড়ি যায়, তবে জায়গায় জায়গায় রাস্তা বেশ সরু। মুখোমুখি গাড়ি এলে এপাশে ওপাশে সরে কোনোমতে জায়গা দিতে হয়। রাস্তা কিন্তু খুব বেশি পাকদন্ডী না-খেয়ে মোটামুটি চড়াই। দুপুর প্রায় একটা। মে মাসের অসহ্য গরম মানালিতে। তার ওপর আকাশে মেঘ থাকায় খানিক গুমোট। গাড়ি যানজটে ধুঁকে ধুঁকে বশিষ্ঠ যাওয়ার রাস্তার মুখটা পেল যখন, একটু হাফ ছেড়ে গা এলিয়ে দিলাম সিটে। মাথা গরম করে দেওয়া খিদে পেয়েছে। রাস্তার ধারের কুলকুল বিয়াস, তার পাশে ফ্রেমে বাঁধানো অপার্থিব সিনারি কিছুই শান্তি দিচ্ছে না। জ্বরে পান্‌সে হয়ে যাওয়া মুখের স্বাদের মতো ফালতু রসিকতায় মজিয়ে রাখতে চাইছি একে-অপরের তিরিক্ষে মেজাজ! এই অবস্থায় বেশ খানিকটা চড়াই উঠে বাঁ-দিকে খাদের ধার ঘেঁষে আবারো দাঁড়িয়ে পড়লেন স'বাবু। সামনে যতদূর চোখ যায় ইয়া ইয়া ট্যাভেরা, ট্রাভেলার বাসগুলো, ছোট গাড়িও আছে। সব স্ট্যান্ড স্টিল। উল্টো দিক থেকে ফিরতি গাড়িগুলো কোনোমতে পাহাড়ের গায় হয়ে থাকা আগাছা ছেঁচড়ে তাও নীচে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের লাইনটি নট্ নড়ন-চড়ন। গাড়ি থেকে এক বন্ধু নেমে গেল। অবশ অনুভূতি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি বেচারা কি অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে সামনের জগদ্দল পাথরগুলোকে নড়াবার। একটু নড়ে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। এ বলে 'উসকো বলিয়ে অ্যাডজাস্ট করনে, ম্যায় পিছে কিউ লুঁ', তো ও বলে, 'পিছেওয়ালা অ্যাডজাস্ট কিজিয়ে না!' কী যে হল, গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। উষ্ণ প্রস্রবণ নয়, শালা এই জ্যামের উৎস কোথায় আজ দেখেই ছাড়ব। গাড়ির সারি পেরিয়ে পেরিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যার আগে আর গাড়ি নেই। লাইনের একেবারে প্রথম গাড়িটি রাস্তার কিছুটা বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। গাড়ির অ্যাক্সেলটি গেছে ভেঙে। মিস্ত্রি এসে তারই মেরামতের কাজ করে চলেছে। এখনও বহু বাকি। লাইনের দ্বিতীয় গাড়িটি হল একটি ট্রাভেলার বাস। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল, কারণ উল্টোদিক থেকে গাড়ি নীচে নামছিল। এবার ফাঁকা হয়েছে, অথচ এখনো সে সামনের গাড়িটিকে পেরিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না। বাসটি অকেজো গাড়িটিকে বাঁদিকে রেখে তার ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করার চেষ্টা করে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবার আর একচুলও এগোলে বাসটির পেছন অংশের সঙ্গে গাড়িটির পেছন অংশের ঘষা লেগে যাবে। আর গাড়িটিকে বাঁচাতে বাসটি যে আরো কিছুটা ডানদিকে সরবে তারও উপায় নেই। রাস্তার ধার ঘেঁষে বাড়ি। বাড়ির সিঁড়ির রেলিং তবে নির্ঘাত ভাঙ্গা পড়বে। এমতাবস্থায় রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। ওপর থেকে বেশ কিছু বাইক নেমে এসেছে, তারা অপেক্ষা করছে আর গর্জন করছে। সমতলে কী পাহাড়ে, বাইকের অ্যাটিচিউড হল, জ্যাম-ফ্যাম আমরা পরোয়া করব না, একটু ফাঁক পাই সাইড গলে যাব... তারপর দুনিয়া ভাঁড় মে...

আমি দেখলাম, বিশালদেহী ফ্রেঞ্চকাট এক পালোয়ান গোছের স্থানীয় ছেলে, হাত নেড়ে নেড়ে গাইড করে বাসটিকে কোনোমতে আবার তার আগের অবস্থান, ওই অকেজো গাড়িটির পেছনে এনে দাঁড় করাল। আমিও ভাবছি এবার কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। ওমা! ছেলেটি বলল, "অব

ইয়হি উতরকে পয়দল্ চলে যাইয়ে"। মানে? হতচকিত ড্রাইভার বলে বসল, "ক্যায়সে যায়ে?" ছেলেটি হাত নেড়ে যা বলে গেল তার মানে - 'তইলে zaaমর্জি করুন গে।' বলেই, খাদের পাশে তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নিজের বাড়িতে সেঁধিয়ে গেল বিলকুল!

হতভম্ব আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এই চত্বরটুকুতে এই মুহূর্তে আমিই একমাত্র যে কলকাতা থেকে এসেছি। মাথা এমনিতেই গরম ছিল। রোখ চেপে গেল। কলকাতা মোডে চলে গেলাম। প্রথমেই দেখলাম লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পরপর গাড়িগুলোর মধ্যে দু'হাত / আড়াই হাত করে ফাঁক। খুব ডাঁটের সঙ্গে ওই আটকেপড়া বাসের পিছনের গাড়ির ড্রাইভারগুলোকে পিছু হটাতে সচেষ্ট হলাম। গাঁইগুঁই করলেও দেখলাম অল্প অল্প পিছোলো। আমার বন্ধুও চলে এসেছে এরই মধ্যে। আমাদের দেখাদেখি আরো দু'এক জন। আর ওই অকেজো গাড়ির অনুতপ্ত ড্রাইভার তো ছিলেনই। এসব সিচুয়েশনে বটল্ গ্রীন কালারের ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর মিলিটারি জংলা টুপি মনে হয় বেশ কাজে দেয়। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। সে যাইহোক, মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই বাসটিকে বেশ কিছুটা পিছনে পিছোনো গেল জায়গা করে। এবার বাসটি পুরোপুরি রাস্তার ডান অংশটা নিয়ে সোজাসুজি দাঁড়াল। এরই মধ্যে সুড়ুৎ সুড়ুৎ গলে যাওয়া বাইক ও পথচারী তো আছেই। তাও একসময় অল্পক্ষণের জন্য থামানো গেল তাদের। এবার বাসটি একদম সোজা আসবে রাস্তার রাইট সাইড ধরে, যাতে বাঁপাশের অকেজো গাড়ি বা ডানপাশের বাড়ির রেলিং কোনোটাই ক্ষতিগ্রস্থ না-হয়। শেষমেস আমরা সফল হোলাম, আর সর্সর্ করে সব মৃত গাড়িগুলি খোঁয়াড়ি ভেঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠে একে একে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমরা ফিরে এলাম আমাদের গাড়িতে। ভাবতে অবাক লাগে, এই যে এতোগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, প্রায় সবকটিই স্থানীয় গাড়ি, ট্যুরিস্ট নিয়ে এসেছে। চালকেরা সবাই স্থানীয় এবং বেশিরভাগই কম বয়সী। অথচ কেমন হাত-গুটিয়ে বসে থাকতে পারে!

বশিষ্ঠ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে

বশিষ্ঠ মন্দিরের পথের শেষটুকু হেঁটে পৌঁছতে হয়। গাড়ি পার্ক করার পর নেমেই দু'দ্দাড় করে এগিয়ে গেলাম প্রথম যে খাওয়ার দোকানটা খোলা পেলাম, সেদিকে। তখন বাজে প্রায় বেলা তিনটে। সেদিন লাঞ্চে ছিল গরম হাত-রুটি, স্বাদু আলু-জিরা আর ব্রহ্মতালু অবধি খিদে। অতুলনীয়!

পাহাড়ে আলো তাড়াতাড়ি কমে। তবে এখনো বেশ পরিষ্কার। অল্প চড়াই পিচরাস্তাটা সো-ও-জ্জা উঠে গেছে নাক বরাবর। দুপাশের হরেক-মালের পসার দেখতে দেখতে চলেছি। মানালি ট্যুর প্ল্যানে শপিং থাকলে, বাজেটের বেশ কিছুটা বশিষ্ঠের জন্য তুলে রাখা যায়। এ জায়গা হতাশ করবে না। আমরা আটকালাম, আবার চললাম হেলেদুলে। মন্দিরের দোরগোড়ায় রাশিকৃত জুতো। বাইরে থেকে মন্দিরের ভেতরের পরিসর যেরূপ ঠাহর হচ্ছে, তাতে এত লোক ঢুকেছে কোথায়! কালো, শীতল, গম্ভীর ও মসৃণ পাথরের মেঝে আর অঢেল কারুকার্যমন্ডিত আজো জেল্লাদার কাঠের প্রথাগত মন্দির। এছাড়া, সত্যি বলছি, খুব একটা নজর করে দেখিনি। জুতোমোজা খুলে রেখে ঢুকে পড়লাম। মন্দিরের ভেতরে স্বল্প পরিসরে ছাদখোলা প্রাঙ্গণ। খোলা প্রাঙ্গে আবালবৃদ্ধবণিতার ভিড়। আমার আগ্রহাদি সেদিকে ছিল না। অনুসন্ধিৎসু এক কোণায় দেখতে পেল বেশ সরু এক দোরপথ, সাবধানে, এপথে হাফ-চৌকাঠ; পাথরের (তবে কি চৌপাথর বলা সমীচীন হবে)। সরু প্যাসেজ গ'লে ডানহাতেই বিশালাকৃতি পাথর বাঁধানো চৌবাচ্চা। তাতে সামান্য ঘোলাটে উষ্ণ জল। সিস্টেম ভারি সুন্দর। চৌবাচ্চার তিন দিক ধরে হাঁটা যায়। চতুর্থ বাহু দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। সেই দেওয়াল উঁচু হয়ে প্রায় কুড়িফুট উঁচু প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। চৌবাচ্চার যে বাহু প্রথমেই চোখে পড়ে মন্দিরের ভেতর দিয়ে এলে, সেদিকটায় বেশ কিছুটা জায়গা আছে চৌবাচ্চার আগে। শান বাঁধানো নীচু মেঝেতে সেখানে হাতির শুঁড়ের মতো ধারায় জল পড়ছে চৌবাচ্চার এদিকের দেওয়ালে করা পাশাপাশি তিন-তিনটে ছিদ্র পথে। এ-জল কুণ্ডেরই জল। চৌবাচ্চায় নামার আগে যাতে স্নানার্থীরা পদযুগল পরিষ্কার করে নেন, তার জন্য এই ব্যবস্থা। স্নানার্থীদের জন্য আরও ব্যবস্থা আছে। চৌবাচ্চার বাকি দুপাশের দেওয়ালও যথেষ্ট উঁচু এবং সেখানে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখবার হেতু আংটা লাগানো আছে। তেল-সাবানটা না-মাখাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কে বলে দেবে? কেউ না বলে দিলে তো আমরা... এদিকটা ছেলেদের। দেওয়ালের ওপারে মেয়েদেরও আছে। আমি হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে নিলাম। পা ধুয়ে নিলাম হাতির শুঁড়ের ফোয়ারায়। তারপর গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসলাম এক পাশে। ভেজার ওপরই বসলাম। ওটুকু ভিজুক। কত লোক! সবাই প্রায় ল্যাঙ্গট বা জাঙ্গিয়া পড়া। যাঁরা চৌবাচ্চার ভেতর নেমে পড়েছেন, তাঁরা ওপরের লোকেদের নেমে পড়ার জন্য উস্কাচ্ছেন। এক বাঙালি ভদ্রলোক তার দশ/বারো বছরের ছেলের সঙ্গে নেমে পড়েছেন চৌবাচ্চায়। কেউ কেউ যেন প্রায়শই আসেন। যেন নিজের ঘরের স্নানঘরের মতোই চেনা। তৎপরতার সঙ্গে পা ধুচ্ছেন, জামা-প্যান্ট খুলে টাঙ্গিয়ে রাখছেন যেন প্রতিদিনই রাখেন, পৈতে পেঁচিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে মন্ত্র বিড়বিড় করলেন এবং নেমে পড়লেন। এমন ভঙ্গিমা, যেন এখানে যেমন-তেমন ভাবে স্নান করলেই হল না, স্নানেরও একটা গাইড বুক আছে। কেউ কেউ স্নান করে উঠেই ধুপ জ্বেলে মাথা ঠেকাচ্ছে চৌবাচ্চার ওদিকের দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে। ওখানে কোনো ঠাকুর আছেন, আমার এখান থেকে ভালো ঠাহর হচ্ছে না। আমি পা ডুবিয়ে বসেই আছি নিশ্চল। ভালো লাগছে এভাবে থাকতে। একই সঙ্গে এক পরম আরাম আর নিবিড় অবসন্নতা পেয়ে বসছে আমায়। সূর্যের আলো কমে আসছে দ্রুত...

কিন্তু মোবাইলের নয়। যথার্থ নাম এই বস্তুটির। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধও মনে হয় জগৎসংসারের প্রতিটি হোমো সেপিয়েন্সকে এতোটা অস্থির করে তুলতে পারেনি! অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই চটকা ভাঙ্গল চৌবাচ্চাস্থিত বাচ্চাটির বাবার হুঙ্কারে। হুঙ্কারের অভিমুখ লক্ষ্য করে দেখি, ওপাশের দেওয়ালের কুলুঙ্গির সামনেটায় যে চিলতে দাঁড়ানোর জায়গা, সেখানে দাঁড়িয়ে এক চোস্তা জিন্স, নিজের সঠিক সাইজের থেকে দু'সাইজ ছোট, প্রায়-এয়ারটাইট কালো জামা, কপালের ওপর ঝুঝকো চুল তামাকের-ধোঁয়া-লাগা-লাল; আমাদের দিকে পেছন ফিরে, হেলে, উর্দ্ধে উঁচায়ে স্মার্ট মোবাইল সেল্ফি তুলতে উদ্যত। প্রথমে জল ছিটিয়ে ও পরে সমবেত হুঙ্কারে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া গেল ওই চৌহদ্দি থেকে। আমিও গুটি গুটি উঠে এলাম। আগের মতোই হেলেদুলে, পশলা বৃষ্টি গায়ে মেখে আমরা যখন গাড়ির স্ট্যান্ডে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা পাঁচ (জানিনা কিভাবে মনে আছে টাইমটা)। গাড়ি বশিষ্ঠ ছেড়ে নামতে শুরু করতেই 'আবার কাল আসব' বলাবলি করে নিয়েই স'বাবুকে বলা হল, এবার তবে হিড়িম্বা চলুন। স'বাবুর হাতদুটো স্টিয়ারিং থেকে খুলে কাঁধের দু'পাশে ঝুলে পড়ল। এই অ্যাটিচিউডটা দেখেই আমাদের মেজাজ জ্বলে গেল। এই প্রায়ান্ধকারে ওই মন্দিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, এটা কি আমরা বুঝি না? নাকি আমরা এখনো বুঝিনি মানালির জ্যাম কী বস্তু। আমরা তো হাড়ে হাড়ে জানি এখন, এই বশিষ্ঠ থেকে নেমে মানালির ওই ব্রীজের মুখ অবধি পৌঁছতে লেগে যেতে পারে দু'ঘন্টা! কিন্তু এটা কিরকম, কড়কড়ে আঠেরো হাজার টাকা গুনে দিয়ে দিন-রাতের জন্য গাড়ি ভাড়া নিলাম ড্রাইভার সমেত, আর সাঁঝ হতে-না-হতেই স'বাবু বলেন 'বাড়ি যাই, বাড়ি যাই।' খানিক বিতন্ডাই হল গাড়ির মধ্যে। ভালোই হল, গড়িয়ে গড়িয়ে ব্রীজের মুখে চলে এলাম। স'বাবুকে রেহাই দিয়ে আমরা হেঁটে চলে এলাম ম্যালে। সন্ধ্যার মানালি ম্যাল গমগমে, জমজমাট। দেখা হোলো এক পুরোনো বন্ধুর সাথে। যশবন্ত সিং।

ওর একটা অল্টো আছে। সাত বছর আগে যখন শুধু আমি আর আমার বৌ এসেছিলাম, তখন রোহতাং যাওয়ার জন্য গাড়ি বুকিং করেছিলাম সিন্ডিকেটে। বলেছিলাম ভোর পাঁচটায় পাঠাবেন। আমাদের এক ভ্রমণ বিশারদ কলিগ-কাম-বন্ধু আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। বলেছিল,

দ্যাখো রোহতাং যাওয়ার দিন আলসেমি করবে না। বুকিং-এর সময় ড্রাইভার বলতেই পারে, মাত্র ৫২ কিলোমিটার রাস্তা ৩ ঘন্টার বেশি লাগবে না পৌঁছতে, ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে কী করবেন ঠান্ডায়। তবু তোমরা জেদ ধরবে, ভোর পাঁচটাতেই রওনা দিতে হবে, নতুবা রোহতাং পাসের শেষ সীমায় যেতে পারবে না। এতো গাড়ি যায়, দেরীতে বেরোলে অনেক নীচেই থেমে যেতে হবে। রাস্তা ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। ড্রাইভার হেসে হেসে বলবে, এইত্তো রোহতাং, যান ঘুরে আসুন।

হ্যাঁ সে-সময় বলার মতো ঠান্ডা পড়ত মানালিতে। তবু লেপের তলা থেকে বেরিয়ে গিজারে জল গরম করে স্নান করেছি। এটা প্রতি সকালে করতাম। স্নান করে নিলে ঠান্ডা অনেক কম লাগত, ঝরঝরে থাকতাম। আর সঙ্গে রাখতাম কেক, ডিম, ড্রাই ফ্রুটস্ যেকোনও লং ড্রাইভে। কারণ দূরের রাস্তার মাঝে মাঝে ওয়েসিসের মতো খাবার জায়গাগুলো মোলায়েম করে গলা কাটে। হাই অল্টিচিউডে তো কথায় নেই... যাক্‌গে, সেবারের সেই ভোরে আপার-লোয়ার উলিকট, তার ওপর জিন্স, গায়ে মোটা জামা, ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি পড়ে রেডি ছিলাম হোটেলের লাউঞ্জে। গাড়ি এলো সোয়া পাঁচটায়। হোটেল বিয়াস থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে গাড়ি যখন রোহতাং পানে, দূরের বরফ চুড়ার গা-থেকে রাতের পুরোটা নীল তখনো মুছে ফেলতে পারেনি সোনালী রঙ। আমি বললাম, পাঁচটায় বলেছি আর পাঁচটাতেই চলে এলেন! আপনার নাম কি ভাই? মিতভাষী হাসিমুখ ছেলেটি বলেছিল, "ইয়শওয়ান্ত্ সিং! আপ লোগভি তৈয়ার খড়ে থে, দেখকে আচ্ছা লগা, লোগ টাইম দেকে লেট করতে হ্যায়, সোচতা হ্যায়, ড্রাইভার হ্যায়, প্যায়সা দিয়া হ্যায়, ওয়েট করেগা।" ব্যাস, যশবন্তের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। (লেখার বাকিটুকুতে যশবন্তের প্রসঙ্গ এলে 'যশবন্ত'ই লিখব বুঝলেন, আর আপনারা পড়ার সময় উচ্চারণ করবেন 'জ-শো-ব-ন্তো', কেমন? তা নাহলে আনন্দবাজার রাগ করতে পারে।) গাড়ির কাঁচ নামালেই মোটা মোটা জামাকাপড় ভেদ করে ঠান্ডা হাওয়া কামড়ে বসছে হাড়ে। আর যশবন্ত পড়ে আছে একটা খয়েরি ট্রাউজারের ওপর প্রায় 'বিবর্ণ কালারের' একটা ফুলহাতা জামা, আর তার ওপর ঘিয়ে রঙের হাতে বোনা, হাফ হাতা সোয়েটার। ভুলে যাবেন না, একথা বলছি মাত্র সাত বছর আগের মে মাসের মানালির। আর আমরা যাচ্ছি রোহতাং। আরো খেয়াল করবেন আজ এই মরসুমে প্রথম রোহতাং যাওয়ার রাস্তা খুলেছে এবং বাস্তবিকই, আমাদের গাড়ির সামনে রোহতাং অভিমুখে আর কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে না।
কিছুদূর যেতেই পথে এক জায়গায় পরপর সার দেওয়া অস্থায়ী দোকান ঘরের একটির সামনে দাঁড় করাল গাড়ি। এখান থেকে সেই বিশেষ নিকার-বোকার ভাড়া নিতে হবে, যা আমাদের তিন হাজার নশো আটাত্তর মিটারে জমে থাকা ওই বরফ-ঠান্ডার সঙ্গে যুঝতে সাহায্য করবে। সঙ্গে রবারের গামবুট আর রবারের দস্তানা। এক এক সেট যতদূর মনে পড়ছে তিনশ টাকা করে ভাড়া করেছিলাম। যশবন্তের জন্য ভাড়া করতে গেলাম তো ও বলল, "ম্যায় তো গাড়িসে নেহি উত্‌রুঙ্গা"। আমার খুব ভালো মনে আছে, আজ থেকে মাত্র সাত বছর আগে, আমরা আমাদের সমস্ত পরিধানের ওপর দিয়ে ওই ডাবল্ সাইজ প্যারাস্যুট কাপড়ের নিকার-বোকার পড়ে নিয়েছিলাম, সঙ্গে জুতো আর গ্লাভ্সও, তবু আমাদের গরম লাগেনি!

গুলাবা - রোদ্দুর এখানে পক্ষপাতদুষ্ট

রোহতাং যেরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্যমন্ডিত, রোহতাং-এ পৌঁছবার রাস্তাও সেইরূপ স্বপ্নালু। সুবিশাল পাহাড়ের গায়ে চুলের মতো জড়িয়ে থাকা পথের শত শত বাঁক বেবাক বিস্ময়ে পেরিয়ে যাচ্ছি আর সামনে (কী পাশে) অন্তঃকরণ খালি হয়ে আসা খাঁ খাঁ খাদ, আবার কোন অতল থেকে মাথা তুলে চরাচর ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই সামনে আরও এক বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী হয়ে। তাদের প্রায় কোলের কাছে সঞ্চরণমান টুকরো আদুরে সাদা মেঘেদের ছায়া পড়েছে গায়। যেন দাওয়ায় বসে হাসিমুখে মা তাকিয়ে আছেন উঠোনে আদুল গায়, টলোমলো পায়, অবোধ শিশুর ধুলো-খেলার দিকে। বিশেষত যখন রোহতাং আর মাত্র পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার দূরে, তখন যে অঞ্চল দিয়ে গাড়ি পেরোলো, তার ঘাসের রঙ, গাছের পাতা, ছোট ছোট নাzuক বাঁক নিয়ে র‍্যাটেল-স্নেকের ভঙ্গীমায় পাহাড়ের গা-বেয়ে হারিয়ে যাওয়ার সফর, আর সকালের সূর্য... দেখে মনে হবেই এখানে যেন সূর্যও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। অদ্ভুত এক মায়াবী আলো ঢেলে দিয়েছে ঢালে ঢালে। মনে হবে, নির্ঘাত চাঁদের রাতে পরীরা নামে এ-রাজ্যে। যেমন তার রূপ, তেমন তার মিষ্টি নাম গুলাবা। যশবন্তের কাছে শুনেছিলাম, জায়গাটি নাকি সিনেমাওয়ালাদের খুব পছন্দের। অনেক শ্যুটিং হয়। দুঃখ করছিল, মানালির নানান জায়গায় শ্যুটিং করে সিনেমায় দেখায় কাশ্মীর ব'লে। আরো বলছিল কোন্ কোন্ সিনেমা আর্টিস্টকে দেখেছে। আমি তখন গুলাবার সৌন্দর্যে বেহুঁশ প্রায়। একবার কাঁচ নামিয়েছিলাম ফটো তোলার জন্য (আসলে সূর্যের আলো কাঁচে রিফ্লেক্ট হয়ে লেন্স ধাঁধিয়ে দিচ্ছে)। দু'একটা ক্লিক করেই তড়িঘড়ি কাঁচ তুলে দিলাম আবার (মাত্র সাত বছর আগে)।

রোহতাং আর ষোলো কিলোমিটার, এলো মাঢ়ী। এখনও বরফ নেই পায়ের নীচে। তবে বরফ-শীতল হাওয়া। গুটিকয় চা-জলখাবার-ডাল-রুটির দোকান। যশবন্ত চায়ের অর্ডার দিল তিনজনের জন্যই। আমরা দু'জনেই চা খাই না, তবে ওই ঠান্ডায় গরম চায়ের গ্লাসটাকে দু'হাতের তালুর মাঝে নেওয়ার জন্যও চায়ের অর্ডার দেওয়া সঙ্গত বলে মনে হবে। চা দিতে দিতে আমি রাস্তা পেরিয়ে সামনের উঁচু ঢিবিটার ওপর উঠে পড়লাম সিঁড়ি বেয়ে। মাথার ওপর একটা মন্দির, যার ওপাশের বারান্দা প্রায় ঝুলন্ত সামনের খাদে। ওখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল হাওয়ার তোড় আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে ফেলতে পারে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। মাঢ়ী থেকে গাড়ি ছাড়ল তখন সকাল সাতটা হবে।

রোহতাং যখন আর দশ কিলোমিটার, সেই প্রথম অল্প ভাঙাচোরা রাস্তা পেয়েছিলাম। তারপর রাস্তার সঙ্গে মিশতে লাগল কাদা। এখন চারপাশে তুষার-শৃঙ্গ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। সামনের কাদায় একমাত্র মিলিটারি ট্রাকের টায়ারের দাগ। বর্ডারের থেকে এই রাস্তা পর্বতমালায় আগলে রাখা। লেহ্ পর্যন্ত সৈনিকদের রসদ পৌঁছতে এর থেকে ভালো বিকল্প পাওয়া মুশকিল। তাই এই রাস্তার বেশ যত্ন-আত্তি করে থাকে মিলিটারি। এখন রাস্তার দু'পাশে দু'মানুষ সমান বরফের পাঁচিল। জানলাম এখানেই 'যব উই মেট' সিনেমার ওই জনপ্রিয় গানটির কিছু অংশের শ্যুটিং হয়েছিল। (হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন করিনা কাপুর জাস্ট একটা ক্যাপ্রি পরে নাচছিলেন, পিছনে সাহিদ কাপুর জিপ চালিয়ে... ভাবা যায় না)। আর একটা কথা যশবন্ত বারবার বলছিল, "ইঁহা তক্ কোই নেহি লাতা, ইঁহা তক্ কোই নেহি লাতা।" বলতে বলতে যে বরফ-বিছানো উপত্যকার সামনে ও গাড়ি ঘুরিয়ে দাঁড় করালো, আমরা নেমে দেখলাম সেই স্পটেই একটা মাইল ফলক শোয়ানো আছে, তাতে লেখা, ' ROHTANG 0'। আমি ওই রাস্তার ভিডিও করছিলাম গাড়ি থেকে নামার একটু আগে থেকেই। ভিডিও শেষ করেছিলাম গিয়ে ওই মাইল ফলকে। সুতরাং প্রমাণ আছে।

এরপর যশবন্ত যেটা করেছিল সেটা অভাবনীয়। তাই মনে হয় আজো আমরা যদি মানালি যাই তবে আমাদের ট্যুর প্ল্যানে ওই মানুষটির সঙ্গে

রোহতাং ভ্যালি - ২০১৭ তে যা পেলাম

দেখা করা থাকে। তার সন্তানের জন্য উপহার নিয়ে যাওয়া থাকে। প্রথমে আমাদের বলেছিল বসে পড়ুন রাস্তার পাশেই বরফের ঢালে ভ্যালির দিকে পা ছড়িয়ে। আমরা বাধ্য ছেলে-মেয়ের মতো বসে পড়লাম। তারপরই, 'আব স্লাইড কর যাইয়ে।' আমরা হতভম্ব! ওতো দূর ঢালু গড়ানে স্লিপ খাইনি তো কখনও। বললাম কী করে? ও আমাদের পিঠ ধরে ঠেলে দিল একে একে। আমরা গিয়ে থামলাম একেবারে বাটির তলদেশে। উঠে যখন দাঁড়ালাম, মনে হোলো পৃথিবী নয়, অপার্থিব কোনো বরফচাপা শীতল যজ্ঞকুণ্ডে এসে পড়েছি। চারিদিকে ঘিরে আছেন স্থিতধী প্রাজ্ঞ সব মহর্ষিরা সেই কোন অজানা কাল থেকে। উঁচু আর ছুঁচোলো তাদের মাথা অতীত অভিজ্ঞতায় সাদা। ওই ওপরে গাড়িটাকে মনে হচ্ছে খেলনা। তার পাশে দাঁড়িয়ে যশবন্ত হাফ সোয়েটার পরে। দৃষ্টিগোচর চরাচরে আর একজনও মনিষ্যি নেই। আমরা হাত নাড়লাম। আমাদের আরও অবাক করে যশবন্ত স্লাইড করে নেমে এল আমাদের কাছে। আমরা খুব চিন্তিত ভাব নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এতো ঠান্ডায়, এই অবস্থায় তুমি নেমে এলে কেন? গাড়িতে থাকবে বললে যে!" খুব সিরিয়াস ভাব নিয়ে বলল, "ম্যায় নেহি আতা তো আপ লোগোকা ফোটো কৌন্ লেতা?" বলে আমার হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে আমাদের দুজনের ছবি তুলতে থাকল। আবার বলতে লাগল, "থোড়া অ্যাকশন কিজিয়ে, ফোটো আচ্ছা আয়েগা"। ওই জনমানবশূণ্য ভার্জিন ভ্যালিকে সাক্ষী রেখে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে, বরফে গড়িয়ে নানা পোজে ছবি তুলেছিলাম। P.C. Sri Yashwant Singh। পরনে হাফ-সোয়েটার। একসময় বলতেই হল আর পারছি না ঠান্ডা লাগছে যে। তখনো ও বলে চলেছে, "অউর একঠো, অ্যায়সে, বরফমে লেইট্ কর। থোড়া তো অ্যাডজাস্ট কিজিয়ে। অচ্ছা ফোটো আয়েগা"।

ভ্যালিতে নেমেছিলাম ঠিক সকাল আটটায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই গালের হনু, ঠোঁট, ফোটো তোলার জন্য গ্লাভ্সের ভেতর থেকে বের করা আঙ্গুলগুলো টন্টন্ করতে শুরু করল। এরপর উঠে এসেছিলাম। তখন দেখেছিলাম স্কি-স্কুটার নিয়ে দু'একজন অন্য দিক থেকে ভ্যালিতে ঢুকে পড়ল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অল্প এগোতেই দেখতে পেলাম পাহাড়ের অন্য পাশে, পিছনে ফেলে আসা ভ্যালির থেকে খানিক নীচে পাহাড়ের গা-বেয়ে টায়ার চেপে স্লাইড করছে অনেকে। ছোঁড়াছুড়ি করছে বরফ। সার সার... সার সার... সার সার গাড়ি এসে এসে ভিড় করছে রাস্তার পাশে। সকাল আটটাতেই নামার সময় আটকে গেলাম জ্যামে। গাড়ি আর গড়াতেই চায় না। আমরা যত অবধি গিয়েছিলাম, তার থেকে অনেক অনেক নীচে, লম্বা লাইনের পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভাররা ট্যুরিস্টদের বলছে, "লো জি আ গয়ে রোহতাং।" আমরা মানালি থেকে ভোর পাঁচটায় রওনা হয়ে রোহতাং পৌঁছেছিলাম সকাল আটটায়। ফেরার পথে রোহতাং থেকে রওনা হয়ে মাঢ়ী পৌঁছতে বেলা বারোটা বেজে গিয়েছিল সেবার।

আজ সাত বছর পর আবার দেখা হল যশবন্তের সঙ্গে। ওর অনেক গল্প করেছি বন্ধুদের কাছে, তাদের সঙ্গেও পরিচয় করালাম। বন্ধুদের কাছে তো সিমলা, মানালি,সোলাং-এরও অনেক গল্প করেছিলাম। এক সিমলা ম্যাল আর যশবন্ত ছাড়া পুরোনো সবাই হতাশ করেছে এবার। যশবন্ত আমাদের সবাইকে চা খাইয়ে আতিথেয়তা করল (আসলে আরও কিছু খাওয়াতে চাইছিল, কিন্তু চা ছাড়া আর কিছু ভালো লাগছিল না)। চা খেতে খেতে গল্পে গল্পে যশবন্তের হালচাল জিজ্ঞেস করতেই করুন ছবিটা আরো পরিষ্কার হল। আর কিছুদিনের মধ্যেই এই গাড়ি চালানো ছেড়ে দেবে। নিজের বাড়ি মান্ডিতে ফিরে যাবে। ট্রাভেল এজেন্সি খুলবে ভাইয়ের সঙ্গে। এখন ইনকামের আর সিওরিটি নেই। আজ ডেট পাওয়া গেল, আবার কতদিন পর বুকিং পাওয়া যাবে কোনও ঠিক নেই। বুঝলাম, কিন্তু যশবন্তের মত ড্রাইভাররা কমে গেলে শুধু স'বাবুতে ভরে যাবে তো! সেই আশঙ্কায় বলে ফেললাম, "থোড়া অ্যাডজাস্ট করকে কুছ নেহি হো সক্তা? মাহল বদল ভি সক্তা হ্যায়!" যশবন্ত সুলভ হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, "অর অ্যাডজাস্ট নেহি হো পাতা, দাদা!"

(ক্রমশ)

রোহতাং ভ্যালি - ২০১০ এ

হিমাচলের তথ্য ~ *হিমাচলের আরও ছবি*

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনোবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকা বা টুকিটাকি হাতের কাজে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

শিলাইদহ থেকে সাগরদাঁড়ি

শীলা চক্রবর্তী

ভরা শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলাম, কিন্তু সীমান্ত পেরোতেই ঝকঝকে রোদের হাসি দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করল বাংলাদেশের প্রকৃতি। গন্তব্য ছিল শহর খুলনা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন মিটিয়ে অটো ধরে বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন, ঘন্টা দুয়েকের ট্রেনযাত্রার পর খুলনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠিবাড়িটি অবস্থিত কুষ্টিয়া জেলায়। সেখানে যাবার জন্য ভোর ছটায় খুলনা থেকে প্রথম বাস ছাড়ে, নাম গড়াই, সময় লাগে ঘন্টা পাঁচেক। রাস্তা মসৃণ, যাত্রা কষ্টকর নয়। কুষ্টিয়া পৌঁছে প্রথমেই যাওয়া হল লালন আখড়ায়। বাসস্ট্যান্ডের অদূরেই, শহরের একেবারে মধ্যিখানে আখড়াটি। মূল প্রবেশপথের দুই ধারে দুটি স্তম্ভ, তার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়ানো দুটি বিশাল একতারা। তার পরেই ভিতরের প্রবেশপথটি, চারটি থামের ওপর জালিকাটা গম্বুজ, সাদা। ভিতরে কালো কালিতে সাঁইজির গানের বাণী লেখা - "মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি"।

এরপর বিশাল গেট পেরিয়ে কেয়ারি করা পাতাবাহারের সারি, মোট তিনটি। এধার ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাঁইজির শিষ্য-শিষ্যাদের সমাধি। প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যিখানে সমাধি মন্দির, তার প্রাঙ্গনেও বিশাখা ফকিরানী সহ অনেক সমাধি। মূল কক্ষটির ভিতরে ডানদিকে কালো পাথরে বাঁধানো ফকির লালন শাহের সমাধি। বাঁদিকে তাঁর পালক মা মতিজান ফকিরানীর সমাধি।
সেখান থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে বিরাট চত্বর, সাঁইজির গান শোনালেন বাউলরা। পিছনেই সাঁইজি সম্পর্কে গবেষণাগার এবং সংগ্রহশালা। রয়েছে বিশাল তামার 'ডেগ', এই হাঁড়ি থেকেই জাতপাত নির্বিশেষে খাবার তুলে খেতেন সাঁইজির শিষ্যরা। রয়েছে সাঁইজির ব্যবহৃত তামাক খাবার হুঁকো গড়গড়া, একতারা, গুবগুবি। এছাড়া রয়েছে সাঁইজির ঘরের দরজা, বসবার চৌকি। রয়েছে নানা শিল্পীর আঁকা সাঁইজির ছবি এবং আরও অনেক কিছু।
আখড়া থেকে বেরিয়ে কুঠিবাড়ির পথে। গন্তব্যের মধ্যপথেই পড়বে বিষাদসিন্ধু খ্যাত মীর মোশারফ হোসেনের বাড়ি। বাড়িটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অধিগৃহীত। রয়েছে দোতলা স্কুলবাড়ি, মীর সাহেবের নামাঙ্কিত। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একধারে রয়েছে সংগ্রহশালা। সেখানে মীর সাহেবের প্রচুর ছবি, ব্যবহৃত আসবাবপত্র, গড়গড়া ইত্যাদির সঙ্গে রয়েছে বিষাদসিন্ধুর মূল পাণ্ডুলিপি। সংগ্রহশালার ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ।

সেখান থেকে সোজা কুঠিবাড়ি। মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ, যথেষ্ট খারাপ রাস্তা। কুঠিবাড়িটি রবিবার পূর্ণদিবস ও সোমবার অর্ধদিবস বন্ধ থাকে। খানিকটা দূরেই পদ্মা। শোনা যায় আগে কুঠিবাড়ির গা ঘেঁসেই বয়ে যেত, এখন বেশ দূরে। বিশাল চওড়া ঘোলা জলের নদী, স্রোত একমুখী। নৌকো বাঁধা তীরে, কোথাও শরবন।
কুঠিবাড়ির ভিতরেও রয়েছে পাতাবাহারের কেয়ারি। তিনতলা বাড়িটি লাল, দরজা জানালা সবুজ, জাফরিকাটা।

যেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িরই প্রতিরূপ। রোয়াক পেরিয়ে ঢুকতেই কাঁচের বিশাল বাক্সে রাখা পদ্মা বোটের রেপ্লিকা। রয়েছে কবির ব্যবহৃত শোওয়ার খাট, লেখার টেবিল, লোহার সিন্দুক, আট এবং ষোলো বেহারাবাহিত পালকি। রয়েছে ঘাস ছাঁটবার, আগাছা নিড়াবার এবং জল পরিশোধন করবার যন্ত্র। রয়েছে কবির লেখার প্রতিরূপ ও ছবি, সারা বাড়িতে ছড়ানো। তাঁর ব্যবহৃত একটি সিঁড়ি রয়েছে। সোফা, হাতপালকি, আরামকেদারা সহ বিবিধ বস্তু রয়েছে। কুঠিবাড়ির ডানদিকের ঘাটবাঁধানো পুকুরটিতে ভাসানো আছে বিখ্যাত পদ্মাবোট। ভাঙ্গাচোরা, কোনোমতে কাঠামোটি রয়েছে। এছাড়া কুঠিবাড়ির বাইরেও একটি সুন্দর পুকুর রয়েছে। গীতাঞ্জলি, সোনারতরী, খেয়া প্রভৃতি সরকারী আবাস, থাকতে চাইলে আগে থেকে বুকিং করতে হবে। আমরা ফিরে এসেছিলাম। খুলনা ফেরার শেষ বাসটি কুষ্টিয়া থেকে বিকেল চারটেয় ছাড়ে।

একদিন পরেই বেরিয়ে পড়া গেল যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়িটি ঘুরে দেখতে। পৌঁছতে সময় লাগে ঘন্টা দুয়েক। খুলনা থেকে চুকনগর, সেখান থেকে বাস বা অটোয় কেশবপুর বাজার, সেখান থেকে অটোয় সোজা মধুকুঠি। ব্যক্তিগত গাড়ি নেওয়াই ভালো। প্রথমেই চলে গেলাম কপোতাক্ষ তীরে। নদীটি আগে মধুকুঠির ধার দিয়েই বয়ে যেত, এখন বেশ খানিক দূর, হাঁটাপথে মিনিট দশ-পনেরো। বিস্তীর্ণ রোয়াক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁদিকে সাগরদাঁড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কচিকাঁচাদের কলতানে মুখরিত। সরকার অধিগৃহীত কবির পৈতৃক বাসস্থানের অঙ্গনে সরকারি স্কুল। পাশেই বিশাল বাগান, একধারে পুকুর, শানবাঁধানো ঘাটটির বেশিরভাগটাই ভেঙেচুরে গেছে।
মূল বাড়িটির বেশ অনেকগুলি ঘর নিয়ে সংগ্রহালয়টি। পুরোটাই একতলায়, দোতলায় ওঠার পথ বন্ধ। বিস্তীর্ণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ঘিরে অনেকগুলি দালান সাগরদাঁড়ির জমিদারদের। সেখানে রয়েছে কবির পারিবারিক ব্যবহৃত খাট, লোহার সিন্দুক, পাথরের পাত্র, লোহার সুদৃশ্য একটি ঢাকা দেওয়া টুপি রাখার জায়গা, কবির বংশলতিকা রয়েছে, বিখ্যাত টেনিসতারকা লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার, কবির নাতির নাতনি, রয়েছে তাঁর নাম। রয়েছে কবির প্রচুর ছবি, তাঁর বিভিন্ন কবিতার ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো।

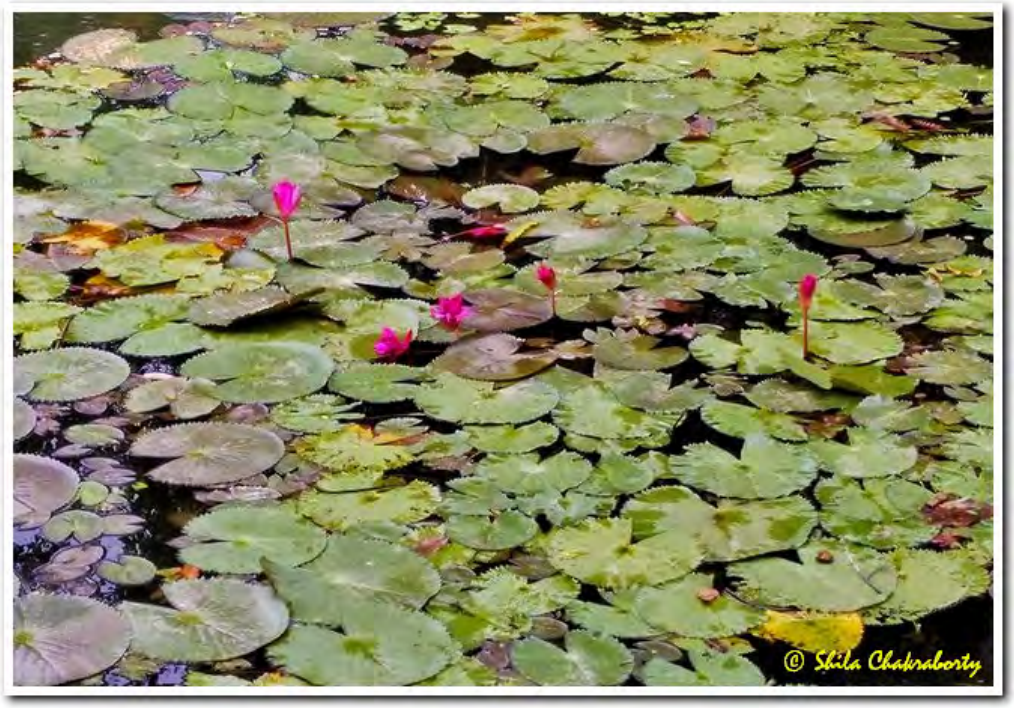

দেউড়ির পাশেই একটি ছোটো, ঘেরা বাগানে কবির আবক্ষ মূর্তির তলায় শ্বেতমর্মরের ফলকে বাঁধানো মধুকবির সেই বিখ্যাত এপিটাফ বা স্বরচিত সমাধিলিপিটি রয়েছে –
"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে..."
কবি শেষ শয্যায় শায়িত আছেন কলকাতার পার্কস্ট্রিট সমাধিস্থানে, সেখানেও এটি উৎকীর্ণ আছে। কবির জন্মদিনে, মধুমেলায়, মধুপল্লীতে দেশবিদেশ থেকে প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

শীলা চক্রবর্তীর জন্ম বাংলাদেশের খুলনায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক । মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপরাধ আইনে স্নাতকোত্তর। প্রয়াগ এলাহাবাদ সঙ্গীত একাডেমি থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতে স্নাতক। পেশায় আইনজীবী। ভালবাসার জায়গা গান, কবিতা, নাটক, লেখালিখি। বেড়াতে ভালবাসেন। দীর্ঘদিন ধরে লেখালিখির যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখাপত্র প্রকাশিত হয়।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আহালদারায় একবেলা

সঞ্চারী সরকার

"কোন অচেনা দেশান্তরে, তোর সঙ্গে এই তেপান্তরে
মোর মনের প্রজাপতি
নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায়
মন হারানোর ঠিকানায়..."

-"মন হারানোর ঠিকানাই" বটে। মাঝে মাঝে মনটা পালাই পালাই রবে "মন হারানোর ঠিকানা"ই তো খোঁজে। আর তার সঙ্গী যদি হয় মাতাল হাওয়া, উড়াল মৌমাছিদের গুঞ্জন, গাছের কচিপাতা আর কোকিলের কুহুতান; তবে কেমন হয় বলুন তো! 'ফাগুনের' এই 'মোহনায়' চলুন ঘুরে আসি একটা অফবিট ডেস্টিনেশন থেকে।

উত্তরবঙ্গের মেয়ে হলেও বলতে একটুও সংকোচ বোধ হচ্ছে না যে আহালদারার নাম কিছুদিন আগে অব্দিও জানতাম না। বরং খানিকটা গর্ব অনুভব করলাম যে আমি এই নর্থ বেঙ্গলেরই মেয়ে। কত চেনা অচেনা ডেস্টিনেশনের প্রতিবেশী। সে যাই হোক আহালদারার নাম প্রথম জানলাম নার্সারি স্কুলের বন্ধু কৌশিকের ফেসবুকে দেওয়া কতগুলো দুর্দান্ত ছবি দেখে। ছবির ক্যাপশন দেখেই বুঝলাম বেশি দূর নয়, ঘরের পাশেই রয়েছে এই অপরূপ সৌন্দর্যের হাতছানি। নতুন জায়গার নাম দেখা মাত্রই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যাত্রাপথের ব্যাপারে সব বিস্তারিত জেনে নিলাম। সময় সুযোগ হলে ভ্রমণ পিপাসু মন ঠিক পাড়ি দেবে এই অজানা ঠিকানায়। গুগুলেও সার্চ করে আরও কিছু ফটো দেখে নিলাম, বুঝতে অসুবিধা হল না যে জায়গাটির কমার্শিয়াল হতে খুব বেশি দেরি নেই, তার আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে ঘুরে আসতে হবে। আসলে ঘুরতে গেলে কিছুটা নির্জনতাই তো চায় মন। যাই হোক বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না, সুযোগ এল আমার মাসি আর মাসতুতো ভাই-এর হাত ধরে। কর্মব্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে বেশ কিছুদিন ধরে মনটা তো পালাই পালাই করছিলই সঙ্গে কৌশিকের দেওয়া ছবিগুলো আগুনে ঘৃতাহুতির মতই কাজ করল। প্রস্তাবটা আমিই রাখলাম মাসির কাছে, চলো ঘুরে আসি। হুজুগে সাড়া দিয়ে মাসিই যাওয়ার দিন আর গাড়ি ঠিক করার কাজটা সেরে নিল।

নির্দিষ্ট দিনে চূড়ান্ত উত্তেজনায় ভর করে রওনা হলাম আহালদারার উদ্দেশ্যে। জলপাইগুড়ি থেকে গজলডোবার তিস্তার হাওয়া চোখে-মুখে মেখে, ওদলাবাড়ির পাহাড়ঘেরা ঘিস নদীর চোখজুড়ানো সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সেবকে এসে পৌঁছলাম। ভাইয়ের আবদারে ফটো তোলার অছিলায় এখানে খানিক বিরতি। বেশি দেরি না করে আবার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, পথের সঙ্গী হল আরও একজন - তিস্তা। রাস্তার একদিকে দেওয়ালের মতো পাহাড়, আরেক দিকে গভীর খাদ, সঙ্গে বয়ে চলেছে পাহাড়ি মেয়ের মতই উচ্ছল সবুজরঙা তিস্তা, উফ্ মনোরম দৃশ্য। 'করোনেশন ব্রিজ'-কে ডান হাতে রেখে, কিমি দুই-তিনেক গেলেই কালীঝোড়া বাজার, এখান থেকে কিমি খানেক গেলেই পড়বে হনুমান মন্দির, হনুমান মন্দিরকে ডান দিকে রেখে বিরিক মোড় হয়ে যে রাস্তাটা সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল সেখানেই তো অপেক্ষা করছে আমাদের বহুকাঙ্খিত উইক-এন্ড ডেস্টিনেশন আহালদারা।

হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যের নীরব দর্শক হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি গন্তব্যের দিকে। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কোনও কিছুই যেন স্পর্শ করে না এই সৌন্দর্যকে! শুধুই এক চুম্বকীয় আকর্ষণ। পথের সৌন্দর্য মনকে যেন এক অন্য সুরে বেঁধে দিল। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত তিস্তা। নীচে গভীর খাদ। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে নজর কাড়ছে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, পাহাড়ের ধাপ কেটে ঝুমচাষ, বাঁশ ও বেতের ঝাড়, দূর থেকে ভেসে আসা নাম না জানা নানা রকম পাখির কিচির-মিচির, আর হলুদ, বেগুনি, গোলাপি, ম্যাজেন্টা, পার্পল, আকাশি-নীল রঙের অজস্র ফুলের মেলা। আর যেটার কথা না বললে পুরো লেখাটাই অসম্পূর্ণ থাকবে তা হল কমলালেবুর গাছ। অজস্র কমলালেবু ধরে গাছগুলো

একেবারে নুইয়ে পড়েছিল। গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় একসঙ্গে এতগুলো কমলালেবু দেখার সৌভাগ্য আমার এর আগে হয়নি। অসাধারণ লাগছিল পুরো ব্যাপারটা। রাস্তা ক্রমশ চড়াই হচ্ছে ঠিকই কিন্তু রাস্তার অবস্থা ভালো হওয়ায় যাত্রাপথের ক্লান্তি অনুভূত হল না। বরং যাত্রাপথের সৌন্দর্যকে আরও বেশি করে উপভোগ করার জন্য গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণের বিরতি নিলাম, সুযোগ পেয়ে ভাইও আহ্লাদের সঙ্গে ফোটো তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাই হোক খুব বেশি সময় নষ্ট না করে চটপট আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম, গাড়ি চলতে শুরু করল তার নিজস্ব ছন্দে।

রডোডেনড্রন-পাইন-ফার- ম্যাপলের সরলবর্গীয় অরণ্য চিরে হিমালয়ের পাকদন্ডী পেরিয়ে একটা সময়ে আমরা উঠে এলাম মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির একেবারে হায়েস্ট পয়েন্টে অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য আহালদারায়। কী অমোঘ সৌন্দর্য চারিদিকে! এখানে অল্টিটিউড প্রায় ৪৩০০ ফিট। গাড়ি পার্ক করিয়ে একচিলতে চা-বাগানের সবুজ ঢাল আর সিঙ্কোনার জঙ্গল পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে পৌঁছলাম সেখানে দেখলাম একদিকে তিনটে মেরুনরঙা কটেজ আর আরেকদিকে জমি খানিকটা নীচু হয়ে চলে গিয়েছে আহাল ভিউ পয়েন্ট-এ। এক মুহূর্তও দেরি না করে আমি আর মাসি সটান চলে গেলাম ভিউ পয়েন্টে। ভাই আগেই চলে যাওয়ার কাজটি সেরে রেখেছে ফটো তোলার তাগিদে।

যাই হোক, কার্শিয়ং, মংপু, তিনচুলে, টাইগার হিল, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও সহ শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের সমতল এরিয়ার পুরো ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায়, এই 'আহাল' পাহাড়ের ভিউপয়েন্ট থেকে। আর বাকি সব জায়গা থেকে এখানেই আহালদারার স্বাতন্ত্র্যতা। নর্থ বেঙ্গলের মেয়ে হওয়ার সুবাদে এখানকার

বেশিরভাগ গন্তব্যস্থান চষে ফেলেছি প্রায়, কিন্তু ৩৬০ ডিগ্রি ভিউটা অন্য কোথাও থেকে এতটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। লিটার‍্যালি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছিলাম। কী অপরূপ সৌন্দর্য আর কী গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে! পার্থিব যা কিছু সব তুচ্ছ এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সামনে। কপাল ভালো আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে তন্বী কাঞ্চনজঙ্ঘা তার সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ করে অপার্থিব সুখ প্রদান করেন তাঁর রূপমুগ্ধ অগণিত ভক্তকুলকে। কিছুক্ষণ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে থাকার পর শুরু হল ফটো তোলার পালা। ফটো তুলতে তুলতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম প্রকৃতি যেন নিজস্ব কায়দায় কোনও মানুষের প্রতিকৃতি খোদাই করে রেখেছে। খুব খেয়াল করে দেখলে মনে হতে পারে এ অন্য কেউ নন, স্বয়ং রবি ঠাকুর যেন! লক্ষ্য করা মাত্রই এই প্রাকৃতিক ভাস্কর্যকে ক্যামেরাবন্দী করতে ছুট লাগালাম। মাসির চোখ রাঙানির কাছে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না আমার শখের ফোটোগ্রাফি; পাছে পা হড়কে পড়ে যাই। হাতে সময় বেশি ছিল না লাতপাঞ্চার অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ফেরার পথে খবর নিয়ে জানতে পারলাম কটেজগুলোতে রাতপ্রতি ১৫০০ টাকা করে ভাড়া। চাইলে ট্রেকও করতে পারেন।

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। গন্তব্য আহালদারা থেকে কিমি পাঁচেক দূরের লাতপাঞ্চার। কালীঝোড়া থেকে আহালদারার উল্টো দিকের রুটে প্রায় তের কিমি পার করলেও অবশ্য পৌঁছে যাওয়া যায় লাতপাঞ্চারে, তবে ওই রাস্তাটা খুব একটা ভালো নয়। যাই হোক আহালদারা থেকে আমাদের এই যাত্রাপথে প্রচুর সিঙ্কোনা গাছ চোখে পড়ল। জানতে পারলাম একদা এখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ করা হত এবং অঞ্চলটি এক সময় সিঙ্কোনা গাছের জন্য বেশ প্রসিদ্ধও ছিল। পাহাড়ের পাথুরে বুক চিরে নেমে আসা ঝর্নার জল যেন স্বাগত জানাল আমাদের লাতপাঞ্চারে। লাতপাঞ্চারে গিয়ে প্রথমেই লাঞ্চটা সেরে নিলাম। লাঞ্চ করতে করতেই দোকানের বছর ছাব্বিশের ছেলেটার কাছে জানতে পারলাম কাছেই একটা বার্ড ওয়াচিং পয়েন্ট রয়েছে, নাম হর্ণবিল নেষ্ট। সেখানে গাড়ি যায় না, হেঁটে যেতে হবে। নানা রকমের পাখির কলতানে স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে হর্নবিল নেষ্ট। এটিই লাতপাঞ্চারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। সময়ের অভাবে আমরা সেখানে যেতে পারিনি তাই চারপাশটা একটু ঘুরে দেখলাম। লাতপাঞ্চারে লেপচা জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি ছিল। তাই এখানে বেশিরভাগই লেপচা জাতির মানুষজন চোখে পড়ল। লেপচা ভাষায় 'লাতপাঞ্চার' মানে 'বেতের জঙ্গল'। অরণ্যপ্রেমীদের জন্য আদর্শস্থান লাতপাঞ্চার। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে - নামথিং পোখরি।

নামথিং পোখরিতে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে ছুঁই ছুঁই। নেপালী ভাষায় পোখরি মানে লেক। লেক হলেও জল ছিল না এই সময়। পড়ন্ত বিকেলের সোনালী রোদের ছোঁয়ায় শুকনো লেকটাকে ঘিরে থাকা পাইন-ফারের সরলবর্গীয় বৃক্ষরাজি পরিবেশকে স্বর্গীয় করে তুলেছিল। মাসির ইচ্ছায় কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এই জলহীন লেকেই নেমে ছিলাম আমরা। নীচু সমতল ভূমিটিকে ঠিক যেন গল্ফকোর্স মনে হচ্ছিল। কী ভীষণ উজ্জ্বল সবুজ চারিদিকে! এই স্থানটির নির্জনতাও মনকে উচ্চমার্গে নিয়ে যায়। পাহাড়ের কোলে হেলে পড়া অস্তমিত সূর্য জানান দিচ্ছে আমাদেরও ফেরার সময় হয়ে এসেছে। তবে একবেলার এই এতো কম সময়েও যা দেখেছি তা অনেক দিন পর্যন্ত মনের তৃষ্ণা মিটিয়ে মনকে সতেজ রাখবে।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সঞ্চারী সরকার ভালোবাসেন বেড়াতে। সময় পেলেই ঘুরে বেড়ান উত্তরবঙ্গের আনাচেকানাচে।

কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

হামটা পাসের হাতছানি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

~ ~ হামটা পাস ট্রেকরুট ম্যাপ ~ হামটা পাস ট্রেকের আরও ছবি ~

"পাথর অপেক্ষা করে শুকনো নদী খাতে।
আবার অতল এসে কোনদিন ধুয়ে দিয়ে যায় যাতে
সমস্ত জমে থাকা রাগ-অভিমান আর গ্লানি
সেরকম আমিও ঠিক জানি...।

কোন এক পড়ন্ত বিকেলবেলা দূরে
সমস্ত পাহাড়-কুয়াশা-গাছ-মেঘ ঘুরে
আমি ঠিক ফিরে যাব আবার তোমার কাছে
নদীদের যতখানি পাথর, শ্যাওলারও ততখানি আছে।"

- আমার প্রিয়তম সহোদর উত্তরণ , রোপা, হিমাচল

১৮ জুন ২০১৬, সন্ধে ৫.৫০, রিজার্ভ ফরেস্ট এরিয়া, মানালি... "প্রথম টিম ব্রিফিং"...

"হাই দিস ইজ সৌম্যজ্যোতি মিত্রা অ্যান্ড দিস ইজ হৃষিকেশ দেশপান্ডে, ইওর ট্রেক লিডার কাম কম্পেনিয়ন ফর দি নেক্সট ফাইভ ডেজ...ইউ ক্যান কল মি SJ"। ছ' ফুটের উপর লম্বা, মেদহীন ছিপছিপে চাপদাড়ির সৌম্যকে ভালো লেগে গেল প্রথম দেখাতেই। আর হৃষিও একই রকম শান্ত অথচ স্নিগ্ধ নেতাসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে। আমাদের গ্রুপ বেশ বড়, সব মিলিয়ে ২৫ জনের। তার মধ্যে আমি আর নীলাদ্রি ছাড়াও বাঙালি আরও তিনজন। একে একে শুরু হল পরিচয় পর্ব। দেখা গেল আমাদের এই পাঁচ বাঙালি ছাড়া শুধুমাত্র হাই অল্টিটিউড ট্রেক-এর অভিজ্ঞতা আছে বছর পঁয়তাল্লিশের মুম্বইকর নিখিল এর (একমাত্র রুপিন পাস)। বলা হয়নি, এইবারের ট্রেক আমাদের নিজেদের অর্গানাইজ করা নয়। এবার এসেছি 'ইন্ডিয়াহাইক' (IH) এর সঙ্গে। এই প্রতিষ্ঠানেরও শুরু এক বাঙালির হাত ধরে, অর্জুন মজুমদার। ওনারই ব্যক্তিগত বন্ধু ডক্টর কুণাল মাইতি আমাদের টিম ডক্টর এবারের ট্রেক-এ। ডাক্তারবাবুকে দেখে অবাক হতে হয়। এই ষাট বছরের যুবকের উদ্যম এবং অভিজ্ঞতা সত্যি ঈর্ষণীয়। ওনার বাকি দু'জন পার্টনারের গল্প ক্রমশ প্রকাশ্য। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে, পাইনের বনে পাতার গা বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছে অন্ধকার। বাতাসে হাল্কা ঠান্ডার আমেজ। কাল সকাল সাতটায় শুরু হতে চলেছে আমাদের অভিযান। এতদিনের সব প্ল্যান এবং প্রতীক্ষার অবসান। জীবনের প্রথম পাস অতিক্রম করার উত্তেজনা শিরায় শিরায় অনুভব করতে করতে আমরা জঙ্গলের পথ ছেড়ে পা বাড়ালাম হোটেলের দিকে।

২০১৬-এর শুরুর দিকের কোনো একদিন... "ফ্ল্যাশব্যাক"...

হাইক মেসেঞ্জারের গ্রুপ নোটিফিকেশন দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের 'পদাতিক' ট্রেকিং গ্রুপের চ্যাটবক্সে সৌনীপ লিখেছে, এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ায় এই বছরের ট্রেকিং ওকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে। ততদিন অবধি আমরা প্রথমে 'ভাবা পাস' (পিন-পার্বতী ভ্যালি) ক্যান্সেল করে হামটা পাস করা মনস্থির করে ফেলেছি। ইন্ডিয়াহাইকের বুকিং করা ছিল তিনজনেরই। ভীষণ মনখারাপ সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন অফিস পৌঁছে দেখি নীলাদ্রিরও মুখে ঘন কালো মেঘের ছায়া। বরুণদা'র (চা-ওলা) দিয়ে যাওয়া কাগজের চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ও উঠে এল আমার উল্টোদিকের চেয়ারে। "দেখ অভিষেক, সামনেই বিয়ে এরপর কি পরিস্থিতি থাকবে ঠিক নেই, চল আমরাই দুজনে যাই।" মনখারাপ আর আশঙ্কা সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করার পর, সৌনীপের অনুমতি নিয়ে প্ল্যান ফাইনাল হয়ে গেল। এবার তাহলে দু'জনেই, সঙ্গে নতুন কিছু অচেনা মানুষ। দিন গোনা চলতে থাকল আপন গতিতে।

১৪ জুন, রাজধানী এক্সপ্রেস আর... "হাফ পদাতিক"...

রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি যাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। নিজেকে কেমন একদিনের রাজা রাজা মনে হয়। মনে হয় যেন কোনও কালো স্প্যানিশ স্ট্যালিয়ন-এর পিঠে চড়ে এগিয়ে চলেছি দুরন্ত গতিতে, হাওয়াকে পাশ কাটিয়ে, চারিদিকের সবুজকে চক্ষের নিমেষে বিদায় দিয়ে নতুন কোনও অজানার সন্ধানে। আমাদের সিট প্রতিবারের মতোই এবারও ঠিক দরজার ধারে সাইড আপার আর সাইড লোয়ারে। প্রতিবারের মাথায় গুঁতো খাবার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে ঠিক করেই নিলাম উল্টোদিকে মাথা করে শোব। একটা জিনিস দেখতে পেয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। দরজার ঠিক মাথার উপরে লাগানো ডিসপ্লে বোর্ড। যাতে দেখা যাচ্ছে ট্রেনের গতিবেগ। মাঝে মাঝে ট্রেন যখন ১০০ কিমি/ঘন্টা ছাড়াচ্ছে, গতির একটা আনন্দময় রোমাঞ্চ বয়ে যাচ্ছে শরীরে। হয়তো অনেকের কাছেই আমার এই অনুভূতিগুলো ছেলেমানুষি মনে হবে, কিন্তু কিছু কিছু জিনিসে আমি সত্যি এখনও এক্কেবারেই ছেলেমানুষ। একে একে চা, স্যুপ আর কাঠি-বিস্কুট শেষ করে সিটে গা এলিয়ে দেওয়া গেল। ডিনারও এসে গেল যথাসময়। মুরগির ঠ্যাং গুঁড়ো করে আর আইসক্রিমের কাপ-এর পিঁপড়ে-কাঁদা অবস্থা করে নিশ্চিন্তে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা পেপার-ওলা খোঁচা মেরে ঘুম ভাঙাল। একটু পরে চা আর ব্রেকফাস্টও হাজির। ব্রেড-অমলেট-ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-লাড্ডু আর কফি দিব্যি সেঁধিয়ে গেল পেটে। বাকি প্যাকেজড ড্রাইফুড স্থান পেল রুকস্যাকে। যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে যাবার সময় অক্ষরধাম একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ঠিক সময়েই পৌঁছে গেলাম দিল্লি, পিঠে পেল্লায় রুকস্যাক আর কাকের বাসার মতো চুলওয়ালা দুই খেপা পাহাড়-প্রেমিক, নীলাদ্রি আর অভিষেক - "হাফ পদাতিক" (ও 'পদাতিক' কী যারা জানেন না তাদের জন্য বলি ওটি আমাদের চার জন বন্ধুর সাধের ছোট্ট ট্রেকিং গ্রুপ)।

১৫ জুন, "অক্ষরধাম আর দিল্লি কি দিল"...

নুন ছাড়া যেমন রান্না জমে না, তেমনই অপেক্ষা ছাড়া ভ্রমণকাহিনি জমে না। হামটা পাসের গল্প বলার আগে তার পার্শ্বচরিত্রগুলো একটু ফুটেজ খেলই বা নাহয়, ক্ষতি কী? সকাল সকাল দিল্লিতে নেমেই আমাদের আশঙ্কা হল কোথায় থাকা যায়। পাহাড়গঞ্জ জায়গাটায় থাকতে বেশ ভয় ভয় লাগে। এলাকা হিসেবে সুনাম তো প্রচুর! কী-করি কী-করি ভাবতে- ভাবতে এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ করে ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন মাঝবয়সি ছোকরা উদয় হল। "বাঙালি স্যার?খুব ভালো নতুন হোটেল হয়েছে স্যার আমাদের, একদম ঝক্কাস...চলুন না স্যার দেখবেন। পছন্দ না হলে নেবেন না।" দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, দেখে তো আসি। মেন রোড থেকে হেঁটেই চলেছি। মিনিট পাঁচেক পর ছেলেটা একটা সন্দেহজনক গলির দিকে ইঙ্গিত করে বলল -"আসুন স্যার এদিকে।" ভয়ে ভয়ে ওর পিছন পিছন ঢুকে দেখলাম সত্যি এক নতুন হোটেল। নামটা দেখে মনে আরও একটু ইয়ে হল, হোটেল 'ইউ অ্যান্ড মি।' কী আর করা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঘর দেখে সত্যি ভালো লেগে গেল। ১০০০ টাকায় ডাবল বেড, কিন্তু খুব সুন্দর। রাজি হয়ে গেলাম। স্যাক নামিয়ে গা-হাত-পা এলিয়ে দিলাম দুধ সাদা বিছানায়। বাড়তি পাওনা দুর্দান্ত স্পিডের ফ্রি ওয়াই-ফাই।

হোটেলের কুকটিরও রান্নার হাত খাসা। বিকেলে প্রোগ্রাম ছিল আমাদের প্রিয় বন্ধু অভিষেক (আমি নই) আর পর্ণার (ওরা বেশ কিছুদিন হল নিজেদের সংসার পেতেছে) সঙ্গে আমার প্রিয় অক্ষরধাম মন্দির ঘোরার। ওদের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রামটা দুর্দান্ত হয়। আবার নাকি জিনিসটা নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যেটায় বাচ্চারা লাইভ পারফর্ম করছে। দেখার ইচ্ছেটা বড়োই প্রবল হয়ে উঠেছিল। হাল্কা একটা ঘুম দিয়ে আমরা রিক্সা ধরে রওনা দিলাম কাছের মেট্রো স্টেশন 'রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ'-এর দিকে। ওখান থেকে ব্লু-লাইনের নয়ডার দিকের মেট্রো ধরে পৌঁছে গেলাম 'অক্ষরধাম' স্টেশনে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দুই মূর্তি হাজির। অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় ভীষণ আনন্দ হল। হাঁটা দিলাম মন্দিরের দিকে। এই মন্দিরের সিকিউরিটি খুব কড়া। মানিব্যাগ ছাড়া কোনোকিছুই ভিতরে নিয়ে যেতে দেয় না। অগত্যা মোবাইল ইত্যাদি অভিষেকের ব্যাগে চালান করে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাইনে অপেক্ষা করে ভিতরে ঢোকা গেল। এর আগে আমি দুবার এখানে এসেছি। এবারে আসার উদ্দেশ্য শুধু লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-টাই। অভিষেক যখন লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটছে, হঠাৎ করে আকাশ কালো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আমরা তিনজন মাঝারি ভিজে কোনোরকমে শেডে ঢুকলাম। অভিষেক বেচারা ওই অবস্থাতেই পুরো কাকভেজা হয়ে টিকিট কেটে আনল।

ঠিক ৭.৪৫ -এ প্রোগ্রাম শুরু হবে। এতক্ষণ ধরে দিনের আলো কলকাতায় দেখা সম্ভব নয়। বিশাল বড় অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঝখান জুড়ে অনেকটা চওড়া ফাউন্টেন প্লেস। তিনদিকে বসার সিঁড়ি। ভেজা সিঁড়িতেই কোনোরকমে বসা হল। এদিকে ভেজ পোলাও আর কোল্ড-ড্রিঙ্ক এসে হাজির। খাবার শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রোগ্রাম শুরু হল। সে কী অপূর্ব বর্ণচ্ছটা। উড়ন্ত জলের কুচি মুখ চোখ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মোহগ্রস্তের মতো হাঁ করে গিলে চলেছি সেই অবর্ণনীয় আলো-শব্দের খেলা আর কাহিনির চিত্রকল্প। তার সঙ্গে সোনায় সোহাগা বছর দশ-বারোর কিছু অতীব নৃত্যকুশল বাচ্চার ছন্দময় প্রদর্শন। এ জিনিস ভোলার নয়, বারবার দেখলেও পুরোনো হবার নয়। শো শেষ হয়ে যাবার পরও হাততালির ঝড় থামতে সময় লাগল। নেশা যেন কাটছেই না, তবে এবার ফেরার পালা। বাইরে বেরিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় কফি খেয়ে মেট্রোর দিকে পা বাড়ালাম সবাই।

১৬ই জুন, বিকেল ৪টে..."চলা যাতা হুঁ কিসি কি ধুন মে..."

বিকেল ৬-টায় মানালি যাওয়ার ভলভো বাস। ছাড়ে হিমাচল ভবনের সামনে থেকে। রাতে ঘুম হবেনা আন্দাজ করে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলাম দুজনে। ৩.৩০ থেকেই হোটেল ছাড়ার তাগাদা দেওয়া শুরু হয়ে গেল। শেষমেশ তো ঘরের লাইট পর্যন্ত নিভিয়ে দিল। ৪-টে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। নিউ দিল্লি স্টেশনের গেটে অপেক্ষা করছি আমাদের উবের-এর জন্য। মহান ড্রাইভারকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছেনা আমাদের লোকেশন। অবশেষে তিনি এলেন। মিনিট কুড়ি সময় লাগল মান্ডি হাউস পৌঁছোতে। এর আগে কখনও সারারাত বাসে ট্রাভেল করিনি। মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। সব থেকে চিন্তা হচ্ছিল টয়লেট করা নিয়ে। হিমাচল ট্যুরিজমের এই এসি ভলভোগুলো ভীষণ আরামদায়ক, কিন্তু এই চোদ্দো ঘন্টার দীর্ঘ বাস জার্নিতে মাত্র দুটো স্টপ; একটা রাতের খাবার আর একটা ভোরবেলার চা। আতঙ্কের বহর আরও বাড়িয়ে দিয়ে কন্ডাক্টর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল একটা করে এক লিটারের জলের বোতল আর দুটো করে বমি করার ব্যাগ।

বাস ছুটছে হু-হু করে। হাইওয়ের ধারের সন্ধেবেলার জনজীবন কেমন একটা ঘোরলাগা মাদকতা এনে দেয়। ধাবার সামনে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজানো রঙিন টিউবলাইটের সারি, খাটিয়া, বড়ো বড়ো টায়ার-টিউবের দোকান, আলো ঝলমলে পেট্রোল-পাম্প, উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা হেডলাইটের আলো আর আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে তীব্র হয়ে আবার দূরে মিলিয়ে যাওয়া হর্নের শব্দ, সব মিলিয়ে একটা কোথাও যাচ্ছি-যাচ্ছি আনন্দ। কখন যে দুজনে গল্প করার টপিক হারিয়ে ফেলে বাসের জানালায় মনোনিবেশ করেছি নিজেরাই ভুলে গেছি। একটানা ঘণ্টাচারেক চলার পর বাস এসে থামল অনবদ্য এক থ্রি-স্টার মোটেল-এর সামনে, 'Motel Golden SARAS' । বাস থেকে নেমেই চক্ষু ছানাবড়া। পকেটের অবস্থা কল্পনা করে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এদিকে খিদেও পেয়েছে খুব, খেতেও হবে। আর কোন অপশন নেই দেখে ঢুকে পড়লাম। ক্যাশ না থাক ক্রেডিট কার্ড-তো আছে। মেনু-কার্ড দেখে সত্যি অবাক হলাম। খাবারের দাম খুবই রিজনেবল। বোঝাই গেল কেন সবাই এখানেই খায় বাস থেকে নেমে। দুজনে মিলে এক প্লেট ভেজ চাউমিন নিয়ে অতি কষ্টে শেষ করতে পারলাম, পরিমাণ যথেষ্টই। খাওয়া শেষে টয়লেট ঘুরে এসে বাসে উঠে পড়লাম। কন্ডাক্টর মশাই বলে গেলেন রাত দুটো নাগাদ পাহাড়ি রাস্তা শুরু হবে, সবাই ঘুমিয়ে পড়ুন। বাস আবার থামবে পাঁচটার সময়।
রাত পৌনে দুটো নাগাদ এক নির্জন পাহাড়ি বাঁকে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। আধাঘুমন্ত আমরা জেগে উঠে নড়েচড়ে বসলাম। মনে উৎকণ্ঠা। রহস্য

উদ্ধার হল এক মিনিটের মধ্যেই। পাশেই একটু উঁচুতে HPTDC - এর গেস্ট হাউস। এইখানে এসে ড্রাইভার চেঞ্জ হয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর পালস বিট নর্মাল হয়ে গেল। রাতের খাবার একটুও হজম হচ্ছে না। এসি বাসে পাহাড়ি রাস্তার বাঁক ঘোরায় শরীরে একটু অস্বস্তি শুরু হল। এতবার পাহাড়ে গিয়েও যা আমার কোনদিন হয়নি। ভোর সাড়ে তিনটের পর প্রকৃতির ডাক উপেক্ষা করা দায় হয়ে দাঁড়াল। ঠান্ডা এসির মধ্যে আধো জাগা অবস্থায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা কাটানোয় অবস্থা শোচনীয়। তার ওপর বমিভাব এড়াতে বেশ কয়েকবার জল খেতে হয়েছে। ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে এরকম অবস্থায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ বাস দাঁড়াল এক ক্যাফেটেরিয়ায়। নেমেই হাল্কা হতে ছুটলাম। মাঝারি ঠান্ডা বাতাস গাল-কপাল ছুঁয়ে গেল। পনের মিনিট ব্রেক দিয়ে বাস আবার ছুটল গন্তব্যের দিকে। একে একে ভুন্টার, কুলু পেরিয়ে মানালি বাস স্ট্যান্ডে যখন নামলাম ঘড়ির কাঁটা সাড়ে সাতটা ছুঁয়েছে।

১৭ জুন, মানালি, "উলটপুরাণ"...

বাস থেকে নেমে মালপত্র কালেক্ট করতে মিনিট পনেরো সময় লাগল। সকালের মিঠে রোদ আর আলতো ঠান্ডার মিশেল একটা মন ভালো করা আমেজ এনে দিল। বাসস্ট্যান্ড লোকে লোকারণ্য। আমরা হোটেলের খোঁজে ম্যালের দিকে এগোলাম। ধারণা ছিল এই সময় অফ সিজন চলবে। এখনকার দিনে অফ সিজন বলে যে আর কিছু হয় না সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। ম্যাল চত্বরে আমাদের থাকার মতো কোনো হোটেল পেলাম না। হয় একেবারে অখাদ্য ব্যবস্থা নয়ত খুব বেশি ভাড়া। অনেক খুঁজে একটু ভিতরের দিকে একটা হোমস্টে গোছের পাওয়া গেল। দিব্য ব্যবস্থা। শুধু গিজারটা চলে না আর টিভিতে ছবি আসে না এই যা। আমাদের তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সকাল থেকে খাওয়া জোটেনি, এদিকে বেলা প্রায় এগারটা বাজে। তিন ঘন্টা রাস্তায় ঘুরেছি ভারী স্যাক আর ন্যাপস্যাক কাঁধে। ঠান্ডা যেন উধাও হয়ে গেছিল। ঘরে ফ্যানের অভাব টের পাচ্ছিলাম। ঠান্ডা জলেই স্নান করতে অসুবিধে হল না। এবার পালা খাদ্যসন্ধানের।

দুপুরে ম্যাল রোডের এক পাঞ্জাবি হোটেলে ভরপেট খেয়ে জম্পেশ ঘুম দিলাম দুজনে। আজ কিছুই করার নেই। আমাদের ট্রেকের গ্রাউন্ড কো-অর্ডিনেটর পূজা হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছিল আগামীকাল সকালে টিম ব্রিফিং হবে হিড়িম্বা টেম্পলে। আগে থেকে জায়গাটা দেখে রাখা ভালো এই ভেবে বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়লাম। বাজারে লোকজন বলল হেঁটেই যাওয়া যায়। আমরা ভাবলাম ভালোই! ট্রেকের আগে একটা 'পা-মকশো' করে নিই। আধাঘন্টা হেঁটে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর জনসমাগমে মন্দিরচত্বর সরগরম। আমরা বেশ কিছু ছবি তুলে আস্তে আস্তে ফেরার পথ ধরলাম যখন, সামনের পাইনের বন ঝুপসি কুয়াশায় মুখ ঢাকতে ব্যস্ত। ম্যাল চত্বরে একটু ঘোরাঘুরি আর সন্ধে সাড়ে আটটার একটু পর রুটি আর ডিমের তরকারি দিয়ে ডিনার সেরে পা বাড়ালাম ডেরার উদ্দেশ্যে।

১৮ জুন, বিকেল ৫টা... "ইটস টাইম টু মিট দি আদারস"

ম্যালে বসে আছি দুজনে। সকালের গ্রুপ নোটিফিকেশনে জানলাম যে টিম ব্রিফিং বিকেল ছটায় ফাইনাল করা হয়েছে কারণ সব ট্রেকাররা এসে পৌঁছোতে বিকেল হয়ে যাবে। সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি আর অল্প কেনাকাটি সেরে দুজনে অপেক্ষা করছিলাম বিকেল হবার। এর আগে আমরা কখনও এত বড়ো গ্রুপের সাথে ট্রেক করিনি। বুঝতে পারছিলাম না মানিয়ে নিতে পারব কিনা। আমাদের নিজস্ব পথচলার আলাদা আনন্দ আর নিয়ম কানুন আছে। সেগুলো থেকে বঞ্চিত হতে চাইছিলাম না। অবশেষে সময় উপস্থিত বাকিদের দেখে নেওয়ার। উত্তেজনা ধরে রাখতে না পেরে অনেক আগেই পৌঁছে গেলাম মিটিং প্লেসে। সাড়ে পাঁচটায় ফোন বাজল, নেহেরু স্ট্যাচুর সামনে পৌঁছে যাওয়ার অনুরোধ। দু মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। ইন্ডিয়াহাইকের লোগো দেওয়া টি-শার্ট দেখে এগিয়ে গেলাম। সৌম্যদর্শন ট্রেক লিডার জানাল তার নামও সৌম্য, সৌম্য মিত্র। ট্রেকিং থাকবে বাঙালি থাকবে না, হয় না। বেশ কয়েকটা ফোনালাপের পর আদেশ এল ফলো দি লিডার। হ্যামলিনের বাঁশিওলাকে ফলো করে আমরা ইঁদুরেরা চললাম মানালি রিজার্ভ ফরেস্ট ক্যাম্পের দিকে।

বিকেল ৫.৫০, মানালি রিসার্ভ ফরেস্ট এরিয়া...

"হাই দিস ইজ সৌম্যজ্যোতি মিত্রা অ্যান্ড দিস ইজ হৃষিকেশ দেশপান্ডে, ইওর ট্রেক লিডার কাম কম্পেনিয়ন ফর দি নেক্সট ফাইভ ডেজ...ইউ ক্যান কল মি SJ"। আমাদের প্রথম টিম ব্রিফিং শুরু। বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদ পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে যাচ্ছে। একটা বড়ো সার্কেল বানানো হয়েছে। গোটা টিমের দু-তিন জন বাদ দিয়ে সবাই এসে পৌঁছতে পেরেছে। সাথে একজন অতিরিক্ত মেম্বার জুটে গেছে। লোমশ পাহাড়ি নেড়ি কুকুর একটা। কাছে এসে সবার গা শুঁকে যাচ্ছে। পাথরের ওপরে দুই ট্রেক লিডার বসে। সবার আগে প্রত্যেকের ইন্ট্রো দেওয়ার পালা। দেখা গেল আমরা দুজন ছাড়া আরও তিনজন বাঙালি। টিম ডক্টর কুণালবাবুর কথা আগেই বলেছি। সাথে এস.বি.আই.-এর গৌতমদা আর

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের শশাঙ্কদা। এই তিনজন বলা যায় প্রো-লেভেলের, আগে অন্তত চার-পাঁচটা বড়ো হাই অল্টিটিউড ট্রেকের অভিজ্ঞতা ওদের। বাকি কারোরই হাই অল্টিটিউড ট্রেকের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সেভাবে, আমরা দুজন ছাড়া। তবে সবাই বেশ চনমনে আর ফিট। সৌম্যদা আর হৃষিকেশ একে একে পুরো ট্রেক আইটিনারি এবং পথের বর্ণনা দিল। কবে কোথায় কীভাবে ক্যাম্প করা হবে তার ডিটেইল প্ল্যানিং শোনাল। বেশ একটা এক্সপিডিশন গোছের ফিলিং আসছিল আমার। বেরিয়ে পড়ার জন্য তর সইছে না যেন। দিনের আলো নিভতে বসেছে। প্রায় অন্ধকার বনে আমরা কজন ঠান্ডার হালকা আমেজ মাখতে মাখতে একে অপরকে চিনে নিচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তের কিছু দরকারি ট্রেক গিয়ার কেনাকাটা করল কিছু ট্রেকার। এবার ফেরার পালা। কাল ঠিক সকাল সাতটায় নেহেরু স্ট্যাচুর সামনে দেখা করা ঠিক হল। একঝাঁক হ্যান্ডশেক আর শুভেচ্ছা বিনিময় দিয়ে বিদায় জানিয়ে মানালি ম্যালের জনসমুদ্রে মিশে গেলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ আমাদের সঙ্গে হেঁটে হোটেল অবধি পৌঁছে দিল।

১৯ জুন, সকাল ৬.৩০, "ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড"...

সব রেডি। স্যাক গোছানো শেষ। শেষবারের মতো ঘরে চোখ বুলিয়ে মা দুর্গার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়িতে আর খবর দেওয়া যাবে না এর পর থেকে । তাই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই মা বাবার সঙ্গে কথা বলে নিলাম ভালো করে। জানি বাবার মুখ ভার হচ্ছে বাড়িতে। কী আর করা যাবে। ভোরের মিঠে রোদের উষ্ণতা চাখতে চাখতে পায়ে পায়ে এসে পড়া গেল নেহেরু স্ট্যাচুর সামনে। পেটের ভিতর গুড়গুড় করছে, এই জিনিসটা সব ট্রেকের শুরুতেই হয় আমার। অজানা আনন্দ, কী-হবে কী-হবে ভাবনার কৌতূহল আর ভয়মেশানো পেট খালি-খালি অনুভূতি। অনেকেই এসে গেছে, তবে সবাই নয়। কিছু টিম মেম্বারকে পিক আপ করা হবে যাওয়ার পথে Manali Zostel থেকে। এখন আমাদের গন্তব্য বেসক্যাম্প জোবরা (Jobra)। সেখানে ব্রেকফাস্ট সেরে ঘন্টা তিনেকের ট্রেক করে আজকের ক্যাম্প জ্বারা (Jwara)। এই বেলা ট্রেক রুটটা সবাইকে জানিয়ে রাখা দরকার।

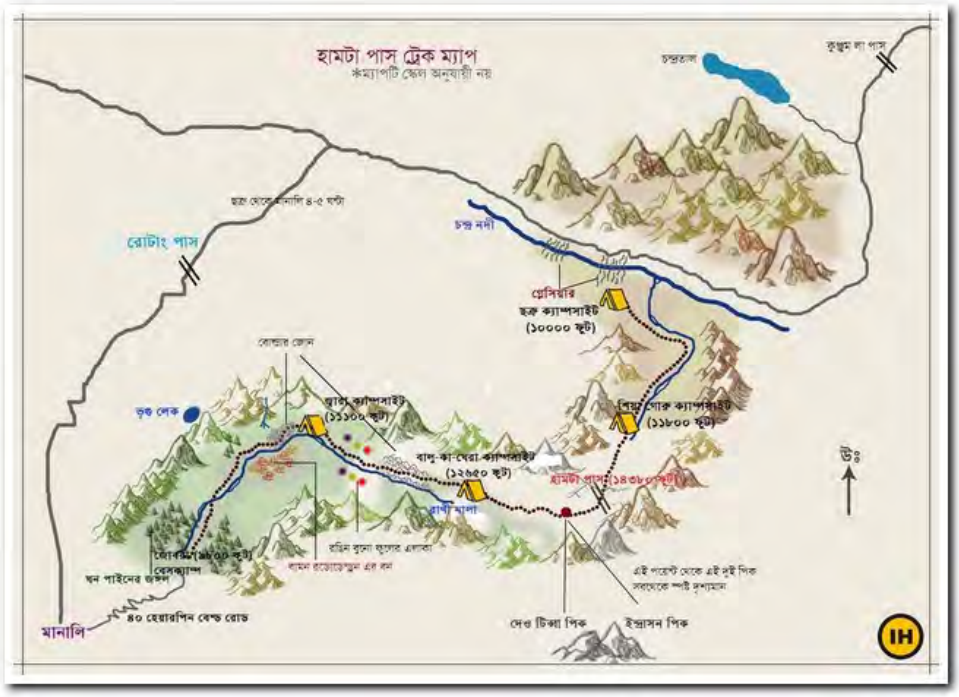

আজ আমাদের প্রথম ক্যাম্পসাইট জ্বারা (Jwara) পৌঁছোতে অল্প সময় লাগার কথা। প্রথম দিন তাই সবাই রিল্যাক্সড মুডে নিজেদের আপন গতিতে হাঁটছে। সৌম্যদা বলে দিয়েছে "অভি তোমার দায়িত্ব ভালো ছবি তোলার, মনে থাকে যেন।" একটা জিনিস বলা হয়নি। ইন্ডিয়াহাইকের একটা খুব দামি এবং পিঠ চাপড়ানোর মতো উদ্যোগ আছে যার নাম 'Green Trail Initiative।' আমাদের প্রত্যেককে একটা করে সবুজ রঙের বেল্ট দেওয়া সিন্থেটিক ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। যেটা কোমরে জড়িয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। এই ব্যাগের মধ্যে জমা করতে হবে জঞ্জাল, প্লাস্টিকের র‍্যাপার, রিসাইক্লেবল নন বায়ো-ডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট। তারপর ক্যাম্পে পৌঁছে সেগুলো এক জায়গায় জমা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সঙ্গে করে এবং রি-সাইকেল করা হবে। এই সব কিছুই আমাদের প্রিয় হিমালয়কে দূষণমুক্ত করার জন্য। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যতটা সম্ভব জঞ্জাল কুড়োতে লাগলাম।
পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মোটামুটি সমান্তরাল বলা যায়। প্রথম ঘন্টায় চড়াই-উৎরাই তেমন নেই। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে নাগচম্পা (Snake Lily) ফুলের ঝোপ। দেখতে একেবারে ফণা তোলা গোখরোর মত।

স্নেক লিলি

চলার পথে

কচি পাইনের গন্ধ নাকে আসছে। দু'পাশের ঘন জঙ্গল ভেদ করে আমরা চলেছি লাইন করে, যেন খাবারের সন্ধানে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। কিছুটা চলার পর রাস্তা নেমে গেছে নদীর দিকে। তার উপর কাঠের সাঁকো। তীব্র খরস্রোতা নদী পেরিয়ে আমরা এক সমতল সবুজ বুগিয়াল দিয়ে হেঁটে চললাম নদীকে ডানদিকে রেখে। কিছুটা হলেও বোল্ডার ছড়িয়ে চলার পথে। দূরে চড়াই শুরু হয়েছে। এতই সুন্দর চারিদিকের প্রকৃতি যে বারবার পিছন ফিরে তাকাতেই হচ্ছে। ফেলে আসা পথের মায়া যেন কাটছেই না। বেশ কিছুটা চড়াই ভাঙার পর সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সৌম্যদা বলল সামনে কিছুটা এগিয়েই বিশ্রাম করা হবে। জায়গাটার নাম 'চিখা'। এখানেই প্রথম প্রথম হামটা ট্রেক শুরু হবার পর ইন্ডিয়াহাইকের ফার্স্ট-ডে ক্যাম্প করা হত। কিন্তু এখন বদলে আরও একটু এগিয়ে 'জ্বারা'য় করা হয়েছে।

"চলার পথে কোন এক ফাঁকে" - জুয়েলের স্কেচ

বসে থাকার ফাঁকে ক্যামেরাটা ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আবার একটু নিঃশ্বাস নিয়ে নিল। পেটটাও ঠান্ডা হল একটু চকলেট আর জল পেয়ে। পাগুলোও মনে মনে ধন্যবাদ দিল। এবার আর থামা নেই। একটানা চলতে হবে অনেকটা। আজ একটা বেশ বড় রিভার ক্রসিং আছে। সেটা পেরোলেই ক্যাম্প। এক পা দু'পা করে চড়াই ভাঙছি। পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে বড় বড় বোল্ডার। এবারের ট্রেকে হাঁটতে সুবিধে হচ্ছে কারণ সাথে নতুন ওয়াকিং পোল। একটা ছোট্ট ঝরনা পেরিয়ে সরু একটা ট্রেইল উঠে গেছে প্রায় সত্তর ডিগ্রি ঢালে বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে। উপায় নেই, স্টিকটাকে গুটিয়ে ছোটো করে পিঠের ন্যাপস্যাকে ঝুলিয়ে নিলাম। আমার হাইট কম, তাই আমার পক্ষে শুধু পায়ের ভরসায় ওঠা সম্ভব হল না। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ওই ১০-১২ ফিট রক ক্লাইম্ব করতে হল।

বাকিদের দেখা যাচ্ছে দূরে। কেউ সামনে এগিয়ে কেউ পিছনে পড়ে আছে। একটা পনেরো বাজে। যথারীতি আকাশ গোমড়ামুখো হতে শুরু করেছে। হাওয়া বইছে মাঝারি। বেশ ঠান্ডা হাওয়া। পথের পাশেই একগাদা বিভিন্ন রঙের ছোটো ছোটো পাহাড়ি বুনো ফুলের গাছ। ঠান্ডা বাতাস যেন ওদের ঘুম থেকে ডেকে তুলছে আর ওরা মাথা নেড়ে বলছে 'লেটস প্লে'।

দেড়টা নাগাদ নদীর পাড়ে এসে পৌঁছোলাম। এসে তো তার গর্জন আর স্রোত দেখে বুকটা একবারের জন্য হলেও ছ্যাঁত করে উঠল। ভেবেছিলাম এপার-ওপার দড়ি লাগানো থাকবে ধরে-ধরে পেরোনোর জন্য। না, সেসব কিছুই নেই! জুতো খুলে সবে ব্যাগের সাথে বেঁধেছি, একেবারে প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। কোনোমতে প্যান্ট গুটিয়ে গায়ে রেনকোট চাপালাম। ওদিকে সৌম্যদা আর হৃষি তাড়া দিচ্ছে। একটা হিউম্যান চেন বানানো হল। প্রথমে আমাদের কো-গাইড সুনীল পেরিয়ে গেল কিছুটা। তারপর একে একে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে পেরোতে শুরু করলাম। জলে পা দিতেই পা অসাড় হয়ে গেল। দু-তিন পা এগোতে না এগোতেই মনে হল আমার পা আর নেই হাঁটুর নীচ থেকে। এদিকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মনে হয় পাহাড়ের ওপরের দিকেও জোরালো বৃষ্টি হচ্ছিল। নদী চওড়ায় ১২-১৩ ফিটের বেশি নয়, কিন্তু ওটাই কয়েক মাইল মনে হচ্ছিল। আমার বাঁদিকে ছিল প্রিয়াঙ্কা আর ডানদিকে ধরে আছে হৃষিকেশ। হৃষির ডানদিকে আবার জুয়েল। জুয়েল-এর পা স্লিপ করছিল, এদিকে আমাকে টানছে প্রিয়াঙ্কা আর আমার বাঁদিকের বাকি সবাই। সে এক অদ্ভুত 'টাগ-অব-ওয়ার' পরিস্থিতি। হৃষি আর না পেরে বলল হাত ছেড়ে এগিয়ে যেতে। আমরা ডান থেকে বাঁয়ে ক্রস করছিলাম। ডান দিকের হাত ছেড়ে দিতেই পুরো ব্যালেন্স চলে গেল। হু-হু করে ছুটে আসা বরফ ঠান্ডা জলে অসাড় পা বিট্রে করল। পিছলে গিয়ে কোমর অবধি ডুবে গেলাম। এই উচ্চতার জলে পুরো ডুবে যাওয়ার ভয় নেই, কিন্তু হাইপোথার্মিয়ার ভয় অবশ্যই আছে। হৃষি আমার কাঁধ খামচে ধরায় সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারলাম। শেষটুকু পেরিয়ে গেলাম নির্বিঘ্নে। হৃষিও বাকিদের নিয়ে এগোচ্ছিল। এদিকে নদীর জলের স্রোত বাড়ছে। জুয়েলের পরে নবীন আর তার পরে নীলাদ্রি। আমি এপারে এসে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে লাফঝাঁপ আর স্ট্রেচিং করে ব্লাড সার্কুলেশন চালু করার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মুখ নদীর দিকে করে দেখি পেরিয়ে প্রায় চলে আসার মুখে নীলাদ্রি ডিসব্যালেন্সড হল আর ওর বাঁ পা'টা পাথরে ঠুকে গেল। ওপরে উঠে আসতেই দেখি শিন বোনের উপর বেশ কিছুটা ছড়ে গেছে। সৌম্যদা বলল ক্যাম্পে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেবে। ক্যাম্প দেখা যাচ্ছিল। ভেজা জামাকাপড় আর জুতো জলদি ছাড়তে হত। প্রায় দৌড়ে ১০ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। আমাদের দেখে হয়তো ভগবানেরও মায়া হচ্ছিল। আমাদের যেন পিছু ধাওয়া করে রোদও চলে এল গুটি গুটি পায়ে একটু উষ্ণতা ফেরি করতে।

বিকেল বেলার রোদ পোহানো জ্বারা ক্যাম্পসাইট

বিকেল ৪.২০... "ইভনিং স্টোরিস"

বেশ ইচ্ছে করছিল একটু ক্যাম্প ফায়ার করতে। কিন্তু সেটা IH-এর নিয়মবিরুদ্ধ বলে জানাল সৌম্যদা। তাই সবাই গোল করে বসে গল্প শুরু করলাম। নিজেদের ট্রেক অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে করতে সন্ধে হয়ে এল। বিকেলের সামান্য মজাদার কিছু গেমস এবং স্ট্রেচিং সেরে সবাই স্যুপ খেয়ে ডিনার এর জন্য তৈরি হতে লাগলাম। ঠিক সাতটায় অতি উপাদেয় তরকারি এবং ডাল দিয়ে রুটি-ভাত এবং ডেসার্ট হাজির। ডাইনিং টেন্টের মধ্যে হেডল্যাম্পের আলোয় গরম খাবার গলাধঃকরণ করতে করতে মজাদার আড্ডা এবং হাসাহাসি চলতে লাগল। হট চকোলেটের কাপ হাতে নিয়ে বাইরে আসতেই ঠান্ডার কামড় মালুম পেলাম। কোনোমতে নিজেদের কাপ আর লাঞ্চবক্স ধুয়ে টেন্টে সেঁধিয়ে গেলাম। শোবার জন্য রেডি হয়ে গেছি প্রায়, বাইরে থেকে সৌম্যদা ডাকল। এখন হল অক্সিমিটার দিয়ে শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার পালা। রিডিং ৮০ অবধি নরম্যাল। তার নীচে নামলে বিপদের আভাস। রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে গেলে 'অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস' (AMS)হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমার রিডিং দেখাল ৮৪ আর পালস রেট ৯০। নীলাদ্রির যথাক্রমে ৯০ আর ৮০। আমাকে বেশি করে জল আর ডায়ামক্স এর রেগুলার ডোজ খেতে বলে সৌম্যদা বিদায় নিল। প্রথম দিনেই রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমের দিকে থাকায় একটু চিন্তা নিয়েই শুতে গেলাম। কাল আরও অল্টিটিউড গেন করার আছে। দেখা যাক কী আছে কপালে।

২০ জুন, ভোর ৬-টা... "কাম অন গাইজ ইওর টি ইজ হিয়ার"...

হাই অল্টিটিউডে আমার কোনোদিনও ভালো ঘুম হয় না। নরম স্লিপিং ব্যাগে কুঁকড়ে 'কমা' হয়ে শুয়েছিলাম। ঠান্ডা ভালোই। ভোর হয়ে গেছে। বাইরে হিমালয়ান ফিজান্টের একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। কাকেরাও কম যায় না। আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শুনলাম-"কাম অন আউট গাইজ, ইওর মর্নিং টি ইজ হিয়ার।" জামাকাপড় জড়িয়ে টেন্টের চেন টেনে বেরোতেই এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল। সবাই সবাইকে 'গুড মর্নিং' উইশ করে কিচেন টেন্টে লাইন লাগালাম চায়ের উদ্দেশ্যে।
ব্রেকফাস্টের পর সবাই রাউন্ড করে সার্কেল বানিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেক লিডারদের ব্রিফিং শুনতে লাগলাম। আজকের গন্তব্য 'আপার বালু কা ঘেরা'। সবুজ গালিচা বিছানো রঙিন ফুলের মাঝখান দিয়ে পথচলা শুরু। আজও প্রায় পাঁচ-ছ ঘন্টার হাঁটা। প্রথম ঘন্টায় সমান্তরাল ট্রেল বেয়ে সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে এগোতে থাকলাম সবাই। দলের সবাই যে যার আপন গতিতে চলেছে। মাঝে মাঝেই হঠাৎ খাড়াই বোল্ডারের চড়াই এসে হাজির হচ্ছে। আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। সূর্যদেব মাঝে সাঝে অল্প স্বল্প 'পিক-আ-বু' করেই কেটে পড়ছেন দিব্যি। নদীকে ডান হাতে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি চড়াই ভাঙতে ভাঙতে। মাঝে মধ্যে দৃষ্টিসুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে ডানদিকের অনামী পাহাড় বেয়ে নেমে আসা বিশাল বিশাল গ্লেসিয়ার আর তার সাথে লাইন দিয়ে এগিয়ে চলা ভেড়ার পাল। আলাপ হল তাদেরই একজন চঞ্চল শক্তসমর্থ দেহরক্ষীর সাথে। স্টিভ আর জেসিকার সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। নরম বাদামি লোমশ চেহারার 'ব্রাউনি' আমাদের টিম মেম্বার হয়ে গেল।

"মুগ্ধ নয়ন নীলাদ্রি"

ঘন্টা দুই একটানা হাঁটার পর এক ঢালু উৎরাই নামতেই অপূর্ব দৃশ্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনে এক খাড়াই পাথরের দেওয়াল। তার পাশ দিয়ে নেমে এসেছে অপূর্ব এক ঝরনা। ডানদিকেও খাড়া উঠে গেছে পাথরের দেওয়াল। তার ওপরে পুরো সবুজের চাদর আর সামনে নদীর এপারে এক বিশাল পাথরের টিলা একা দাঁড়িয়ে। এই নিঝুম বিশালত্বে বড়োই একা হতে মন চাইল। দাঁড়িয়ে পড়লাম স্থবির হয়ে। একে একে অনেকেই পেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না। দাঁড়িয়েই রইলাম।

সৌম্যদার ডাকে হুঁশ ফিরল। একসাথে হাঁটতে শুরু করলাম। "আচ্ছা, হামটা পাস কেন? এরকম অদ্ভুত নাম কিন্তু শুনিনি।" সৌম্যদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল ওরও সঠিক ভাবে কিছু জানা নেই। আমি যদি কিছু জানতে পারি তাহলে যেন জানাই। বাড়ি ফিরে ইন্টারনেটে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সামান্য একটু তথ্য আবিষ্কার করা গেল। মহাভারতীয় যুগে কৌরব অধিকারে থাকা ওইসব পার্বত্য প্রদেশে মহর্ষি হামটা তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং এক আশ্রম তথা গ্রামের স্থাপনা করেন যার নামকরণ তাঁর নামানুসারেই হয় হামটা গ্রাম। সেখান থেকেই চলতি পথে অনুসৃত হয়ে বর্তমান হামটা পাস নামকরণ। এই পাস কুলু ভ্যালির সাথে স্পিতি ভ্যালির যোগাযোগ স্থাপন করেছে, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪২৭০ মিটার (১৪০১০ ফিট)।

আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। নীলাদ্রি এগিয়ে গেছে কখন খেয়াল করিনি। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম বোল্ডারের রাজ্যে একা। পিছনে তাকিয়ে অনেক দূরে সুনীলের সঙ্গে কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। সুনীল একদম বাচ্চা ছেলে, সতেরো কী আঠারো বছর হবে, আমাদের কো-গাইড ও। আজ ওর দায়িত্ব ছিল 'সুইপার'-এর। 'সুইপার' একটা টেকনিক্যাল টার্ম। এখানে টিমের ফর্মেশন নিয়ে একটু বলে রাখি। আমাদের ট্রেক লিডার দু'জন আগেই বলেছি, সৌম্যদা আর হৃষীকেশ। সঙ্গে টেকনিক্যাল গাইড কাম ম্যানেজার রাহুল আর কো-গাইড সুনীল। আমাদের টিম বেশ বড়ো হওয়ায় এই চারজন সামনে থেকে পিছনে চারটে পয়েন্টে সবার সাথে চলেছে। একেবারে শেষ জনের নাম 'সুইপার'। তার কাজ শেষ ট্রেকারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। আমাদের মধ্যে এই শেষ ব্যক্তিটি হলেন সাউথের তামিল-তেলেগু-মালায়লাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিখ্যাত নায়িকা নমিতা।

একটুখানি জল গলায় ঢেলে কয়েক ধাপ উপরে উঠতেই দেখি জুয়েল মাথা ঝুঁকিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে। 'কী হয়েছে' জিজ্ঞেস করায় বলল-"ফিলিং ব্রেথলেস অ্যান্ড ডিজি, নিয়ারলি ব্ল্যাকড আউট"। বুঝতে পারছিলাম ভীষণ অক্সিজেন-এর অভাবে ভুগছে ও। বেশি করে জল খেতে বলে আর মিনিট পাঁচেক অন্তত বসে রওনা দিতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম। গতকালের মতো আজও আকাশ মুখ ভার করে ছিল। একটা অপরূপ সফেন দুধ-সাদা ঝরনার পাশে অভিষেক-প্রিয়াঙ্কা, নভিন আর সুমিতের সঙ্গে নীলাদ্রিকে পেয়ে গেলাম। ছবি তুলে মন ভরছিল না।এদিকে মেঘের সঙ্গে কুয়াশা জোট বেঁধে সব আলো শুষে নেওয়ার চক্রান্ত করতে বসেছে। দেরি না করে পা চালাতে শুরু করলাম সবাই। কালকের জামাকাপড়ই শুকোয়নি। আজ আবার ভিজে গেলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। আধঘন্টা মতো হাঁটার পর তিরতির করে বয়ে চলা এক ছোট্ট ঘুমপাড়ানি ঝরনা পাশে সঙ্গ নিল। দূরে এক অপূর্ব লেকের মতো এলাকার পাড়ে পাহাড়ের ঢালে আমাদের হলুদ তাঁবুর সারি দেখতে পেলাম। তবে সেখানে পৌঁছোতে গেলে পেরোতে হবে দুর্লঙ্ঘ্য উঁচু উঁচু বোল্ডারের জঙ্গল আর প্রবল বেগে ধেয়ে আসা নদী। নীলাদ্রির অভিজ্ঞতা এইসবে আমার চেয়ে বেশি। ওকে লিড করতে বলে আমি ওর ফুটস্টেপ ফলো করে এগোতে লাগলাম। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দুহাতে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ক্লাইম্ব করে রীতিমতো ঘাম ঝরিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছোতে আধঘন্টা লেগে গেল। রাহুল দাঁড়িয়ে ছিল। পাথরের ওপর পা ফেলে রাহুলের হাত ধরে পার হয়ে গেলাম। আজকের মতো হাঁটা শেষ। এসে পড়েছি দ্বিতীয় ক্যাম্প, রানি নালার পাড়ে, বালির রাজ্য "বালু-কা-ঘেরা"-য়।

রানি নালার ধারে বালু কা ঘেরা ক্যাম্পসাইট

প্রথমে ভেবেছিলাম এই দিনটায় তো বিশেষ কিছু ঘটেনি তেমন কী আর লিখব, কিন্তু পরে মনে হল ক্যাম্পসাইটটার অন্তত একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। ওখানে বসেই স্কেচবুকে ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নিয়ে যাইনি তাই ছবি তুলে সাধ মেটালাম। তবে পরে বাড়ি ফিরে আর লোভ সামলানো যায়নি।

বালু-কা-ঘেরা ক্যাম্পসাইটের স্কেচ

আমাদের ব্যাচই প্রথম ক্যাম্প করল এখানে। আগে এই ক্যাম্প করা হত বোল্ডার রাজ্যের আগে এক সমতলে, যার নাম লোয়ার বালু-কা-ঘেরা। জিপিএস এ ল্যাটিটিউড-লঙ্গিটিউড নোট করে নেওয়া হল। একেবারে নতুন ক্যাম্পসাইট, তাই ভালো করে পরিষ্কার করা হয়ে ওঠেনি। চারিদিকে সবুজ ঘাস আর ছোটো বুনোফুলের গাছের জঙ্গল। তাই পোকামাকড়ের উৎপাত যথেষ্টই। তবে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমস্ত কষ্ট ম্লান করে দেয়। সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া রানি নালা এবং তার পাশে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক হ্রদে গগনচুম্বী তুষারশুভ্র শৃঙ্গের প্রতিচ্ছবি মনকে এক পলকে অন্য পৃথিবীতে নিয়ে চলে যায়। আরেকদিকে ইন্দ্রাসন শৃঙ্গ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে বোল্ডার আর রাশি রাশি তুষারের মাঝে উঁকি দিচ্ছে হামটা পাসের পথ।

"এক পশলা বৃষ্টির পর বালু কা ঘেরায় সৌম্যদা"

লাঞ্চের পর কুয়াশার মতো গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির পরোয়া না করে স্টিভ, জেসিকা আর জুয়েল হাঁটা লাগাল সামনের গ্লেসিয়ার এর উদ্দেশ্যে। আমাকেও ডাক দিল বরফ ছোঁড়ার খেলায় যোগ দেওয়ার জন্য। আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না, ক্লান্ত লাগছিল। ব্রাউনির উৎসাহের অন্ত নেই। সে ঠিক পিছু নিল।

জুয়েল-ব্রাউনি-স্টিভ

নীলাদ্রি আর আমি ডাক্তারবাবুদের টেন্টে ঢুকে পড়লাম আড্ডা দিতে (বাঙালির ল্যাদ, যাবে কোথায়?)। সৌম্যদা আর হৃষিও যোগ দিল। সবার পুরোনো ট্রেকের গল্প করতে করতে সময় কেটে গেল দেখতে দেখতে। ছটায় স্যুপ আর সাতটায় ডিনার খেয়ে টেন্টে ঢুকে পড়লাম। কাল 'পাস ডে'। সক্কাল সক্কাল বেরোতে হবে। ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে ধরছিল। রুটিনমাফিক অক্সিমিটার নিয়ে সৌম্যদা হাজির হল একটু পরেই। রিডিং দেখে ঘাবড়ে গেলাম। মাত্র ৭৪, অর্থাৎ ডেঞ্জার জোনে ঢুকে পড়েছি। সৌম্যদা চিন্তিত মুখে বলে গেল বেশি করে জল খাও আর ডায়ামক্স এর ডোজটা ভুলো না। কাল সকালে আবার দেখে ঠিক করব কী করা যায়। জুয়েলের কথাটা আগেই ওকে বলেছিলাম। ওকেও ওষুধ দিয়েছে জানিয়ে টেন্টের জিপার টেনে সৌম্যদা বিদায় নিল। নিলু আর আমি নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওষুধ খেয়ে স্লিপিং ব্যাগে বডি চালান করে দিলাম। তাহলে কি পাস পেরোনো হবে না আমার?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

~ ~ *হামটা পাস ট্রেকরুট ম্যাপ* **~** *হামটা পাস ট্রেকের আরও ছবি* **~**

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্টেন্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পাহাড়ে না গেলেই ডিপ্রেশনে ভোগেন। ট্রেকে বেরোলেই ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফিরে এসে লিখতে বসলেই আবার ল্যাদ খান। তবে এর পরেও কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু লেখেন তা স্রেফ " আমাদের ছুটি"-র জন্যই। বাড়িতে চমৎকার রুটি বানান। মাঝেমধ্যে রান্না করতেও ভালোবাসেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

te!! a Friend

মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

সোনায় মোড়া দেশ

শরণ্যা ব্যানার্জী

রাজস্থানের তথ্য ~ রাজস্থানের আরও ছবি

জয়সলমীর না গেলে বুঝতামই না সোনার কেল্লার রহস্য। রাতের অন্ধকারে প্রথম দর্শন। নীচ থেকে আলোকিত কেল্লাকে ধরাছোঁয়ার বাইরের এক স্বপ্নপুরী মনে হচ্ছিল। পরদিন সূর্যের সোনা রং মেখে তার ঝলমলে অন্য রূপ।

শুক্রবার রাতে প্রায় হঠাৎ-ই পুরনো দিল্লি রেল স্টেশন থেকে মান্দোর এক্সপ্রেসে চেপে বসেছিলাম আমি, মা, বাবা। ট্রেন ছাড়ল রাত সোয়া নটায়। পরদিন সকাল সাতটা পঞ্চাশে যোধপুর। রিফ্রেশিং রুমে ফ্রেশ হয়ে প্ল্যাটফর্মেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। আমাদের তিনজনের পিঠে তিনটে ব্যাগ; সুতরাং হোটেলের চক্করে না গিয়ে একটা অটো পাকড়ালাম। রফা হল আটশো টাকায় সারাদিন যোধপুর ভ্রমণ। শুরু হল উমেদ ভবন দিয়ে, চড়াই অনেকটা-অটো ড্রাইভার ছবির মত প্রাসাদের গেটে নামাল। একশো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে জানলাম প্রাসাদের বেশির ভাগই হোটেল হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাকী অংশটুকু আর মিউজিয়াম ঘন্টাখানেকের মধ্যে দেখা হয়ে গেল। এবার আসল গন্তব্য - মেহেরানগড়। আমাদের দেশের বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ কেল্লাদের মধ্যে অন্যতম।

দূর থেকে পাহাড়ের মত 'ম্যাজেস্টিক মেহেরানগড়' কে দেখতে পেলাম, নীচে ছড়িয়ে রয়েছে 'নীল নগরী' যোধপুরের নীলরঙা ঘরবাড়ি। অটোচালক মনোহর সিং জানালেন গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে এ ব্যবস্থা। মায়ের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে মনোহর সিং-এর। বলে দিলেন কেল্লা চারশো দশ ফিট উঁচু; চড়াই উঠতে অসুবিধে হলে লিফট এর ব্যবস্থা আছে। এখানেও সেই একশো টাকার টিকিট; তবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাড় আছে। পাঠভবনের আই কার্ড সঙ্গে থাকায় ছাড়গুলো বারবার পেতে লাগলাম। ছাড় পেলাম অডিও গাইডেও। কেল্লার ভেতরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের আদ্যোপান্ত ইতিহাস কানেকানে বলে দেয় এই যন্ত্র। এমনিতে দেড়শো টাকা। আমার জন্য একশো। এই যন্ত্র মারফৎ জেনেছিলাম রাজস্থানের রানিরা যুদ্ধজয়ী রাজাকে সাদরে বরণ করে 'পাধারো মারো দেশ' বলে, কিন্তু যুদ্ধে হেরে গেলে সে রাজার স্থান হয় না কেল্লায়। তাকে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে বেড়াতে হয় বনে জঙ্গলে।

মেহেরানগড় কেল্লায় ঢোকার মুখে বাঁদিকের একটা ফলকে অনেকগুলো ছোট ছোট হাতের ছাপ আছে। শুনলাম সতী হতে যাবার সময় এখানে রানিদের হাতের ছাপ দিয়ে যেতে হত। অজান্তেই হাত চলে গেল দেওয়ালে। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম অনুভব করতে এই সব হাত যাদের ছিল তাদের যন্ত্রণা। শেষমেশ চশমা খুলে চোখ মুছতে হল বারবার।

কেল্লার দর্শনীয় স্থানগুলো বিশদে লিখব না কারণ ইন্টারনেটে অনেক বেশি ভালো বর্ণনা দেওয়া আছে ছবিসমেত। শুধু বলব এই কেল্লা খুঁটিয়ে দেখার জায়গা। এক কথায় অপূর্ব! এখনও যা আছে তাতে রাজস্থানের রাজসিক জৌলুস আর আড়ম্বরের আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না। দৌলতাবাদ আর গোলকোন্ডা কেল্লারা শুধু ইমারৎগুলো ধরে রেখেছে। আগ্রা ফোর্ট দেখেও আড়ম্বরের পুরোপুরি আন্দাজ হয় না। এখানে সবকিছু এমনভাবে রাখা আছে যে ক্ষণিকের ভাবনায় নিজেকে যোধাবাঈ বা মান সিং গোছের কিছু মনে করতে কষ্ট হয় না। কী প্রচন্ড বিলাস, রঙ-এর হুল্লোড় আর সদম্ভ অস্তিত্বের প্রকাশ এই কেল্লায়। বিশেষ করে মহারাজ তখ্ত সিং রাঠোরের কথা না বললে নয়। ইনি ছিলেন আদ্যন্ত ভোগী এবং নারীসঙ্গলোভী রাজা। শোনা যায় তার নাকি ষোলোজন রানি এবং চৌত্রিশজন উপরানি ছিল। মজার ব্যাপার, রানির পুত্র হলে তবেই রাজা হওয়ার অধিকার ; নচেৎ রাওরাজা উপাধিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মেহেরানগড় থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম যথাক্রমে যশবন্ত থাডা আর মান্দোর গার্ডেনে। প্রথমটা মহারাজা যশবন্ত সিং-এর সমাধিস্থল এবং যোধপুরের তাজমহল বলে পরিচিত। দ্বিতীয়টা নাকি রাবণের শ্বশুরবাড়ি; অর্থাৎ মন্দোদরীর বাপের বাড়ি। জায়গাটা খুব সুন্দর ; বিগত দিনের

রাজা রানিদের সমাধি সৌধ গুলো অপূর্ব।
এরপর জিপসি রেস্টুর‍্যান্ট এ পাক্কা রাজস্থানী থালি খেয়ে মনোহর সিং-এর ঠিক করে দেওয়া হোটেলে রাত যাপন।
অবশ্য ইচ্ছে করলে সেদিনই রাতের ট্রেনে জয়সলমীর বেরিয়ে যাওয়া যায়। তবে ধকল বেশি হবে মনে করলে পরদিন বাসেও যাওয়া যেতে পারে। পরদিন সকালে যোধপুরে মায়ের কিছু কাজ থাকায় আমরা দুপুর একটায় বাসে চাপলাম জয়সলমীরের উদ্দেশ্যে। মজার ব্যাপার,যোধপুর-জয়সলমীরে বাসে মেয়েদের ভাড়া ছেলেদের চাইতে অনেক কম। সরকারি নির্দেশ সম্ভবত। আমাদের তিনজনের টিকিট ৯০০ টাকার মধ্যে হয়ে গেল। এম আর ট্রাভেলসের বাস - এসি এবং লাক্সারি। নন এসি আরও সস্তা, কিন্তু নভেম্বর মাত্র দুদিন দূরে অথচ বাতাসে গরম হলকা - মরুভূমি থেকে বয়ে নিয়ে আসছে বোধ হয়।

বাস চলল। রাস্তা এমন যে ছবি আঁকতে আঁকতে যাওয়া যায়। দেশে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আনে যোধপুর, জয়সলমীরসহ গোটা রাজস্থান। আমাদের বাসেও প্রচুর বিদেশি - অত্যন্ত বিনয়ী তারা। তবে নিজেদের নিয়ে থাকতে ভালবাসে। আমার সীটের বাঁদিকে ইংল্যান্ড থেকে আসা বছর কুড়ির একটি ছেলে একা উঠেছিল বাসে - পাশের সিটে ইজরায়েলি মাঝবয়েসী একজনকে পেয়ে দারুণ উচ্ছসিত। দেচু, পোখরান এসব পেরিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাস ঢুকল জয়সলমীর। আমাদের হোটেল বুক করা নেই। শরণাপন্ন হলাম কন্ডাক্টর হুকুম সিং রাঠোর-এর। বাস থামলে আমাদের একটা সাদা ইন্ডিগোতে চাপাল হুকুম সিং। বলল, কয়েকটা হোটেল দেখাব, যেটা পছন্দ হয়। প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল হোটেল অশোকা, চার্জ আশাতীতভাবে সস্তা। সেদিন রাতে আবার খেলাম রাজস্থানী থালি - আর মায়ের বিশেষ প্রিয় ডাল-বাটি-চুরমা। সেই ইন্ডিগোই আমাদের হোটেল সুস্বাগতমে খাওয়াতে নিয়ে গেল। লোকজন এত ভালো যে মনে হচ্ছিল আমরা যেন বহুদিন বাদে নিজেদের ফেলে যাওয়া জায়গায় ফিরে এসেছি। বিশেষ করে বছর কুড়ির মহব্বত খানের আপ্যায়নে আমরা আপ্লুত!

হোটেলে ফিরে পরদিনের ট্যুর প্যাকেজ ঠিক করা হল। চব্বিশ ঘণ্টার প্যাকেজ। মাথাপিছু আঠারশো টাকার বিনিময়ে আমরা যেন চব্বিশ ঘণ্টার স্বপ্ন কিনে নিলাম। সে স্বপ্নের সওদাগর রাজু সিং রাঠোর। হ্যাঁ, এই নামই বটে তার যাকে বলা যায় টল, ডার্ক এন্ড হ্যান্ডসাম; যার দুকানের দুলে হীরের দ্যুতি। সে পরদিন সকাল নটায় হাজির আবার সেই দুধসাদা ইন্ডিগো নিয়ে। গাড়িসার লেক দিয়ে শুরু করে সে আমাদের দেখাল জয়সলমীরে গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম এবং নাথমলজী কি হাভেলি, সালিম সিং কা হাভেলি, পাট্টো কা হাভেলি - চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না হাভেলিগুলোর সৌন্দর্য। জয়সলমীর যে একসময় গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যকেন্দ্র ছিল, এই হাভেলিগুলো তার প্রমাণ। বিকেল চারটেয় রাজু সিং আমাদের নিয়ে চলল ডেজার্ট সাফারিতে। বলে দিল পরবর্তী গন্তব্যের নাম - সাম স্যান্ড ডিউন।

গাড়ি জয়সলমীর ছাড়তেই দুপাশে সোনার কেল্লায় দেখা অবিকল দৃশ্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশ্চর্য, সিনেমায় যেমন দেখেছি ঠিক তাই। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি এতগুলো বছরে। তবে রাজু সিং যখন দূর থেকে বড়াবাগ দেখাল এক নিমেষে মোহিত হয়ে গেলাম। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় অসংখ্য সোনালি ছত্রী (জয়সলমীর রাজপরিবারের সমাধিস্থল) - ছোটো গম্বুজাকৃতি কাঠামোগুলোকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।
এদিকে প্রথম সমুদ্র দেখার মতই প্রথম মরুভূমি দেখার উত্তেজনা ভেতরে। থর মরুভূমি, দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ডেজার্ট - ভারত আর পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসেবে কাজ করছে। রাজু সিং দেখাল সেই হাইওয়ে যা পাকিস্তানের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। থর মরুভূমি বহু প্রাচীন। রামায়ন মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। এখানকার ডেজার্ট ন্যাশানাল পার্কে নাকি ১৮০ মিলিয়ন বছরের পুরনো প্রাণী এবং গাছের ফসিল আছে। রাজু সিং-ই গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প করছিল। গল্পের মাঝেই দেখি রাস্তার দুপাশে ডেজার্ট ক্যাম্পের সমারোহ। রাজপুতানা ডেজার্ট ক্যাম্প, ডেজার্ট স্প্রিং রিসর্ট, রয়্যাল ডেজার্ট ক্যাম্প, রাজস্থান ডেজার্ট সাফারি ক্যাম্প, চোখি ধানি ডেজার্ট ক্যাম্প এরকম সব নাম।
আমাদের গাড়িও এরকম একটা রিসর্টের সামনে থামল। নাম শিবতারা ক্যাম্প। আমাদেরই জন্য সেখানে একটা হুড খোলা জীপ অপেক্ষা করছিল। ব্যস, চললাম আমরা জীপ ডেজার্ট সাফারিতে। সে এক অভিজ্ঞতা বটে! বালিয়ারির মধ্যে দিয়ে জীপ চলেছে - নাগরদোলায় চড়া আর

কী! এই চড়াই উঠছে তো ওই নামছে নীচে - বালির ঢিপি আর খাদে ভরা জায়গাটা। ইচ্ছে করেই মরুভূমির মজা দেখাবার জন্য ওরা ট্যুরিস্টদের এখানে নিয়ে আসে। সঙ্গে তারস্বরে গান চালিয়ে দেয়। আমাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দেখে রাজু সিং হেসে কুটিপাটি।

ওখানে ওই বালিয়ারির মধ্যে কয়েকটি অল্প বয়সী স্থানীয় মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ সেজেগুজে - ঠোঁটে রঙ মেখে। জানি না কেন, ওদের দেখে মনে হচ্ছিল খুব কষ্টে থাকে ওরা। ওদের মধ্যে সবচাইতে ছোটো যে, সে আমার চাইতে অনেক ছোটো - ফিসফিস করে আমার কাছে চকোলেট চাইল। আমার মাথার হেয়ার ক্লাচটা চাইল। জানলাম ওর নাম কমলি।

জীপ আমাদের রিসর্টে ফেরত আনলে আমরা চললাম ক্যামেল সাফারিতে। উটে চেপে সত্যিকারের থর মরুভূমি দেখতে। উটদের নাম মাইকেল আর বাবলু আর চালক দুজনের নাম আলি এবং সৈফ আলি। ওরাই প্রস্তাব দিল তিনশো টাকা করে বাড়তি দিলে আমাদের "রিয়েল থর" দেখাতে নিয়ে যাবে যেখানে বালি নাকি পাউডারের মত। ওদের প্রস্তাবে রাজী না হলে ভীষণ বোকামি হয়ে যেত। ওরা আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে সত্যি বালিতে পা গোড়ালির ওপর অবধি ডুবে যাচ্ছিল, চরাচরে যেন আমরা ছাড়া কেউ ছিলাম না, সূর্যাস্ত হচ্ছিল; সেই মুহূর্তটা দুর্লভ স্মৃতি হিসেবে চিরকালের জন্য আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। ওপাশে পশ্চিমের লাল আকাশের নীচে সওয়ারিসহ উটের সারি, এপাশে আমরা কজন চুপচাপ, শোঁ শোঁ হাওয়া ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এমনকি মাইকেল আর বাবলুও নিশ্চুপ।

শিবতারা ক্যাম্পে রাতের অভিজ্ঞতা এককথায় রাজসিক। প্রথমতঃ ওরকম বিলাসবহুল তাঁবুতে থাকা, দ্বিতীয়তঃ রাতের প্রমোদ অনুষ্ঠান। ক্যাম্পের চারিদিকে গোল করে তাঁবু খাটানো। মাঝখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গোল প্ল্যাটফর্ম যার ওপর প্রচুর মোটাসোটা গদি আর তাকিয়া - মাঝখানটা খালি। সেখানেই রাজস্থানী লোকগানের তালে জমকালো কাচবসানো রাজস্থানী ঘাগড়া পড়ে দুটি মেয়ে লাগাতার নেচে গেল টানা দু ঘন্টা। কখনো মাথায় পর পর সাতখানা হাঁড়ি চাপিয়ে তো কখনো লকলকে আগুনের পাত্র নিয়ে। সবচাইতে মারাত্মক নাচ হল এইটুকুনি দুটো গেলাসের ওপর দু পা রেখে গোটা শরীর দুলিয়ে নাচ। না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

পরদিন মরুভূমির সূর্যোদয় দেখে জলখাবার খেয়ে ফেরা জয়সলমীর। আসল জায়গা দেখা বাকি যে! সোনার কেল্লা। সোনালী বেলে পাথর (ইয়েলো স্যান্ডস্টোন), যা আমাদের দেশে একমাত্র জয়সলমীরেই পাওয়া যায়, তা দিয়ে তৈরি সোনার কেল্লা। শুধু তা নয় এখানকার ঘরবাড়ি সমস্ত তৈরি ওই পাথরে। কেল্লার ওপর থেকে গোটা জয়সলমীর দেখা যায় - সোনালী জয়সলমীর, দিনের আলোয় ঝলমল করছে। কেল্লার বাইরেটা যত সুন্দর ভেতরটা তত নয় - অন্তত আমাদের মত টুরিষ্টদের জন্য। ভেতর জুড়ে লোকের বসতবাড়ি। এমন কী আমরাও নাকি চাইলে একটা ঘর ভাড়া পেতে পারি কেল্লার ভেতর। তবে রাজস্থানী হস্তশিল্প কেনাকাটার আদর্শ জায়গা এটাই। আমরাও চটজলদি টুকটাক কিনে নিলাম কিছু। কারণ, ফেরার সময় হয়ে গেছে। রাজু সিং আমাদের যোধপুরগামী বাসে চাপিয়ে বিদায় নিল। দিয়ে দিল মোবাইল নম্বর। বিকেল পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম যোধপুর। দিল্লী ফেরার ট্রেন মান্দোর এক্সপ্রেস রাত আটটায়। রিটায়ারিং রুমে বসে মনে হল জয়সলমীর, সোনার কেল্লা, ডেজার্ট সাফারি - এগুলোর কথা নাহয় নেট সার্ফ করলে লোকে জেনে যাবে কিন্তু আমি যে মনে মনে কমলি, রাজু সিং রাঠোর, মহব্বত খান, মাইকেল, বাবলু আলি, সঈফ আলি এদের কথা দিয়ে এসেছি যে ওদের কথা সবাইকে জানাব। সোনায় মোড়া দেশে ওদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের যতটুকু আঁচ পেয়েছি, বুঝেছি ওদের জন্য জয়সলমীর মোটেও সোনায় মোড়া নয়। বিদেশিরা তো আসেই; আমাদের মত দেশি টুরিষ্টরাও ওদের বেঁচে থাকার লড়াই খানিকটা সহজ করে বৈকি। থর মরুভূমির এক মুঠো বালি সঙ্গে নিয়ে এসেছি আর কথা দিয়ে এসেছি মরুভূমিকেও যে তার সঙ্গে মোলাকাতের কথা সবাইকে জানাব। সেই কথা রাখতেই দু ঘন্টার মধ্যে এ লেখা লিখে ফেললাম।

রাজস্থানের তথ্য ~ *রাজস্থানের আরও ছবি*

কলকাতার পাঠভবন স্কুলের কলাবিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শরণ্যা ব্যানার্জীর প্রিয় বিষয় ইতিহাস ও সাহিত্য। সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন ঐতিহাসিক জায়গায়। ভালবাসেন সে জায়গা সম্বন্ধে পাঁচজনকে জানাতেও। কবিতা, গল্প লেখা, ছবি তোলা, আঁকা সবেতেই আছেন শরণ্যা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অথঃ ভুবনেশ্বরকথা

তপন পাল

-১-

এ বারের যাওয়াটা অন্যরকমের। বাবুমশাইরা জানেন, প্রলোভন অতি বিষম বস্তু; অর্জুন মহাকাব্যের উদাত্ত নায়ক, যুদ্ধবীরের চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় সংযমীরূপে। তাঁর বীর্যশুল্কা দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতাকে একক প্রেম ভাগ করে দেওয়ার দায়বদ্ধতার মধ্যেও অর্জুনের জন্য আকুল, মনযোগকাতরা; নচেৎ মহাপ্রস্থানিক পর্বে ঈর্ষাদীর্ণ অসূয়াক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে বলতে শুনতাম না, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাত ছিল - 'পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষণে ধনঞ্জয়ে'। সেই অর্জুনও কিনা অন্যপূর্বা উলূপীর মোহে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্যের পণ ভেঙেছিলেন; তারপর চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা। বিবাহকালে দ্রৌপদীর শর্ত ছিল তিনি সপত্নী নিয়ে ঘর করবেন না। অপরাপর পাণ্ডবপত্নীরা, যথা যুধিষ্ঠিরভার্যা শৈব্যদেবিকা, ভীমজায়া হিড়িম্বা ও কাশীরাজকন্যা বলন্ধরা, নকুল সহধর্মিণী চেদিরাজকন্যা করেণুমতী, সহদেববধূ মদ্ররাজকন্যা বিজয়া - এরা সবাই সন্তানসহ পিতৃগৃহেই থাকতেন। তবু অর্জুন রাখালিনীবেশা সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠিয়েছিলেন 'আমি তোমার দাসী' বলতে। দ্রৌপদীর অভিমান কোথায় গেল! তিনি গলে জল। আর আমি তো 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' একদা এক প্রকাশক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি পুরী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর ধর্মভীরু ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের জন্য ইংরাজিতে একটি ট্রাভেল গাইড প্রকাশের কথা ভাবছেন। ব্যস, আমি লাফিয়ে উঠলাম, মনে মনে দেখে ফেললাম ঝাঁ চকচকে এক পুস্তক, তার পাতায় পাতায় ছবি; ব্যাকপেজে ISBN বারকোড, আর হ্যাঁ, লেখকের ছবি। আমাকে দেখতে ভাল নয় জানি, কিন্তু তাই বলে বইয়ের ব্যাকপেজে লেখকের ছবি থাকবে না তা হয় নাকি! বিপর্যয়ের সেই সূত্রপাত। দেড় বছরকাল দৌড়াদৌড়ি মারামারি মল্লযুদ্ধের পর পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রকাশক মহোদয়কে তা বলতেই তিনি মহাখুশি; ফস করে সত্তর হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। যতই বলি বই প্রকাশ তো আপনার ব্যবসা, আমার তো নয় - তিনি বলেন দূর মশাই এত ইনভেস্টমেন্ট। আমার পিতামহের ব্যবসায় দুর্যোগের পর তিন প্রজন্ম ধরে আমরা মসীজীবী, এখন ব্যবসা করতে গিয়ে আবার ডুবি আর কি! সত্তরের দশকে ছাত্রাবস্থায় যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থরা দাড়ি কামানোর অথবা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে লিটল ম্যাগ প্রকাশে মগ্ন, আমি তখন মগ্ন ছিলাম কালিকার চপে, কফি হাউসের কবিরাজিতে, প্যারামাউন্টের ডাবের শরবতে, পুঁটিরামের লুচিতে...... এখন আমি ঘরের টাকা দিয়ে বই প্রকাশ করতে গেলে তারা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? বার্ষিক পুনর্মিলনের মুখ্য এজেন্ডাই হবে এইটা।
তা যাকগে! না-ই বা হল বই প্রকাশ! কত লোকেরই তো জীবনে কত কিছু হয় না। কিন্তু জ্বালা ছাড়েনা। অনেক গল্পই স্ববিরোধী মনে হয়। তার প্রথমতম ও প্রধানতম সম্রাট অশোক। খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ সালে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। দয়া নদীর নিকটবর্তী ধৌলি পাহাড়ের কাছে মৌর্য ও কলিঙ্গ বাহিনীর মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কলিঙ্গ বাহিনীর ১,৫০,০০০ সেনা ও মৌর্য বাহিনীর ১০,০০০ সেনা নিহত হন। যুদ্ধের বীভৎসতা সম্রাট অশোককে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে এবং তিনি যুদ্ধের পথত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে অহিংসার পথে সাম্রাজ্য পরিচালনের নীতি গ্রহণ করেন। এইরকমটিই শুনে আসছি আমরা শিশুকাল থেকে। কিন্তু তথ্য তো তা বলছে না। কলিঙ্গ যুদ্ধের অনেক আগেই সম্রাট অশোক, মূলত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে মানুষটি সিংহাসনের জন্য তার নিরানব্বইজন সৎভ্রাতাকে হত্যা করতে পারেন, নিজের ভ্রাতা তিষ্যকে হত্যার কলকাঠি নাড়তে পারেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অনাত্মীয়ের রক্তপাত দেখে কেঁদে ককিয়ে মরে যাবেন, এমনটি ভাবা দুষ্কর। সম্রাটের তথাকথিত অনুতাপের অভিজ্ঞানগুলি সবই তাঁর নিজের শিলাস্তম্ভখচিত, এবং সেগুলি ওড়িশা থেকে বহু বহু দূরে, যথা উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের শাহবাজগাড়িতে, উৎকীর্ণ। ওড়িশায় স্থাপিত তাঁর কোনও শিলাস্তম্ভে অনুতাপের লেশমাত্র নেই। সম্রাট অশোকের ধৌলির শিলালিপিটি পাহাড়ের নীচে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত অনুবাদে অনুতাপের চিহ্নমাত্র নেই। উল্টে সম্ভাব্য বিদ্রোহঘোষণাকারীদের প্রতি হুমকিতে ভরপুর। সত্যিই যদি সম্রাট অশোক অনুতাপদগ্ধ হতেন, মোটা বুদ্ধিতে বলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করতেন, করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন ওড়িশার মানুষের কাছে। তা তিনি করেননি; যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিও দেননি। তাই অশোকের অনুতাপ কেমন যেন সাজানো, চিৎকৃত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা বলেই মনে হয়।

বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকবন্দনা আমাদের অতি নির্লজ্জভাবে জানায় কীভাবে অশোক ১৮০০০ আজীবককে শমনসদনে পাঠিয়েছিলেন, কিভাবে বুদ্ধ এক তীর্থঙ্করকে মাথা নীচু করে সম্মান জানাচ্ছেন এরকম একটি ছবি আঁকার জন্য এক জৈনকে তার পরিবারের সকল সদস্যসহ পুড়িয়ে মেরেছিলেন, কিভাবে তিনি প্রতি জৈন ছিন্নশিরের জন্য এক স্বর্ণমুদ্রা ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে ইতিহাসে ভারতে তিনি কোনদিনই মহান রাজার স্বীকৃতি পাননি, তাঁর স্বীকৃতি এসেছে দূরদূরান্তের দেশের বৌদ্ধগ্রন্থগুলি থেকে, যে দেশগুলি কদাচ তাঁর শাসনের ভুক্তভোগী নয়। ইতিহাস কোনদিনই তাঁকে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সাধুবাদ জানায়নি। তাঁর জীবৎকালেই সাম্রাজ্যের ভাঙনের শুরু, খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ সালে, তাঁর মাত্র তিন প্রজন্ম পরেই, যখনও ওড়িশার যৌথ স্মৃতিতে তাঁর অত্যাচার জাগরূক, মহামেঘবাহন বংশের কলিঙ্গরাজ খরভেলা মগধ আক্রমণ করে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করান। অশোকবন্দনাই মৃদুস্বরে আমাদের জানাচ্ছে যে বৃহদ্রথের হত্যা ও তৎপরবর্তী শুঙ্গবংশের উত্থানে হিন্দুরা সুযোগ ও ক্ষমতা পেয়ে কিভাবে বৌদ্ধদের উপরে জমে থাকা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খরভেলা তাঁর বিজয়কাহিনী প্রস্তরে উৎকীর্ণ করান। ১৯৭২ সালে কলিঙ্গ-নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘ ও জাপান বুদ্ধ সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে ভুবনেশ্বরের আট কিলোমিটার দূরে গড়ে ওঠে শান্তিস্তূপ তথা পিস প্যাগোডা। আমার বহুদিনের শখ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় দাঁড়িয়ে ধৌলির শান্তিস্তূপ দেখব, নিজেকে ভাবব বিজয়ী কলিঙ্গরাজ খরভেলা। ভারি মজা হবে। আগে কয়েকবার গিয়ে বৃষ্টি বা কুয়াশায় শখটি পূরিত হয়নি। তাই এবারে গ্রীষ্মে যাওয়া।

ভুবনেশ্বরেই যখন যাব, তাহলে আর রেলগাড়িতে উঠি কেন? সাতই এপ্রিল শনিবার ভোর ভোর শুকতারাকে সাক্ষী রেখে বেরিয়ে পড়া গেল। কলকাতা বিমানবন্দর সাড়ে পাঁচটায়। অত ভোরেও চারিদিকে কত লোকজন, এবং তাঁদের কারোরই চোখেমুখে ঘুমের ছাপ নেই। বিমানপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত লোকজনেদের এই গুণটি আমাকে ভারি আকৃষ্ট করে। নির্বাচন বা বন্যার সময় আমাকেও চাকরির দায়ে রাত জাগতে হয়, কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে থাকে, জামা প্যান্টের ওপরে উঠে যায়, চুল কাকের বাসা। এরা কিন্তু এই সকালেও টিপটপ ছিমছাম। একবার দিল্লি থেকে রাত দুটোর উড়ানে কলকাতায় আসছিলাম। উঠেই ঘুম, রাতদুপুরে বিমানবালা ডেকে তুলে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি। যতই বলি আমি এত রাতে কিছু খাব না, বদহজম হবে, তিনি জোরাজুরি করতে থাকেন। মাঝরাতে তাঁর অধ্যবসায় আমাকে আশ্চর্য করেছিল।

সাতটা কুড়ির ইন্ডিগো, উড়ান সংখ্যা ৬ই ৩৭৫, বিমানপোত এয়ারবাস এ ৩২০ গোত্রের, নিবন্ধন VT IDH, মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের পুরনো। এখন পুরী যাওয়ার জন্য এই উড়ানটিই আমার পছন্দের। বারো ঘণ্টার বেশি রেলগাড়িযাত্রা শেষ কবে করেছি মনে পড়েনা। বিমানযাত্রার প্রধান সুবিধা শান্তি। রেলগাড়ির মত কেউ কানের গোড়ায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোনে কথা বলবে না, কোন সঙ্গীতপ্রেমী নির্বোধ হেডফোন ছাড়া ফোনে গান শুনবে না, সর্বোপরি বাঙালি ভ্রমণার্থীদের মস্ত বড় দল তাদের পারিবারিক গল্প কাহিনি, যথা কবিতাদির ননদের মামাশ্বশুরের ছেলের ইস্টুমিস্টুর উপাখ্যান, শুনতে বাধ্য করবে না। আমাদের ভুবনেশ্বরে নামিয়ে বিমানটি উড়ে যাবেন বোম্বাই, সেখান থেকে কোয়েম্বাটুর। তারপর এই পথেই কলকাতায় ফিরে রাতে দিল্লি গিয়ে তাঁর বিশ্রাম। আমি ও মেঘবালিকা শ্রীমতী পাল সামনের সারিতে। দক্ষিণ দিয়ে উঠে সোজা সাগরদ্বীপ, তারপর কিঞ্চিৎ ডাইনে ঘুরে সমুদ্দুর। আমি বাইরে তাকিয়ে শ্রীমতী পালকে বললাম 'আমরা এখন সমুদ্রের ওপরে।' তিনি মুখঝামটা দিয়ে বললেন 'চুপ কর তো; তুমি যে গাঁজা খাও সবাই জানে।' ইহা সর্বৈব মিথ্যা, ছাত্রাবস্থার পর থেকে আমি কদাচ গাঁজা খাইনি। পিতৃবন্ধুকন্যা বিবাহের অসুবিধা এইই; সেই সুদুর শৈশবে আপনি কী কী অপকর্ম করিয়াছিলেন, কী কী হাস্যকর কথা বলিয়াছিলেন, আপনার সকল অবিমৃষ্যকারিতা বাক্যবাহিত হয়ে শাখায় পত্রে পল্লবিত হতে হতে সহধর্মিণীর কর্ণকুহরগোচর হয়। বুঝলাম ২৩,০০০ ফুট ওপরে তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বেগে আছেন। ভুবনেশ্বর সাতটা পঞ্চাশে; শেষের পনের মিনিট যাত্রা সমুদ্র, জলধারা আর মহানদী দেখতে দেখতে।

গন্তব্য একই থাকে, মানুষের পথটাই শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। নানক, কবি শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ সড়ক ছেড়ে পুরী যেতে মানুষ রেলগাড়ি চড়া ধরল ১৮৯৭তে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও দেখেছি পুরী থেকে পারিবারিক পাণ্ডার সহকারী আমাদের বাড়িতে আসতেন; তাঁকে বলা হত সেথো, সাথীর অপভ্রংশ। মাসখানেক থেকে তিনি বাড়ির প্রৌঢ়া মহিলাকুলকে বাউড়িয়া থেকে পুরী প্যাসেঞ্জারে চাপিয়ে পুরী নিয়ে যেতেন, মাসখানেক রেখে আবার পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতেন। আমার প্রথম পুরীযাত্রা অধুনালুপ্ত হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা একপ্রেসে, ১৯৬৯-এ; খুরদা রোডে গাড়ি বদলিয়ে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরক্ষণ করে রেলগাড়ি চাপতে শিখলাম; সে এক অভিজাত পাওনা। তখন রাতভর রেলগাড়ি চাপতে হলে নিতে হত চাদর, ফুঁ দেওয়া বালিশ, আর মগ। ভারতীয় রেলে জনগনেশভক্ষ্য বাতানূকুল ত্রিশয্যার কামরা চালু হয় ১৯৯২-১৯৯৩ নাগাদ; প্রথমে রাজধানী এক্সপ্রেসে, তারপর অন্যান্য রেলগাড়িতেও। লটবহর বওয়া থেকে মুক্তি পেতেই বাতানূকুল ত্রিধাপের কামরায় চড়া শুরু সেই সময় থেকে। বেশ চলছিল, কিন্তু সেই সুখ কপালে সইল না। ২০০৮-এ লালু মহারাজ সাইড-মিডল বার্থ চালু করেন, এবং ১৮-৬০ বয়ঃসীমার পুরুষ হওয়ার সৌজন্যে আমার কপালে সর্বদাই সাইড-মিডল বার্থ পড়তে থাকে। বাধ্য হয়েই ২০০৮ থেকে বাতানুকুল দ্বিধাপের কামরায় চড়া শুরু। কিন্তু জীবনে সুখ নেই, জানেন তো, বিশেষত আমার মত লোকের কপালে, যার জীবনটাই কচুবনসদৃশ। ভারতীয় রেলে এমত কামরা এত কম যে জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। তাই এখন কোথাও যেতে হলে প্রথমেই বিমান খুঁজি।

উড়োজাহাজ থেকে কোন শহরে নেমে কিছুক্ষণ আমি এক সংশয়ে, দোলাচলে ভুগি; সত্যিই এটা ওই শহর তো! সব শহরেই ঢোকার মুখে কিছু ল্যান্ডমার্ক থাকে। গঙ্গা পেরিয়ে বারাণসী ঢুকতে হয়, কংসাবতী পেরিয়ে মেদিনীপুর, পাগলা পেরিয়ে মালদা, চালতিয়া বিল পেরিয়ে বহরমপুর; তেমনি মহানদী পেরিয়ে ভুবনেশ্বর। উড়োজাহাজে গেলে এই ল্যান্ডমার্ক পেরোবার অনুভূতিটি থাকে না বলে সংশয় রয়েই যায়। দেখছি বটে চারদিকে বড় বড় করে লেখা ভুবনেশ্বর। সত্তরের দশকের শেষদিকে এলিটে Brass Target বলে সোফিয়া লোরেনের একটি সিনেমা দেখেছিলাম। তাতে দেখেছিলাম জার্মান রাইখসব্যাঙ্কের সঞ্চিত সোনা নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টগামী একটি রেলগাড়িকে কিভাবে একই পথে ঘোরানো হয়েছিল মধ্যবর্তী স্টেশনসমূহের নামের বোর্ডে অন্য স্টেশনের নাম লিখে। এখানেও তো কেউ তেমনটি করতে পারে। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বিজু পটনায়েকের বাড়িটি দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। যাক বাবা! ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি। এবারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ভুবনেশ্বর রেলস্টেশনের অতি কাছে, হোটেল রেলভিউতে। তার সমুখ দিয়ে অবিরত রেলগাড়ির আনাগোনা; উচ্চ অশ্বশক্তির হ্রেষাধ্বনি।

আধুনিক ভুবনেশ্বরের স্থাপনা ১৯৪৮-এ, শহরটির স্থপতি Otto Königsberger; কিন্তু মন্দির শহরটি অতিপুরাতন, মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মন্দিররাজি শহরের পথে পথে ছড়ানো। পুরী কোণার্ক ভুবনেশ্বরের সোনালি ত্রিভুজ পূর্ব ভারতের সবচেয়ে কাঙ্খিত ভ্রমণ গন্তব্য। কটক থেকে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হয় ১৯৪৯-এ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বরের কাছেই শিশুপালগড়ে, তখন থেকেই মন্দিরসমূহের গড়ে ওঠা শুরু। পঞ্চদশ শতকে মোগল আর অষ্টাদশ শতকে মারাঠাদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ, তারপর সাতচল্লিশ পেরিয়ে আমরা সবাই রাজা।

স্নান আহার সেরে গাড়ি নিয়ে বেরোনো গেল। বিমানবন্দর থেকে প্রিপেডে যে গাড়িটি নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিলাম, তাকেই বলে দিয়েছিলাম আড়াইটায় আসতে। সারথিটি অতীব ভদ্র, বিমানবন্দর পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে নাগরিক পরিশীলন অর্জন করেছেন - গাড়িতে গান চালান না, গুটখা খান না, খেয়ে দরজা খুলে পিচ করে থুতু ফেলেন না। গাড়িটিও হৃষ্টপুষ্ট, পিছনের আসনের জন্য বাতানূকুল ব্যবস্থা আছে, আছে এয়ারব্যাগও। প্রথম গন্তব্য শিব এবং বিষ্ণুর মিলিত রূপ হরিহরের নামে উৎসর্গীকৃত একাদশ শতকে নির্মিত লিঙ্গরাজ মন্দির। কলিঙ্গ স্থাপত্যের ৫৫ মিটার উঁচু মন্দির; মস্ত চত্বর, অনেক মন্দির; ঘুরতে ভালোই লাগে। এই মন্দিরে আগে বহুবার এসেছি, এবং ভিড় ও পাণ্ডাদের দ্বারা নিপীড়িত নির্যাতিত হয়েছি। কিন্তু এই দ্বিপ্রাহরিক অলসতায় কেউ কোথাও নেই; পাণ্ডারাও তাঁদের 'কিলার ইনস্টিংট' হারিয়েছেন। প্রায় জনহীন মন্দিরচত্বরে আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম, যেন মন্দিরটা আমাদেরই পারিবারিক সম্পত্তি। মন্দিরের লেআউটটি পুরী মন্দিরের অনুরূপ, শুধু শ্রীজগন্নাথের ধ্বজা হলুদের ওপর লাল, আর এনার সাদার ওপর লাল।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্বে নবম শতকের শেষভাগে নির্মিত ব্রহ্মেশ্বর মন্দির। তারপর হালকা লাল ও হলুদ বালুপাথরের রাজারাণী মন্দির। পঞ্চরত্ন শৈলীতে দুটি স্তম্ভের সাথে একটি উত্থাপিত প্ল্যাটফর্মে নির্মিত এই মন্দির কোন নির্দিষ্ট দেব বা দেবীর নয়, প্রেমের। হালকা লাল পাথর রাজাবাবু, হলুদ বালুপাথর রানিমা; দুজনে আসঙ্গে মিলেমিশে আছেন সর্বত্র। মন্দিরটি সযত্নরক্ষিত, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সাজানো বাগান, তারই ফাঁকে ফাঁকে যুগল বিহার। পোড়া আঁখি সেদিকেই যেতে চায় বারেবার। শিবঠাকুরের শহরে বিষ্ণু থাকেন অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে, ত্রয়োদশ শতকের বলরাম সাতমুখী সাপের ফণার ছায়ায়, সুভদ্রা দুই হাতে রত্নপাত্র ও পদ্ম নিয়ে বাম পা আরেকটি রত্নপাত্রের ওপর রেখে, আর কৃষ্ণ চার হাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র নিয়ে রণং দেহি।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রক্ষিত পরশুরামেশ্বর মন্দির সপ্তম ও অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে সংরক্ষিত। দরজার উপর আটটি গ্রহ থাকায় বিশেষজ্ঞরা এর নির্মাণকাল সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বলে মনে করেন কেননা পরবর্তীকালের মন্দিরগুলোতে নয়টি গ্রহের ছবি দেখা যায়। ৪০.২৫ ফুট উঁচু 'বিমান' আর চাতাল নিয়ে এটি পশ্চিমমুখী রেখদেউল ধাঁচের শিবমন্দির, কিন্তু শাক্ত আইকন, যথা সপ্তমাতৃকা (চামুণ্ডা, বরাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, শিবানী এবং ব্রাহ্মী), ষড়ভুজা মহিষমর্দিনী এখানে সগৌরবে রয়েছেন। সঙ্গে আট হাতবিশিষ্ট অর্ধনারীশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য, যম, ময়ূরসহ কার্তিকেয়, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, শিব কর্তৃক রাবণ এর দর্পচূর্ণ, শিবের নটরাজ এবং তাণ্ডবমূর্তি প্রভৃতি। পার্শ্বদেবতা পূর্বে কার্তিকেয়, দক্ষিণে গণেশ। ১৯০৩ সালে ছাদ ও ভিতরের কিছু অংশ সামান্য পরিবর্তন করে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়, তবে এর টিঁকে থাকা বেশিরভাগ অংশই মূল প্রাচীন নির্মাণ। উড়িষ্যার মন্দিরগুলোয় দুটি অংশ থাকে - বিমান এবং জগমোহন। পরশুরামেশ্বর মন্দিরই প্রথম মন্দির যার এই দুটি অংশ রয়েছে; জগমোহনটি সমতল ছাদের। এর আগের মন্দিরগুলোতে জগমোহন অংশটি ছিল না এবং পরবর্তী সময়ের মন্দিরগুলোতে 'নাটমণ্ডপ' এবং 'ভোগমণ্ডপ' নামে দুটি অতিরিক্ত অংশ যুক্ত হতে দেখা যায়। মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, রাজারানি এবং কোনারকের সূর্যমন্দিরের মত উল্লম্ব স্থাপনার প্রাধান্যযুক্ত 'নাগারা' স্থাপত্যে নির্মিত।

পাশেই সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, কেদারগৌরী, ও মুক্তেশ্বর মন্দির। স্বাধীনতার ঈশ্বর; ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর মুক্তা রেখদেউল পিঢ় জগমোহন ধাঁচের মুক্তেশ্বর মন্দির, সাড়ে দশ মিটার উঁচু, সমুখে মঙ্গলতোরণ যা অত্র অঞ্চলের অন্য কোনও মন্দিরে নেই।

এই মন্দিরগুলি ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির। এ ছাড়াও শয়ে শয়ে মন্দির ছড়ানো ভুবনেশ্বরের পথে পথে। শহর ছাড়িয়ে গাছের ছায়ায় চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। এই মন্দির নিয়ে দময়ন্তীদি এই পত্রিকায় প্রামাণ্য লিখেছেন; আমি আর পুনরুক্তি করব না। কাছেই বালাকাতি, এই গ্রামের শিল্পীরা এখনও সাবেকি পদ্ধতিতে কাঁসার বাসন তৈরি করেন। আমার পুত্রের বিবাহের কিছু আনুষ্ঠানিক বাসন এখান থেকে কেনা হয়েছিল। এ যাত্রায় আমাদের গন্তব্য ভুবনেশ্বরের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলে খ্যাত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোকর্ণেশ্বর শিবমন্দির। এটি শিশুপালগড়ে; অখ্যাত। সারথি তো চেনেন না, স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেও কোন লাভ হল না। কিন্তু গুগুলমামা দেখলাম সব জানেন। তাঁর নির্দেশিত পথে, পাকা

রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পুকুরের পাশ দিয়ে কিছুটা গিয়ে, কিছুটা হেঁটে, সেখানে পৌঁছানো গেল। নিরিবিলি মন্দির - তবে দেখা গেল শিবঠাকুরের চেয়ে তাঁর ষাঁড়ের মাহাত্ম্য এখানে বেশি। তাঁর কর্ণ দুটি অতিশয় বৃহৎ - এবং বালিকাদল তাঁর কানে কানে মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপনে ব্যস্ত। একবার তাঁর কানে মনোবাঞ্ছা তুলতে পারলেই হল, তার প্রভু সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেনই। তাই তিনি গোকর্ণেশ্বর।

সেখান থেকে শিশুপালগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এখানেও গুগুলমামার হাত ধরে পৌঁছান গেল। কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই, কোন বোর্ড নেই, নেহাত পাথরে তৈরি বলেই এত ঔদাসীন্য সহ্য করেও অদ্যাবধি টিঁকে আছে। ধাপকাটা সিঁড়ি; টেনেটুনে ওঠা হল। শেষ বিকালে সেখানে দাঁড়িয়ে অকারণ বিষাদে মন ভরে গেল - দুঃখবিলাস ঘাড়ে চেপে বসল। শ্রীমতী পাল উঠলেন না। তিনি সারথির

সঙ্গে গল্প জুড়লেন। সারথিটি চাকদহের ছেলে, জীবিকান্বেষণে ভুবনেশ্বরে ষোল বছর। জন্মসূত্রে জানা, এখন জেনা হয়েছেন; ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সবই ওই নামে। শুনে আশ্চর্য লাগল; চিরকাল জেনে এসেছি জীবিকান্বেষণে অন্য রাজ্যের লোকেরা কলকাতায় আসেন - এনার দেখি উল্টো! তিনি জানালেন কলকাতায় গাড়ি চালাতেন, তবে বাড়িভাড়া দিয়ে পোষাচ্ছিল না। এখন বিমানবন্দরের পার্কিং-এ গাড়ি লাগিয়ে গাড়িতেই রাত্রিবাস; ভোজনং যত্র তত্র - তবে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন।

ধৌলি শান্তিস্তূপে যাইনি। এবারের যাত্রায় মূল উদ্দেশ্য ছিল টিলার নীচে সম্রাট অশোকের শিলা-অনুশাসনটি দেখা। ১৮৩৭ সালে লেফটেন্যান্ট কিটো এটি আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের নীচের দিকের গায়ে দেড়শ বর্গফুট মত জায়গা চেঁচে পালিশ করে তার ওপর অনুশাসনগুলি গভীরভাবে খোদাই করা; বর্তমানে লোহার খাঁচায় সুরক্ষিত। সেটি দেখা জীবনের বড় পাওনা। ইতোপূর্বে বহুবার ধৌলি এলেও এটি স্বচক্ষে দেখা হয়ে ওঠে নি। কিছুটা দূরে বৈরাগ্যেশ্বর শিবমন্দির।

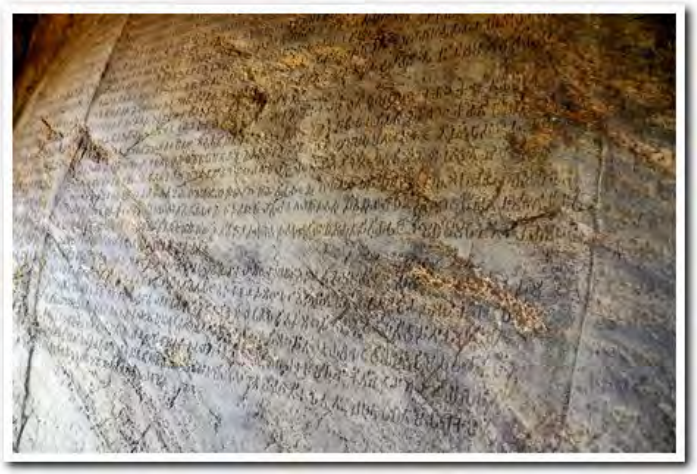

-৩-

দ্বিতীয় দিনটি রাখা ছিল ললিতগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি (জাজপুর), উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর) ও খণ্ডগিরির জন্য। বই লিখছি বলে কথা, একটু গম্ভীর মুখ করে নোটবই নিয়ে মাতব্বরের মত ঘুরে না বেড়ালে লোকে মানবে কেন? সকাল সকাল বেরিয়ে কাথঝোরি, বিরুপা ও মহানদী পেরিয়ে, রেললাইনকে বাঁয়ে রেখে, অনেকখানি পথ গিয়ে, শুঙ্গ বংশের রাজত্বকালের সমসাময়িক বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে অবশেষে সবুজ ছাওয়া পাহাড় ওড়িশার প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ ললিতগিরিতে। আসসিয়া পাহাড়শ্রেণীর পরাভাদি আর লন্দা পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই প্রত্নস্থলটি ওড়িশার প্রাচীনতম বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলির একটি। হীনযান এবং মহাযান দুই ধারারই ধারক এই ললিতগিরি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় এই অঞ্চল ছিল পুষ্পগিরি নামে দশহাজার শ্রমণের এক বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। খননে মিলেছে মূর্তি, ভাস্কর্য, বিশালাকার চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ, ধাতুসামগ্রী, বৌদ্ধচৈত্য, পিলার ও ইটের স্থাপত্য। এখানে পাওয়া প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে।

১৯০৫ সালে জাজপুরের এসডিও এম. এম. চক্রবর্তীসাহেবের চোখে পড়ে গভীর বনের মধ্যে কিছু ভাঙাচোরা পাথরের ভাস্কর্য। ১৯২৮ সালে ভারতীয় জাদুঘরের পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ এখানে এসে নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করেন; ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দলিলে নালতিগিরি জায়গা পায়। ১৯৩৭ সালে সরকার স্থির করেন এই পুরাবশেষটিকে সংরক্ষণ দরকার। ১৯৯৭ এ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিকরা ও পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননে পাওয়া নানা নিদর্শন দেখে পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন এই নালতিগিরিই প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখিত ললিতগিরির বৌদ্ধবিহার - প্রাচীনতম বৌদ্ধসংস্কৃতির নিদর্শন এক পীঠ। ললিতগিরিতে চারটি মনাস্ট্রি , স্তুপ, আরও অনেক কিছু। পাশে নদীখাত; এখন জল নেই। নদীতে নামার পথে একজায়গায় দুটি স্তম্ভ, দেখে মনে হয় সেকালে দূরদূরান্ত থেকে শ্রমণ আশ্রমিক ভিক্ষুরা নদীপথে আসতেন। স্তুপটি সুবিশাল, পাহাড়শীর্ষে একান্তে - সেখান থেকে অনেক দূর অবধি দৃশ্যমান। হিউয়েন সাংও সম্ভবত আমার মতই এখানে দাঁড়িয়ে দূরের

ধারণা চারিপাশের সুবিস্তৃত অরণ্যানীর গর্ভে লুকিয়ে আছে আরও অনেক কিছু।

অরণ্যানী দেখেছিলেন। এই স্তূপটির গভীরে একটি পাথরের বাক্স পাওয়া গিয়েছিল, তার ভিতরে একটি পাথরের কৌটো। তার ভিতর প্রথমে রুপোর ও তারও ভিতরে একটি সোনার কৌটোর ভিতরে ছিলো শাক্যমুনি বুদ্ধের দেহাস্থি। পূর্বমুখী উপবৃত্তাকার চৈত্যগৃহ ইটের নির্মাণ; কেন্দ্রে একটি বৃত্তাকার স্তূপ। তার উপর কুষাণ ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত শিলালেখ; সম্ভবত গুপ্তযুগের।

বিপর্যস্ত হাঁটু নিয়ে শ্রীমতী পাল বেশিদূর যেতে পারেননি। গাছের ছায়ায় এক বেঞ্চিতে তাঁকে বসিয়ে আমি ঘুরতে বেরলাম। ঘন্টা দেড়েক বাদে ফিরে তাঁকে আর কোথাও পাইনা - কী গেরো! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পাওয়া গেল বাইরে, টিকিটঘরের সামনে। তুমি উঠে এলে কেন? জবাবে তিনি যা বললেন শুনে আমার চিত্তির। এক যুগলের আশরীর আশ্লেষের দৃশ্যে তিনি এতটাই বিপর্যস্ত বোধ করেছেন যে বসে থাকতে পারেননি। এদিকে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে দুই রক্ষী এসে উপস্থিত। সব শুনে তারা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পরিশেষে বিদ্যাসুন্দরের বন্দীদশা, রাজসভায় আনয়ন ও সুন্দরের শূলদন্ড।

সেখান থেকে উদয়গিরি; তবে উদয়গিরি নামটি বড় বিভ্রান্তিকর। লোকে উদয়গিরি বলতেই বোঝে ভুবনেশ্বরে জনপদ মধ্যবর্তী গুহারাজি; জৈন মুনিদের একদা উপাসনাস্থল। এই উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের নব্বই কিলোমিটার উত্তরপূর্বে, জাজপুর জেলায়; উড়িষ্যার বৃহত্তম বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র; একদার পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ক্যাম্পাস। অদ্যাবধি ততটা জনপ্রিয় নয় বলে রক্ষে, নচেৎ এখানে হয়ত ললিতগিরির পুনরাবৃত্তি দেখতে হত। দুটি উৎখননস্থলে কাজ চলছে, বেরিয়েছে চৈত্যগৃহ ও মহাস্তুপ, অগণন votive স্তুপ, মূর্তি, ভাস্কর্য। পণ্ডিতদের

সেখান থেকে কেলুয়া নদীর তীরে বৌদ্ধ পীঠস্থান রত্নগিরি। জনবসতি থেকে দূরে, পাহাড় আর নদী আর অরণ্যানীর সান্নিধ্যে ভিক্ষু ও শ্রমণদের জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র; ষাটের দশকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননে আলোকিত। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজাদের সময়কালে বিশেষত নরসিংহ গুপ্তের সময়ে উন্নতির চরম সীমায় ওঠে হীনযানপন্থী এই বৌদ্ধকেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ কথিত পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল এই রত্নগিরিতে। ১৯৭০ সালে পাহাড়ের চূড়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপ ও সপ্তম শতকের কারুকার্যমণ্ডিত বৌদ্ধগুম্ফা। পাওয়া গেছে ভিক্ষুদের আবাস, অসংখ্য ছোট আকারের স্তূপ, নানান ভাস্কর্যের নিদর্শন, তিন শতাধিক বুদ্ধমস্তক আর বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। পঞ্চম শতকের রত্নগিরির চৌহদ্দির মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ষোড়শ শতকের মহাকাল মন্দির; বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষীয়মাণতার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। খননে মেলা প্রত্নসম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে অসাধারণ একটি মিউজিয়াম। কাছেই তারাপুরে সম্রাট অশোকের স্তূপ।

প্রত্যাবর্তন ভুবনেশ্বরে - উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। কিছুটা প্রাকৃতিক, বাকিটা মনুষ্যসৃষ্ট এই গুহাগুলির গুরুত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত এই গুহাগুলি জৈন সাধুদের বাইরের জগত থেকে নিজেদের দূরে রেখে নিজেদের মধ্যে সেই পরম সত্যকে খোঁজার আস্তানা। সাধুবাবাদের থাকার গুহাগুলি এত নীচু যে ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। ঘরগুলির প্রবেশ বারান্দা বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, সত্যকে খোঁজার শুরু সেইখান থেকে। গুহাগাত্রে রাজসভা, রাজশোভাযাত্রা, রাজশিকারের চিত্র উৎকীর্ণ। ঠিক কতটুকু নিষ্ঠা থাকলে একজন আত্মবঞ্চিত আত্ম-উপলব্ধির জন্য নিরাভরণ নিজেকে এমন জায়গায় আবদ্ধ রাখতে পারেন তা আমার অজানা। উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির গুহাগুলি পাশাপাশি দুই পাহাড়ের গায়ে, উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে আচমকা মাথা তুলেছে দুই পাহাড়; উচ্চতা যথাক্রমে ৩৪ মিটার ও ৩৮ মিটার; পাহাড়হাথিগুম্ফা শিলালিপিতে এরাই কুমারী পর্বত। মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে জাতীয় সড়ক। উদয়গিরি পাহাড়ে ১৮ টি এবং খণ্ডগিরি পাহাড়ে ১৫ টি গুহা আছে। উদয়গিরিতে -

১) রানিগুম্ফা - দোতলা। আশ্রমিকদের থাকার জন্য ব্যবহৃত।
২) বাজাহারাগুম্ফা - তার সম্মুখে দুই অতিকায় স্তম্ভ।
৩) ছোট হাতীগুম্ফা - প্রবেশপথের দুধারে হাতির কারুকার্য।
৪)অলকাপুরীগুম্ফা - দোতলা, ভাস্কর্য বহুল।
৫) জয়-বিজয়গুম্ফা - দোতলা, মনুষ্যসৃষ্ট
৬) পানাসগুম্ফা - দুই স্তম্ভের অতি সাধারণ গুহা
৭) ঠাকুরানিগুম্ফা - দোতলা, পাথর কেটে তৈরি। দেয়ালে উড়ন্ত প্রাণীদের ছবি।
৮) পাতালপুরীগুম্ফা - বারান্দায় দুই স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় উড়ন্ত প্রাণীদের ছবি। সাদামাটা পাথর কাটা গুহা।
৯) মঞ্চপুরীগুম্ফা - দোতলা গুহা। নিচের তলায় চারটে স্তম্ভ। ভাস্কর্য ও ছবি।
১০) গণেশগুম্ফা - প্রস্তর ভাস্কর্যের জন্য খ্যাত।
১১) জাম্বেশভরাগুম্ফা - দুই দরজার নিচু ছাদের গুহা।
১২) ব্যাঘ্রগুম্ফা - ছোট্ট গুহা মন্দির।
১৩) সর্পগুম্ফা - অপ্রথাগত ছোট্ট গুহা, প্রবেশপথের উপর ভাস্কর্য।
১৪) হাতীগুম্ফা - HathiGumpha inscription রাজা খরভেলার রাজত্বের ছবির জন্য খ্যাত। অষ্টম-নবম শতকের হরফে উৎকীর্ণ ভৌমরাজবংশের শান্তিকরদেবের সময়কার একটি লেখ আছে।
১৫)ধ্যানহারাগুম্ফা - দুই অতিকায় স্তম্ভের গুহা
১৬)হরিদাসগুম্ফা - এক স্তম্ভের বারান্দা, গুহা
১৭)জগন্নাথগুম্ফা - পাথর কাটা গুহা
১৮) রোসাইগুম্ফা - এক দরজার গুহা

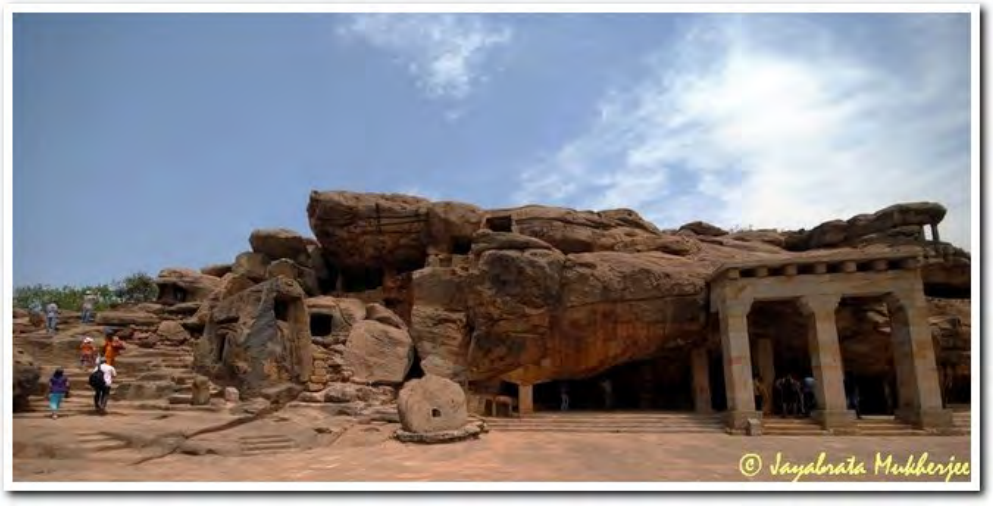

এর মধ্যে রানিগুম্ফা, হাতিগুম্ফা ও গণেশগুম্ফা তাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ভাস্কর্য ও উৎকীর্ণ চিত্রের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজা খরভেলার শিলালিপি ছাড়াও কিছু ব্রাহ্মী শিলালেখ এখানে ওখানে ছড়িয়ে। জগন্নাথগুম্ফার সামনে থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বড় রাস্তায় এসে কিছুটা হেঁটেই বাঁয়ে ঘুরে খণ্ডগিরি পাহাড়। এখানকার অনেকগুলি জৈন গুহা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকোপে হিন্দু পীঠস্থানে পর্যবসিত।
খণ্ডগিরির গুহা -
১)তাতোয়াগুম্ফা-১ - প্রবেশ খিলানে টিয়া পাখির ছবি, দুয়ারে দ্বারপাল, জমজমাট দেয়ালচিত্র
২) তাতোয়াগুম্ফা-২ - সুসজ্জিত বারান্দা
৩)অনন্তগুম্ফা - নারী, হাতি, খেলোয়াড় আর পুষ্পমুখে হংসীর দল।
৪)তেন্তুলিগুম্ফা - পাথর কাটা ছোট গুহা, বারান্দায় একটি স্তম্ভ
৫)খন্ডগিরিগুম্ফা - দোতলা, পাথর কাটা
৬)ধ্যানগুম্ফা - পাথর কাটা
৭)নবমুনীগুম্ফা - পাথর কাটা। পিছনের দেয়ালে উৎকীর্ণ তীর্থঙ্কর, গণেশ আর সসন দেবী।
৮)বড়ভূজিগুম্ফা - তীর্থঙ্কর আর সসন দেবী।
৯)ত্রিশূলগুম্ফা
১০)আম্বিকাগুম্ফা
১১)ললাটেন্দুকেশরীগুম্ফা - মহাবীর, পার্শ্বনাথ আর তীর্থঙ্কর
১২)নামহীন
১২)নামহীন - প্রায় ঝুলন্ত, দেখে মনে হল কোন স্তম্ভ ভেঙে গেছে।
১৩)একাদশীগুম্ফা
১৪)নামহীন
পাহাড়ের মাথায় অষ্টাদশ শতকের প্রভু ঋষভনাথের মন্দির, খুব সম্ভবত আরও পুরাতন কোনও মন্দিরের ওপর গড়ে ওঠা। এখান থেকে ভুবনেশ্বর শহরের দৃশ্য অতি মনোরম।
দিনশেষে ক্লান্ত পদক্ষেপে হোটেলে।

-৪-

তৃতীয় দিন নির্গমন সকাল সাতটায়। চর্চক অন্তরঙ্গ রাস্তায় অমরেশ্বর মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে এক কিলোমিটার গিয়ে প্রাচী নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম চৌরাশিতে রয়েছে দশম শতকের পঁচিশ ফুট উঁচু অলঙ্কৃত দেউল মন্দির খখর ধাঁচের, তান্ত্রিক দেবী স্থূলোদরা বরাহিমাতার। সপ্তমাতৃকা বা চামুণ্ডার মন্দির উড়িষ্যায় অনেক, কিন্তু সপ্তমাতৃকার অন্যতমা বরাহিমাতার পৃথক মন্দির খুব একটা নেই। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংরক্ষিত মন্দিরটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে, চারিদিকে শান্ত সমাহিত উদ্যান, পুরো চত্বরে কেয়ারটেকার আর আমরা ছাড়া কেউ নেই। ঈশ্বরের নাম করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিছুটা দূরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

কাকতপুরের মা মঙ্গলা মন্দির সাবেকি কলিঙ্গ ধাঁচের, এবং অতিবিখ্যাত। সোমবার বলে ফাঁকা, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখা গেল; যদিও এই মন্দিরে ইতোপূর্বে অনেকবার এসেছি। মা মঙ্গলা প্রত্যহ ব্রহ্মান্ড পরিক্রমান্তে এই মন্দিরের প্রস্তরাসনে বিশ্রাম নেন বলে বিশ্বাস। গর্ভগৃহে ঢোকার মুখে বাঁদিকে প্রস্তরাসনটি দেখলে সেই বিশ্বাস প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়, ক্ষয়া প্রস্তরাসনটি দেখলে মনে হয় সত্যিই কেউ বুঝি যুগযুগান্ত ধরে প্রতিরাতে সেখানে বাঁ পা মুড়ে ডান পা ঝুলিয়ে বসছেন। প্রাচী নদীর শান্ত গভীর জলে মা মঙ্গলা বহুদিন সুপ্ত ছিলেন। একদিন হল কী এক মাঝি উপসাগরীয় প্রবল নিম্নচাপের মাঝে সেই নদীতে, নৌকা প্রায় ডোবে ডোবে; মা তাকে বাঁচালেন, আর বললেন, দেখ বাবা, তুই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা কর। মাঝি দেখলেন একটি কাক নদীর জলে ঝাঁপ দিল। ঠিক সেইখান থেকেই উদ্ধার হল দেবীমূর্তি। সেই থেকে কাক-আটক-পুর অর্থাৎ কাকতপুর। ১৫৪৮ সালে স্থানীয় জমিদারবাবু রায়চূড়ামণি পঞ্চানন মিত্র সেবাইত ব্যবস্থাপনা সহ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।
বার থেকে উনিশ বছর পর পর, আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা পড়লে জগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতা-ভগিনীর নবকলেবর অর্থাৎ নতুন মূর্তি হয়। নবকলেবরের সময় উপস্থিত হলে দেবী মঙ্গলার মন্দিরের মুখ্য দইতাপতি নৃসিংহ মন্ত্র ও স্বপ্নাবতী মন্ত্র জপ করেন। তারপর তাঁরা স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন নতুন মূর্তি তৈরির জন্য নিমগাছ (দারুব্রহ্ম) কোথায় পাওয়া যাবে। মন্দিরটি বিস্তৃত। মূল বিগ্রহের মন্দিরের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি মন্দির। নানাবিধ মাতৃমূর্তির দেওয়াল চিত্র, তন্মধ্যে আমাদের দুর্গা ও কালী বিরাজমানা। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার এখানে ঝামুযাত্রা উৎসব হয়। ভক্তরা প্রাচী নদী থেকে জল তুলে মন্দিরে এনে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটেন।

পির জাহানিয়া সাহেবের মাজারে উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষজন যাতায়াত করেন, কার্তিক পূর্ণিমায় উৎসব হয়। বিগত চার শতক ধরে ইতিহাস, কল্পনা, লোকবিশ্বাস আর কিম্বদন্তী এখানে মিলেমিশে একাকার। হজরত মাকমুদ জাহানিয়া জঙ্গস্ত আলি আরবদেশ থেকে এক বালককে নিয়ে জলপথে এক অজানা স্থানে পৌঁছলেন। তৎকালীন শাসক মারাঠা বর্গিরা তাকে ভাল চোখে দেখল না, ভাবল আর এক মুসলমান আগ্রাসনের তিনি অগ্রদূত। জমি না পেয়ে গভীর সমুদ্রে তাঁর জাহাজেই থাকতে লাগলেন। একদিন সেই বালক গ্রামে এসে জানাল যে পির সাহেব প্রয়াত হয়েছেন, তাঁকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে। সে তাঁর মাজার নির্মাণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কিছু সামগ্রী নিয়ে এসেছে। এইভাবেই এই উপাসনাস্থলের সূচনা।

কোণার্ক সূর্যমন্দির অতিখ্যাত, মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে এর চাকার সামনে একটি ছবি না তুললে বাঙালির দাম্পত্য পূর্ণতা পায়না। তাই এর সম্বন্ধে খুব বেশি কথা না বললেও চলবে। প্রখর রৌদ্র আর দলবদ্ধ বাঙালি পর্যটকদের ভিড় দেখে শ্রীমতী পাল ঘুরতে রাজি হলেন না; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ প্রকাশিত দেবলা মিত্রের কোণার্ক বইটি নিয়ে গিয়ে বসলেন মিউজিয়মে। আমি একা একা এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখলাম। ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব গঙ্গ রাজবংশের প্রথম নরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্সটি একটি বিশাল রথের আকৃতিতে। ইউরোপীয় নাবিকরা এটিকে বলতো ব্ল্যাক প্যাগোডা, বিপরীতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি হোয়াইট প্যাগোডা। উভয় মন্দিরই নাবিকদের দিগদর্শনের কাজ করত।

আমরা যারা কালকূটের শাম্ব পড়েছি তারা জানি, ইনি কৃষ্ণ এবং তাঁর এক মহিষী জাম্ববতীর পুত্র; দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বামী, এবং অতি সুপুরুষ। একদা কৃষ্ণ রৈবতক পর্বতের গভীরে তাঁর প্রমোদকাননে মহিষীগণ ও ষোলহাজার রমণীর সঙ্গে জলকেলিতে মগ্ন ছিলেন। তাই দেখে দেবর্ষি নারদের অন্তর জ্বলে গেল, তিনি শাম্বকে বললেন কৃষ্ণ তাঁর প্রমোদ উদ্যানে শাম্বকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলেন; কৃষ্ণ শাম্বকে দেখে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণ তখন প্রৌঢ়ত্বে, তাঁর রমণীকুল সুপুরুষ যুবক শাম্বকে দেখে উল্লসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁরা শাম্বের

প্রতি আসক্তি বোধ করলেন। কৃষ্ণ ক্রোধে ও গ্লানিতে তাঁর রমণীদের শাপ দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা তস্কর দ্বারা লাঞ্ছিত হবে; আর শাম্বকে অভিসম্পাত করলেন যে শাম্ব কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হবে। ভাল! এমন বাপ হলে ছেলের জীবনে দুঃখ তো অনিবার্য। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতীরে অর্কক্ষেত্রে গিয়ে সূর্যের আরাধনা করে আরোগ্যলাভ করলেন। কোণার্ক সূর্যমন্দিরই নাকি শাম্বের প্রতিষ্ঠিত সেই সূর্যমন্দির। আজও তাকে ঘিরে কুষ্ঠরোগীদের ভিড়। ডিম আগে না মুরগি আগের দ্বন্দ্ব যায় না। অনেক আগে থেকেই এখানে কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশ ছিল; আর তাকে ঘিরেই গল্পটি ছড়িয়েছে, নাকি শাম্বর আরোগ্যলাভের পর সারা ভারত থেকে কুষ্ঠরোগীরা এখানে আসতে লেগেছেন! কে জানে!

গৌড় বাদশাহের ফৌজদার জ্ঞানচাঁদ রায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর ভদ্রাসন রাজশাহীর বীরজাওন গ্রামে। তাঁর পুত্র শ্রীমান রাজীবলোচন গৌড়ের শাসক সুলায়মান খান কররানীর কন্যা দুলারির প্রেমে হাবুডুবু। ব্যস! রাজকন্যা তো মিললই; সঙ্গে মিলল প্রধান সেনাপতির পদ। যবনকন্যা বিবাহের দায়ে বর্ণহিন্দু সমাজের প্রত্যাখ্যানের পর তিনিই কালাপাহাড়। কোণার্ক সূর্যমন্দিরের দধিনৌটি অর্থাৎ মূল ভররক্ষাকারী প্রস্তরখণ্ড উৎপাটিত করে ১৫০৮ সালে মন্দিরটির বারোটা তিনিই বাজান। আমাদের কাছে কালাপাহাড় ফিলিস্তিনিজমেরই অন্য নাম; সম্বলপুরে মহানদীর তীরে সম্বলেশ্বর কলেজ বিল্ডিং এর পাশে আমবাগানের ভিতরে তার সমাধি ২০০৬ সালে জনরোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশে তিনি নায়কপ্রতিম, বুৎপরস্তি (পৌত্তলিকতা) র বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী, মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী, বাংলার স্বাধীনতাকামী, মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা। ।

১৬২৬ সালে খুরদার তৎকালীন রাজা পুরুষোত্তমদেবের পুত্র নরশিমাদেব সূর্যদেবের বিগ্রহটি এবং নবগ্রহ পথ নামে একটি বিশাল প্রস্তরখন্ড পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে যান। মারাঠারা কোণার্ক মন্দির থেকে অনেক ভাস্কর্য ও প্রস্তরখন্ড পুরীতে নিয়ে যায়। ১৭৭৯ সালে অরুণস্তম্ভ কোণার্ক থেকে নিয়ে গিয়ে পুরীর সিংহদ্বারের সামনে স্থাপন করা হয়। মারাঠা প্রশাসন কোণার্কের নাটমন্ডপটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে ভেঙে দেয়। দস্যুবৃত্তি করতে অসুবিধা হওয়ার জন্য পর্তুগীজ জলদস্যুরা কোণার্ক মন্দিরের মাথায় অবস্থিত অতি শক্তিশালী চুম্বকটি নষ্ট করে দেয়। পূজা ও আরতি বন্ধ হয়ে যায়। আঠারশো শতক নাগাদ কোণার্ক মন্দির তার সকল গৌরব হারিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় বালির নীচে চাপা পড়ে যায়।
কাছাকাছি নবগ্রহ মন্দির। সূর্যমন্দিরের জগমোহনে মূল দরজার ওপরে একটি মস্ত পাথরে নবগ্রহ উৎকীর্ণ ছিল। ঊনবিংশ শতকে সেটি যখন পড়োপড়ো, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি সরকারকে বলেন সেটিকে কলকাতায় এনে যাদুঘরে রাখার জন্য। তদনুযায়ী সূর্যমন্দির থেকে সৈকত ট্রামলাইন বসানো হয়, পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে জলপথে ১৯'১০" X ৪' ৯" X ৩'৯" আকারের ২৬.২৭ টন ওজনের ক্লোরাইট পাথরটিকে কলকাতায় আনা হবে। কিন্তু ২০০ ফুট ট্রামলাইন পাতা হতে না হতেই বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হয়ে যায়। নবগ্রহের আর কলকাতায় আসা হয় না, মন্দিরের কিছুটা দূরে তিনি এখন পূজা পাচ্ছেন। পুরাতাত্বিক যাদুঘরের সংগ্রহটি দেখার মত। সৈকতের পাশেই জয়দেব পার্ক। গীতগোবিন্দের জয়দেবকে নিয়ে বাংলা-ওড়িশার দ্বন্দ্ব অনেকদিনের। সূর্যমন্দিরের দক্ষিণে ওঁ মঠে নিরাকার ব্রহ্ম পূজিত হন। বৌদ্ধধর্মের চিরায়ত শূণ্যতার ধারণার সঙ্গে এই শূণ্যসাধনা বেশ খাপ খেয়ে যায় দেখে ভারী মজা লাগল। স্থানীয় জনবিশ্বাসে এটি শাম্ব-আশ্রম। ধুনিকুণ্ড জ্বলছে সেই শাম্বর সময় থেকে। চন্দ্রভাগা সৈকত শাম্বের স্মৃতি বিজড়িত, অতি পবিত্র। সব ক্ষয় এখানে নিবারিত হয়। সুমান্যু মুনির কন্যা চন্দ্রভগার প্রতি সূর্য দুর্ব্যবহার করেছিলেন; লজ্জায় চন্দ্রভগা নদী হয়ে যান। মুনির অভিশাপে সূর্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। ক্ষমা চাইলে মুনি তাকে ক্ষমা করেন, আর রোগমুক্তির নিদান দেন প্রতিদিন চন্দ্রভাগা নদীর মোহনায় স্নান। সেই থেকে রোজ বিকালের ক্ষয়িষ্ণু সূর্য পরদিন সকালে পূর্ণমহিমায় উদ্ভাসিত হন চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করে। মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে মস্ত মেলা হয়, অনেক পুণ্যার্থী আসেন। কিছুটা গিয়ে ঈশানেশ্বর মন্দির। শিব, কিন্তু তিনি শাম্বের সখা। সমুদ্রে স্নানান্তে দুই বন্ধু নাকি ভিজে কাপড়ে এতখানি পথ হেঁটে আসতেন গল্প করতে করতে। সৈকতে দেখা মিলল একটি অঙ্গুরি সাপের (Annulated Sea Snake; Hydrophis cyanocinctus) দেহের। এটি মূলত সামুদ্রিক সাপ, উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়া তাই এদের দেখাই যায়না, আমিও আগে দেখিনি। এই সুযোগে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া গেল। লম্বায় সাড়ে চার পাঁচ ফুট, খশখশে আঁশ, ছোট মাথা, চ্যাপটা লেজ যা সামুদ্রিক সাপেদের বৈশিষ্ট্য, রং সবজেটে, তার উপর কালো চাকা চাকা দাগ; তবে বই পড়ে জানা আছে এরা রং বদলায়; এবং বিষধর।

পিপিলির খ্যাতি তার পিপলি অ্যাপলিক কাজের জন্য। জগন্নাথদেব, দেবী সুভদ্রা এবং বলভদ্রদেবের পোষাক-আশাক, অলংকার এবং মন্দিরের নানাবিধ সাজসজ্জা, রথযাত্রা উৎসবের প্রয়োজনীয় চাঁদোয়া এবং বালিশ তৈরি করতে এর উদ্ভব, এখন নানাবিধ গৃহসজ্জার সামগ্রীতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। পুরীর মহারাজা বিরাকিশোর দেব ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাপলিক কারিগরি সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে পিপলি গ্রামের দর্জি সম্প্রদায়ের শ্রী জগন্নাথ মহাপাত্র, শ্রী বনমালী মহাপাত্র প্রমুখদের পুরী জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হিসাবে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথ মন্দিরের এই দর্জিগোষ্ঠিভুক্ত

সেবকদের নিযুক্তি ছিল বংশানুক্রমিক। ফলতঃ অ্যাপলিক কারিগরি এবং উৎপাদন বংশপরম্পরায় চলে এসেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অ্যাপলিক কারিগরি পিপলি অ্যাপলিক নামে পরিচিতি পেয়েছে। পিপলির কাছেই, রাস্তার উপরেই দণ্ড মুকুন্দপুর গ্রাম; খুরদার প্রাক্তন মহারাজা শ্রী মুকুন্দদেবের নামে। গ্রামের ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এখানকার বার্ষিক আতসবাজি প্রদর্শনীটি অতিখ্যাত। শ্রী জগন্নাথের মুসলমান ভক্ত দাসিয়া পেশায় ছিলেন তাঁতি। তার জন্মস্থান, এবং সেই সূত্রে তীর্থস্থান; আর একশো বছরের পুরাতন গোপাই মন্দির।

কুশভদ্রা নদীর মোহনায় দেবী রামচণ্ডীর মন্দির। এই দেবী জগন্নাথদেবের অন্যতমা রক্ষয়িত্রী, কোণার্ক মন্দিরের মালকিন, এবং ওড়িশার অষ্টচণ্ডীর (বিমলা, বসেলি, রাম, বরাহি, অলমচণ্ডী, দক্ষিণাচণ্ডী, হরচণ্ডী ও ঝড়েশ্বরী) মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাক্ষিণ্যময়ী। এই অষ্টচণ্ডী আমাদের পূজায় উচ্চারিত এতে গন্ধে পুষ্পে ষোড়শমাতৃকায় নম র ষোড়শমাতৃকা (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা , শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা) থেকে ভিন্ন। কোণার্কের মূল মন্দিরের দধিনৌটি (ভর প্রস্তর) নামিয়ে মন্দিরটিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করার পর সাত কিলোমিটার দূরের কুশভদ্রা নদীর মোহনায় এক মন্দিরে এসে তৃষ্ণার্ত কালাপাহাড় দেখলেন কেউ কোথাও নেই, শুধু এক মালুনি (মালিনী/ পরিচারিকা) কলসি নিয়ে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে। 'বসো গো, জল এনে তোমাকে দিচ্ছি' বলে মালুনি চলে গেলেন। কালাপাহাড় বসে; মালুনি আর ফেরেই না। ধৈর্য্যচ্যুতি কাটিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে কালাপাহাড় দেখলেন সিংহাসন শূণ্য। তার রাগ গিয়ে পড়লো ওই মালুনির উপর, সেইই তো দেবীমূর্তি নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? নদীতীরে গিয়ে দেখলেন মাঝনদীতে ঐ মালুনি ভাসমানা। তখনই নদীতে বান এল - কালাপাহাড়ের আর মাঝনদীতে যাওয়া হয়ে উঠলো না। পরবর্তীকালে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেন। পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ রোড তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত (১৯৮১) মন্দিরটি পর্যটকদের কাছে অগম্য ছিল। এবং আশ্চর্য এই যে ১৯৯১ এর সুপার সাইক্লোন বা ২০১৩র সাইক্লোন ফেইলিং এও সমুদ্র তীরবর্তী এই মন্দিরের কোন ক্ষতি হয় নি। সমুদ্র এখানে শান্ত সমাহিত, গাঢ় নীল। তার পরে উপুড় করা বাটির মত আকাশ।

পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ থেকে দক্ষিণে বেঁকে ক্যাসুরিনা লাঞ্ছিত অনেকখানি পথ গিয়ে নুয়ানাই নদীর মোহনায় বেলেশ্বর শিবমন্দির। দেখা গেল মন্দিরটির আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে, রাস্তার ওপরে তোরণ, গাড়ি রাখার জন্য পারকিং লট, সৈকত পর্যন্ত গাড়ি চলার উপযুক্ত রাস্তা। ঢালু রাস্তা গিয়ে শেষ হল সৈকতের গার্ডওয়ালে; জল অনেকটা দূরে। দূরবীনে দেখা গেল চারজন, তিনটি ভারতীয় তরুণ ও এক গৌরী বিদেশিনী; সবার পরনে জিনস এবং উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, জলকেলিরত। তাই দেখে শ্রীমতী পাল আমাকে আর গাড়ি থেকে নামতে দিলেন না। কী আর করি, মুঠিফোনে পিন্টু ভট্টাচার্যের একদা জনপ্রিয় 'তুমি নির্জন উপকূলে নায়িকার মতো পথ চলতে গিয়ে, কিছু বলতে গিয়ে ঢেকে মিষ্টি দু'চোখ হলে লজ্জানত' শুনতে শুনতে এসে পড়ল শিল্পগ্রাম রঘুরাজপুর। পটচিত্র আর তালপত্রচিত্রের জন্য তার খ্যাতি। স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের জ্বর হয়, তার পরপরই রথযাত্রার সময় তাঁরা মাসির বাড়ি যান। তখন দীর্ঘ সময় মন্দিরে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় ভক্তদের দর্শনের জন্যে জগন্নাথদেবের পরিধেয় বস্ত্রের ওপর তাঁদের তিন ভাই বোনের ছবি আঁকার প্রচলন হয়, কালক্রমে যা পটচিত্র নামে বিখ্যাত হয়। পটচিত্রে বিষয়ের অন্ত নেই - রামায়ণ বা মহাভারতের উপাখ্যান, রাসলীলা, দশাবতার, মথুরা বিজয়, রাধামোহন, গোপীনাথ, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, গৌরাঙ্গ, গণেশ বন্দনা, দুর্গা, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম কাহিনী, কালীয় দমন, হাতি, ঘোড়া, পাখি... সবই ঠাঁই পায় পটচিত্রে। প্রতিতুলনায় তালপত্রচিত্রের প্রতিপাদ্য একমেবদ্বিতীয়ম শ্রীজগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতা ভগিনী। পটচিত্রের ক্যানভাস তৈরি হয় তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করা রসের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে তাই দিয়ে দুটি সুতির কাপড়কে একসাথে জোড়া দিয়ে, সাদা চকের গুঁড়ো ছিটিয়ে। এই ক্যানভাসে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে ছবি আঁকার কাজ হয়। ছবি আঁকার রং প্রাকৃতিক - সাদার জন্য শাঁখের গুঁড়ো, কালোর জন্য ভুসো কালি, অন্য বিভিন্ন রঙের জন্য নির্ভর করা হয় বিভিন্ন রঙের পাথর, ফুল, গাছের পাতা। তালপত্রচিত্রে তালপাতার ওপর লোহার সূচ দিয়ে খোদাই করে নক্সা ফোটানো হয়। বিখ্যাত ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রর জন্মস্থান এই গ্রামটিতে একশ কুড়িটি মতো পরিবার বাস করে। সবাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। যে কোনো বাড়িতে ঢুকলেই পটচিত্রের সম্ভার চোখে পড়ে। গোতিপুয়া নাচের পীঠস্থান এই রঘুরাজপুর।

শহরের উপকণ্ঠে, জাতীয় সড়কের ওপরে ত্রয়োদশ শতকের বটমঙ্গলা মন্দিরটি আমার বড় প্রিয়। আদিপিতা ব্রহ্মা একবার নাকি বিপুল শূন্যতার মাঝে ঘোর অন্ধকারে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তখন মা মঙ্গলা তাকে হাত ধরে শ্রীজগন্নাথের কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ওড়িয়া ভাষায় বট শব্দের অর্থ পথ। বটমঙ্গলা অর্থাৎ পথের দেবী। ১৮৯৭-এ পুরী রেলস্টেশন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরী যাওয়ার পথ ছিল কলকাতা --পুরী জগন্নাথ সড়ক। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর এই পথ দিয়েই জগন্নাথদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই যুগে পুণ্যার্থীরা শহরে ঢোকার আগে ঢোকার আগে এই মন্দিরে পুজো দিতেন, দিয়ে শ্রীজগন্নাথদর্শনে যেতেন। নবকলেবরের সময় মূর্তিনির্মাণকল্পে গাড়ি ভর্তি নিমকাঠ মন্দিরে আনা হয়। সেই গাড়িগুলি যাত্রাবিরতি করে এই মন্দিরে। পাশ ও অঙ্কুশধারিণী দ্বিভুজা দেবী ত্রিনেত্রা, পদ্মাসনা, স্মিতবদনা। নিচু ছাদের ছোট মন্দিরটি ভারি জমজমাট। মাথা নীচু করে ঢুকতে হল। মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢোকার মুখে ঝোলানো অসংখ্য পেতলের ঘন্টার সম্মিলিত ধ্বনি, ধূপ ধোঁয়া-ফুল মালা...

অবশেষে, দিনাবসানে, পুরী। অবস্থিতি সেই শতাব্দীপ্রাচীন হোটেলে। এনাদের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ হৃদ্যতা বিদ্যমান। এবারে শ্রীমতী পাল সঙ্গে আসছেন জেনে তাঁরা মহার্ঘ একটি ঘর আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন; আর একটি গাড়ি চার দিনের জন্য। হোটেলঘরসন্নিহিত বারান্দায় বসলেই মন ভাল হয়ে যায়, সমুদ্র যেন গায়ে উঠে আসে, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে দেয় না আমরা কেন পুরীতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা। সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গেও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মিজোরামে নতুন বছর

সুবীর কুমার রায়

~ *মিজোরামের আরও ছবি* ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

গাছপালা দিয়ে ঘেরা ট্যুরিস্ট লজটি মুখোমুখি দুটি ভাগে বিভক্ত। ডানদিকে লতাপাতা দিয়ে সাজানো সুন্দর দোতলা পাকা বাড়ি, আর বাঁদিকে শক্তপোক্ত প্লাই ও কাঠের তৈরি কয়েকটা কটেজ। কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোথায় থাকতে চাই, ট্যুরিস্ট লজের মূল বাড়িতে না কটেজে। কটেজগুলোর ভাড়া সামান্য বেশি, কিন্তু দেখে আমাদের এত ভালো লাগল যে, মূল বাড়ির ঘরগুলো আর দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধও করলাম না। গাছপালা দিয়ে সাজানো তিনটে কটেজ নিয়ে নিলাম। মূল বাড়িতে রিসেপশন ও ডাইনিং। রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে যে যার কটেজে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত, কিন্তু তবু তরুণের কটেজটায় গিয়ে সোফা, চেয়ার ও খাটে গুছিয়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ গুলতানি করা হল, ছবি তোলা হল। আগামীকালের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হল। কাল সকালে সেই মায়ানমার বা বার্মার বর্ডার পেরিয়ে আমাদের হার্ট লেক দেখতে যাওয়ার কথা। যদিও আইজলের চাল্টলাঙ্গ-এ আলাপ হওয়া সেই অফিসারের কথা মতো, তাঁর সাহায্য ছাড়া ওই দেশে ঢোকা সাধারণ মানুষদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশে এটাই সবথেকে বড় অসুবিধা। দেড়শ কোটি ছুঁতে যাওয়া জনসংখ্যার, কয়েক হাজার, বেশ সংখ্যাটা নাহয় কয়েক লাখই হল, ভি.আই.পি. বা ভি.ভি.আই.পি.। এরাই একমাত্র দেশকে ভালোবাসে, বাকী সব অবিশ্বাসী চোর, ছ্যাঁচড়, জোচ্চোরের দল। আর যাই হোক এদের বিশ্বাস করা যায় না, উচিৎও নয়। ফলে যতকিছু সুযোগ সুবিধা ওইসব নেপোদের জন্য। বৃদ্ধ হোক, অসুস্থ হোক, বা পঙ্গু হোক, সাধারণ মানুষকে যেখানে কষ্ট করে হেঁটে যেতে হয়, ওনারা হেলিকপ্টার বা কোন বিশেষ ব্যবস্থায় যাতায়াত করেন। শুধু তাই নয় ওনাদের যাতায়াতের সময় সাধারণ মানুষ হেঁটে যাওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।

চামফাই গেস্টহাউসের কটেজ

উল্টো দিকের দোতলা বাড়িতে খেতে গেলাম। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলেও, কিমা সাহেবকে কোথাও দেখলাম না। খাবার টেবিলে বসে খবর পেলাম কিমাবাবু খেয়ে নিয়েছেন। ওকে দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ এখানে আমাদের মত এত রাত করে কেউ খায়ও না, জেগে বসেও থাকে না। অতি সাধারণ খাবার, কিন্তু সারাদিনের কেক-বিস্কুটের অত্যাচারে ও জায়গার গুণে, খেতে মন্দ লাগল না। খেয়ে উঠে দেখলাম ক্যান্টিনের পাশেই রান্নাঘরের একপাশে আগুন জ্বেলে কর্মচারীরা কাঠের আগুন ঘিরে বসে জল গরম করছে। ঠান্ডা আছে, তবে আগুন ঘিরে বসে থাকার মতো বলেতো আমার মনে হল না। ওরা আমাদের জিজ্ঞাসা করল ঘরে নিয়ে যাবার খাবার জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে দেবে কী না। মেয়েদের ইচ্ছামতো গরম জল মিশিয়ে খাবার জল নিয়ে যে যার ডেরায় ঢুকে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন শুধু কিমাবাবু নয়, গাড়িটাও নেই।

সকালবেলাও কিমা এবং তার গাড়ির দেখা মিলল না। উনি এলেন অনেক পরে। জানা গেল ও অন্য কোথায় রাতে ছিল। সর্বত্র দেখেছি গাড়ির ড্রাইভারদের থাকার ব্যবস্থা হোটেল বা লজেই থাকে। এখানে এত বড় বাড়ি, এত জায়গা থাকতে ও গাড়ি নিয়ে অত রাতে কোথায় গিয়েছিল, কেনই বা গিয়েছিল বোঝা গেল না। আমরা হার্ট লেকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। লেকটির গঠন নাকি হার্ট বা হৃদয়াকৃতির, তাই হার্ট লেক নামে পরিচিত হলেও, আসলে লেকটির নাম কিন্তু রিহ ডিল (RIH DIL) - এক কিলোমিটার লম্বা ও সত্তর মিটার চওড়া। এখান থেকে প্রায় সাতাশ কিলোমিটার দূরে ZOKHAWTHAR ভারত-বার্মা বর্ডার। বর্ডার থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে লেকটি অবস্থিত। বেশ কিছুটা পথ গিয়ে, কিমা তার গত রাতের রাত্রিবাসের আলয়টি দেখাল। দূরত্ব বেশি নয়, আমাদের গাড়ি একসময় ভারত-মায়ানমার(বার্মা) বর্ডার গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। এখানে উল্লেখ করার মতো দুটি ঘটনা হল, বর্ডার পারের অধিকারটি একমাত্র আইজলের চাল্টলাঙ্গ গেস্টহাউসের সেই নামী বাঙালি অফিসারটি বা তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, এবং এই প্রত্যন্ত মিজো এলাকাতেও পোলিও বুথ আছে। গেটের বাঁপাশে ইমিগ্রেশন অফিস, আমাদের গাড়ি ইমিগ্রেশন অফিসের পাশে দাঁড়ালে, গাড়ি থেকে নেমে তরুণ সেখানে পরিচিতিপত্র দেখানোর সাথেসাথেই ওপারে যাওয়ার অনুমতি মিলল। মিজোরামবাসীদের জন্য

বোধহয় এই ব্যাপারে তেমন কড়াকড়িও নেই। জানা গেল এই পথ দিয়ে দুইদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানিও প্রচুর হয়। ইমিগ্রেশন অফিসের একটি বোর্ডে ইংরেজিতে "Except illegal goods, all goods can be imported freely" (যদিও দ্বিতীয় goods টিতে good লেখা আছে) এবং মিজো ভাষায় "Sorkar khap tel to bungrua reng reng chu zalen takin luhphalan" লেখা আছে। গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দেশের সীমানায় কিছুক্ষণ ঘুরে পায়ে হেঁটে একটা ব্রীজ পার হয়ে বিদেশের মাটিতে পা রাখলাম। পিছন পিছন আমাদের গাড়িও এসে হাজির। এখানে একটা খুব বড় না হলেও, ভালোই বাজার আছে। সেখানে কী না পাওয়া যায়। বাজারটা একটু ঘুরে দেখে গাড়িতে উঠে বসলাম। আগের মতোই গাড়ি এগিয়ে চলল, শুধু পার্থক্য একটাই, এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলছে।

রাস্তা যদিও খুবই খারাপ, তবে অল্পই রাস্তা। আমরা হার্ট লেক বা রিহডিল লেকের ধারে এসে পৌঁছলাম। একে মিজোরাম রাজ্যের সবথেকে বড় ও পবিত্র হার্ট লেক বলে বলা হয়ে থাকলেও, লেকটি মায়ানমারে অবস্থিত। মিজোরামের মানুষদের টামডিলে ছুটির দিনে ভিড় করে বনভোজন করতে যেতে দেখলেও, যেমন আমরা দিঘা, টাকি, ফুলেশ্বর, গাদিয়ারা, ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে থাকি, আকৃতি বা সৌন্দর্যে প্রায় সমতুল্য হলেও পবিত্রতার ধারে কাছেও টামডিল স্থান পায় না।

রিহ ডিল লেক

হার্ট লেকে কিন্তু দর্শনার্থীর সংখ্যা অতি নগণ্য। সুরাপান নিয়ে কেলেঙ্কারি হলেও, এই রাজ্যে সুরাপান নিষিদ্ধ। কিন্তু নির্জন হার্ট লেকের পাশে গুটিদুই-তিন দোকান থাকলেও, সেখানে লজেন্স, বিস্কুট, সাবান, বাচ্চাদের খেলনার পাশাপাশি পরোটা, চাউ ও ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির দেশি ও বিদেশি (মায়ানমার-এ প্রস্তুত) সুরা বিক্রয় হয়। এখানে সুরা, পান বা বিক্রয় কোনটাই নিষিদ্ধ নয়, তবে ভারতীয় সুরার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এখানে মোটর সাইকেল নিয়ে শুধুমাত্র সুরাপান করতেই আসে বলে মনে হল। জনবসতিহীন এই জায়গায় খাবারের দামও অত্যন্ত বেশি। যতদূর জানা যায়, মিজো উপজাতিদের পূর্বপুরুষরা কোন সময় এই বার্মা দেশ থেকে এসেই এখানে, অর্থাৎ বর্তমানের মিজোরামে বসবাস শুরু করে। তাই হয়তো মিজোরামের মানুষদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর তাদের আত্মা এই লেক-এ এসে আশ্রয় নেয়। মনে হয় শুধুমাত্র এই বিশ্বাসকে সম্মান দিতেই এই অঞ্চলে যাতায়াতের ওপর কোন বাধানিষেধ নেই। কেবলমাত্র গেট পার হয়ে ওদের দেশে প্রবেশ করে, রাস্তার ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালালেই ওরা খুশি। অনেকভাবে চেষ্টা করেও, লেকটির সাথে হৃদয়ের সাদৃশ্য খুঁজে বার করতে পারলাম না। বেলা হয়ে যাচ্ছে, এবার ফেরার পালা। সূর্যদেব 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' বলে এদেশের পাট চুকিয়ে অন্যত্র চলেছেন।

ফেরার পথে আগের মতোই বর্ডার গেটের কাছে গাড়ি থেকে নামা হল। দোকানগুলো থেকে মেয়েরা তাদের প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ব্রীজ পার হয়ে ফিরে আসার সময় মাঝ পথে একটি শববাহী দলকে হার্ট লেক উদ্দেশ্যে যেতে দেখলাম। ওদের সঙ্গে গিয়ে সৎকার অনুষ্ঠানটি দেখার ইচ্ছা থাকলেও, সময়াভাবে বাস্তবে সম্ভব হল না। জায়গাটা খুব নির্জন, শান্ত, সুন্দর ও দূষণমুক্ত। মৃত্যুর পরে ওখানে থাকার জন্য কোন অনুমতি লাগে কিনা, অথবা অগ্রিম বুকিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না, তবে আমি ওখানেই চলে যাব স্থির করে ফেললাম। খাওয়ার খরচ একটু বেশি হলেও, থাকার খরচ নেই। আর কারও ইচ্ছা হলে জায়গাটা দেখে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই পারেন। অন্তত বাংলা ভাষায় সুখ-দুঃখের কথা বলে সময় কাটবে।

আমাদের সারথি কিমা

একসময় চামফাই গেস্টহাউসে এসে চায়ের খোঁজ করে, টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা হল। টেবিলে চা দিতে এসে ছেলেটি আমাদের একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলল। তার বলার ধরণ দেখে মনে হল, এখনই রাতের খাবার খেয়ে নিলে সে আরও খুশি হবে। চা খেয়ে ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, জমিয়ে বসে গুলতানি শুরু হল।

অনুরোধমত আজ বেশ তাড়াতাড়িই ডাইনিং হলে হাজির হলাম। তাছাড়া আজ সারাদিন সেই শুকনো খাবার ও লেকের ধারে দুর্মূল্য চাউ খানিকটা করে ভাগ করে খেয়ে কেটেছে। যদিও সেই চাউয়ের সিংহভাগই, কিমা চন্দ্রের উদরে স্থান পেয়েছে। তা যাক্, ছেলেটা ভালো এবং একটু খেতে, বলা ভালো বেশি খেতে বেশি ভালোবাসে। তবু সে-ই তো আমাদের সবকিছু দু'চোখ ভরে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। আর আমাদের মতো পর্যটক বা কেউ ওর গাড়িতে ভ্রমণ করলে তবেই ওর ভাগ্যে এইজাতীয় খাবার জোটে, সে আর মাসে ক'টাই বা দিন।

ডাইনিং হলে টাঙানো বিরাট ম্যাপটা দেখে আগামীকালের থেনজল যাবার রাস্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করার চেষ্টা করছি, গাড়ি নিয়ে তিনজন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের হাবভাব চেহারাই বলে দিচ্ছে, তাঁরা খুব সাধারণ লোক নন। আলাপ করলাম, আমরা মিজোরামে বেড়াতে এসেছি শুনে, তাঁরা প্রথমেই বিস্মিত হলেন। কথায় বোঝা গেল তাঁরা দেশের সিকিউরিটি সংক্রান্ত কোন বিভাগে কাজ করেন। অনেক রকম কথা হল। জানালেন, মিজোরামে, বিশেষ করে এই জাতীয় জায়গায় কোন চুরির ঘটনা ঘটে না। আমরা ঘরের দরজা খুলে রাতে ঘুমালেও, চুরি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। একবার কোন ম্যাজিস্ট্রেটের মানিব্যাগ এই অঞ্চলের কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তিনি এই গেস্টহাউসে আদৌ আসেননি, কিন্তু দরকারি কাগজপত্র, ক্রেডিট কার্ডসমেত ব্যাগ এই গেস্টহাউসের দরজার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য কিছু টাকা বার করে নেওয়া হয়েছিল। আসলে খুবই গরীব অঞ্চল, অভাবের তাড়নায় হয়তো কিছু নিয়েছিল, তাই চুপিসারে এখানে রেখে গেছে, যাতে মালিককে সহজে ব্যাগটি ফেরৎ দেওয়া যায়। আমরা এখান থেকে থেনজল যাব শুনে তাঁরা আমাদের কোন দিক দিয়ে গেলে সুবিধা হবে ও পথে কী কী দেখার জিনিস পড়বে কিমাকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। আমি রাজনীতি করি না, পছন্দও করি না, হয়তো ঘৃণা করি বললেই ঠিক বলা হবে। যে মিজোরামের শাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত গোলমাল, ইত্যাদি শুনে আমরা

আতঙ্কগ্রস্ত হই, সেই মিজোরামের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য ও আমাদের রাজ্যের মানুষ কী করে সহ্য করে শুনে, এবং সর্বোপরি এ রাজ্যের মানুষের কী করা উচিৎ শুনে মনে হল, আমরা কী আমাদের নিজ রাজ্যে সত্যিই ভালো আছি, নির্ভয়ে আছি, ন্যায় বিচার ও সুশাসনে আছি? এঁদের কাছে আবার নতুন করে শুনলাম যে, চামফাই হচ্ছে মিজোরামের বৃহত্তম সমতলভূমির এলাকা।

খাবার দিয়ে গেল। নিজেরাই পাত্র থেকে খাবার নিয়ে খেয়ে, রাতের জন্য খাবার জল নিতে রান্নার জায়গায় গিয়ে দেখি একটা লোকও নেই। বাধ্য হয়ে নিজেরাই ভিতরে ঢুকে জল ভরে নিয়ে যে যার ঘরে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে দেখে, চা জলখাবার খেয়ে, গেস্টহাউসের বিল মিটিয়ে, গাড়ি নিয়ে থেনজল চললাম। বিদায় চামফাই, চিরকালের মতো বিদায়।

থেনজল নিয়ে মনের মধ্যে একটা চিন্তার জট প্রথম দিন থেকে রয়েই গেছে, কারণ আমাদের মধ্যে কথোপকথনটা কখনই দ্বিপাক্ষিক হওয়ার সুযোগ পায় নি। যাত্রা শুরুর আগে থেকে এখন পর্যন্ত কতবার যে ফোন করে কবে থেকে কবে, কোথায়, কত দিন, ক'টা ঘর, লোক সংখ্যা কত, বলতে গেলে ঠিকুজি কোষ্ঠী পর্যন্ত জানিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্ত প্রতিবার ওই একই মহিলা কণ্ঠে একই উত্তর 'হ'। শেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে আমি ফোন করলেই সঙ্গীরা ঠাট্টা করে বলতো, "সুবীরদা ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়েছে, তাই বারবার ফোনে প্রেমালাপ করছে। ব্যাপারটা সত্যিই প্রায় সেরকমই দাঁড়িয়েছে। কলকাতা থেকে, বাড়ি থেকে, আইজল থেকে, রেইক থেকে, এমন কী গত পরশু চামফাই থেকেও ফোনে কাটা রেকর্ড শুনিয়েছি, উত্তরও সেই এক 'হ', শুধু রেইক থেকে ফোন করলে, একটা কিনলে একটা ফ্রী-এর মতো সঙ্গে একটা ওয়েলকাম শব্দ যোগ হয়েছে মাত্র।

চামফাই থেকে থেনজলের দূরত্ব কত মনে করতে পারছি না, তাছাড়া কিমার কথায়, বা স্থানীয় কোন মাইলস্টোন থেকে সে তথ্য উদ্ধার করাও ভীষণ শক্ত। চাল্টলাঙ্গ বা চামফাই গেস্টহাউস থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে কোন মিল নেই। স্থানীয় লোক বা দোকানদারদের মত আবার এদের থেকে আলাদা। ত্রিশ কিলোমিটারও হতে পারে, দু'শ ত্রিশ কিলোমিটারও হতে পারে - এরকম একটা অবস্থা। তার ওপর চামফাই গেস্টহাউসে ওই ভদ্রলোক অন্যপথে থেনজল যাবার কথা কিমাকে বলে দিয়েছেন, যাতে আমরা পথে দু'-একটা নতুন স্পট দেখার সুযোগ পাই। কিমা ভদ্রলোকের কথা অনুযায়ী রুটের সম্ভবত কিছু পরিবর্তন করে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। কানু বিনা গীত নাই এর মত আমাদের কাছে এখন কিমা বিনা গতি নাই অবস্থা। যাহোক সে একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জানাল যে, এটা একটা ভীষণ পবিত্র জায়গা। এই জায়গাটা আগে কেউ জানতোও না, কিন্তু দুর্গম এই জায়গায় সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করে কোন এক গরু একটি শাবক প্রসব করে। তারপরেও এই গল্পের অনেক পর্ব আছে। কিন্তু যে জায়গায় কেউ আগে কখনও আসেনি বা বসবাস করেনি, সেখানে গরু কোথা থেকে এসে হাজির হল, এবং মোটামুটি সমতল জায়গা ছেড়ে, যেখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, অত কষ্ট করে দুর্গম চড়াই ভেঙে সন্তান প্রসবের জন্য অত উপরে উঠলই বা কেন কে জবাব দেবে? এক যদি মেজদাকে খুঁচিয়ে জানা যায়।

গোবৎসের জন্মস্থান

বেচারা কিমা আমাদের এ হেন তীর্থক্ষেত্র দেখাবে বলে রাস্তা পরিবর্তন করে এতদুর নিয়ে এসেছে, কাজেই কথা না বাড়িয়ে সপারিষদে গোশাবকের জন্মস্থান সন্দর্শনে চললাম। এবড়ো-খেবড়ো জঙ্গলের চড়াই ভেঙে বেশ কিছুটা পথ গিয়ে এক কাঁটা তারের বেড়া পড়ল। একটা নয়, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত তিন-তিনটে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। অনেক চেষ্টা করেও মেয়েরা সেই তারের বেড়া গলে যাওয়ার চেষ্টায় বিফল হয়ে, আমাদের অযোগ্য স্বামী বিবেচিত করে, মার্চপাস্ট করতে করতে ফিরে গেল। আমরা তিনজন কাঁটাতার গলে, জামা ছিঁড়ে, আরও বেশ খানিকটা পথ চড়াই ভেঙ্গে, দ্রষ্টব্যস্থলে পৌঁছলাম। পাহাড়ি পথে একটু সমতল চাতাল মতো এলাকা, সেখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। SERCHHIP জেলার অন্তর্গত থেনজল শহরটি গভীর জঙ্গল ও বন্য পশু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। ১৯৬১ সালের পর থেনজলকে মনুষ্য বাসযোগ্য করা হয়। গোটা থেনজলের লোক সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচশ' মতো। এই গোশাবকটির জন্মের সময় সেটা অনেক কম ছিল, এবং আজও এই জায়গাটি মনুষ্যবিহীন, তাহলে ঐ অসুস্থ গরুটির আব্রু রক্ষার্থে কেন অত কষ্ট করে ওপরে যেতে হয়েছিল, জানা গেল না। কাঁটাতারের বেড়াও সেই গরুই দিয়েছিল কী না, কিমাকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা থাকলেও করা গেল না।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাধিস্থল

নীচে নেমে এসে আর একপ্রস্থ মুখঝামটা ও হাসির খোরাক হলাম। তোমার কর্ম তুমি কর কিমা, লোকে বলে করি আমি। একটু সময় কাটিয়ে, টুকটাক কিছু মুখে পুরে এগিয়ে গেলাম। একটু দূরেই নতুন স্পট। চামফাইয়ের ভদ্রলোকের কথামতো কিমা গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের দেখে আসতে বলল। এইসব জায়গাগুলোর নাম হয়তো ভূগোলে নেই, কিমা জানবে কোথা থেকে। একটা মানুষ চোখে পড়ল না যে জিজ্ঞাসা করব। কোথাও কিছু লেখাও নেই, থাকলেও সেটা পালিভাষাসম দুর্বোধ্য। এখানে একই জায়গায় পরপর প্রচুর বিখ্যাত মিজো মানুষের সমাধিস্থল। এতো নির্জন জায়গায় সমাধিস্থ করার কারণ বোধগম্য হল না। হয়তো হার্ট লেকের মতো এখানেও কিছু উপাখ্যান আছে, কিন্তু জানার সুযোগ হল না। কিন্তু এটা খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। যেটা উল্লেখ করার বিষয় সেটা হল, অধিকাংশ ফলকেই জন্মসাল উল্লেখ করা থাকলেও, মৃত্যুর বছরটির জায়গা ফাঁকা রাখা আছে। মৃত্যুর পূর্বেই ফলক তৈরি করে রাখা হয় কী না বলতে পারব না। কোন একজন মানুষের জন্মসাল নাও জানা থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সাল না জানার কোন কারণ থাকতে পারে? তবে কি তাঁরা এখনও জীবিত? আমাদের এখানে জমি কিনে পাঁচিল দিয়ে রাখার

মতো মৃত্যুর আগেই সমাধি তৈরি করে জমি দখল করে রাখা হয়েছে? মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সমাধিস্থল খুঁড়ে সমাধিস্থ করা হবে? উত্তর জানা নেই। সত্যি এদেশে কত কিছুই না জানা আছে, আমরা সে সব ছেড়ে বারমুডা ট্রাঙ্গেল নিয়ে পড়ে আছি।

লাভার্স পয়েন্ট

গাড়ি আবার এগিয়ে চলল, আবার নতুন দ্রষ্টব্যস্থল। এটার নামও সঠিক জানা গেল না। জানা গেল না, কারণ অনেকটাই প্রায় আগের সেই একই অসুবিধা। তবে কিমা জানাল, এটা লাভার্স পয়েন্ট। সুইসাইডাল পয়েন্ট নাম বললেও আশ্চর্য হতাম না। এখানে পাহাড়ের চূড়ায় একটি ঝুলন্ত বারান্দার মতো জায়গা আছে। তার একবারে কিনারায় বসে এক ব্যর্থ প্রেমিক তার অন্য পাহাড়ের চূড়ার প্রেমিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। সেখানকার লোকজনেরা ওই প্রেমিকের বসার ভঙ্গীতে ওখানে গিয়ে বসে। প্রতিবার ওই একই ভঙ্গীতে প্রেমিকটি কেন বসত, বা ওই নির্দিষ্ট ভঙ্গী তারা জানলই বা কিভাবে, জিজ্ঞাসা করে আমাকে বিব্রত না করলেই খুশি হব। ভাবা যায়? এর কাছে স্বয়ং শাহজাহানের মুমতাজের প্রতি প্রেমও ম্লান হয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই স্ত্রীরা আছে, তাই নিস্ফল জেনেও, ওই জায়গায় গিয়ে একটু বসলাম। কিমা জানালো থেনজল গেস্টহাউসের আগে আর কিছু দেখার নেই। আসার পথে যে তিনটি জায়গা দেখা হল, তা দেখে হয়তো কারও পছন্দ হল না বা হবে না, আমার কিন্তু মন্দ লাগল না। যে কোন নতুন জায়গা আমার সমান আগ্রহ নিয়ে দেখার অভ্যাস।
আমাদের গাড়ি থেনজল গেস্টহাউসের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। অনেক্ষণ থেকেই মনটা চা-চা করছিল। অবশেষে বিখ্যাত 'সাংসাং হোটেল কাম টি স্টল' এ চা খেতে যাওয়া হল। এখানে CHAW, CHAU, CHHANG, THINGPUI, CHANA, ARTUI, BAWNGHNUTE, কী না পাওয়া যায়। দোহাই আপনাদের, দয়া করে জানতে চাইবেন না খাদ্যবস্তুগুলি কী। জানলে আমরাই তো খেতে পারতাম। চা খেয়ে গাড়িতে উঠলাম। আরও বেশ কিছুক্ষণের পথ পাড়ি দিয়ে এসে, গাড়ি দাঁড় করানো হল। জায়গাটা মোটামুটি বেশ বড়ই। একটা দোকানের, পেট্রল পাম্প বললেও বলা যেতে পারে, বোর্ডে দেখলাম 'KHAWBUNG' লেখা। সম্ভবত জায়গাটার নাম। এখানে কিছু খেয়ে নিয়ে একটু ঘুরে ফিরে জায়গাটা দেখলাম।
এখানকার ভাষা সমস্যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এদের নিজেদের ভাষাটা সম্ভবত মিজো, কিন্তু এদের কোন বর্ণমালা ছিল না। ব্রিটিশ মিশনারিদের কল্যাণে মিজোবাসী লিখবার সুযোগ পায়। যদিও স্ক্রিপ্টটির লিখিত বর্ণের মধ্যে অনেকগুলোই আবার ইংরেজি বর্ণমালায় নেই। তাই এইসব লেখা পড়ে তার পাঠোদ্ধার করা আমাদের কর্ম নয়। যাইহোক জায়গাটা বড়, এরপর অনেক্ষণের পথ, তাই মেয়েরা টয়লেটের খোঁজ শুরু করল। পাওয়াও গেল। আমাদের এখানকার মতো খানিকটা ঘেরা জায়গা মাঝখান দিয়ে পাঁচিল তুলে দু'ভাগ করা। একদিকে পুরুষদের, আর অপরদিকে মহিলাদের জন্য। কিন্তু এত সুব্যবস্থার মধ্যেও বাধা সেই ভাষা। টয়লেটের বাঁদিকে MIPA আর ডানদিকে HMEICHHIA লেখা, অর্থাৎ একটা পুরুষ ও অপরটা মহিলা বুঝেও টস্ করে কোনটা মহিলা কোনটা পুরুষ ঠিক করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষে স্থানীয় লোকের সাহায্যে আলোকিত হয়ে, মেয়েরা একে একে টয়লেট ঘুরে এল। এবার এগোতে হয়। বেলাও ক্রমশঃ বাড়ছে। ওখানকার এক অফিসকর্মী সোজা না গিয়ে, ডানপাশের বাইপাস ধরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, তাতে নাকি রাস্তা অনেকটাই কম হবে। ভদ্রলোক অন্য রাজ্যের বাসিন্দা, কর্মসূত্রে এখানে এসে মেসে থাকেন। অবস্থা দেখে কষ্ট হল। এর নাম চাকরি। ভদ্রলোক কিমাকে রাস্তাটা বুঝিয়ে দিলেন। আরও দু'একজন স্থানীয় মানুষও কিমাকে বুঝিয়ে দিল। আমরা সোজা না গিয়ে ডান দিকের সরু, অসমান, অপেক্ষাকৃত ভাঙা রাস্তা ধরলাম।

বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর একটা সবুজ চাষের জমির কাছে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকেরটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। কিমা গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল, কারণ একটা লোকেরও দেখা পাওয়া গেল না। শেষে বাঁদিকের রাস্তাটা হওয়ার সম্ভবনা বেশি মনে করে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললো। মেঠো রাস্তাটা ঘুরপাক খেয়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে চাষের জমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে দু'তিনটে ভাঙা, পরিত্যক্ত মোটর গাড়ি একপাশে পড়ে আছে। কোথাও কারও দেখা মিলল না। এখানে কে ভাঙা গাড়ি রাখতে আসবে ভেবে পেলাম না। তবে কি আমাদের মতোই পথ হারিয়ে এখানে এসে আজ এই অবস্থা? আমাদের গাড়িও ভবিষ্যতে এর পাশেই স্থান পাবে কিনা ভাবছি, বহু কসরত করে কিমা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।
আবার সেই তিন মাথার মোড়ে এসে যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেই ডানদিকের চওড়া পথে না গিয়ে সোজা সরু রাস্তা ধরলাম। এ রাস্তাটা অনেকটা এরাজ্যের গ্রাম্য মাটির রাস্তা, তবে সুবিধা একটাই, এঁটেল মাটির পথ নয়। যত সামনের দিকে এগচ্ছি, রাস্তা তত সরু হতে হতে প্রায় কোনমতে একটা গাড়ি যাবার মতো চওড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার বাঁদিকটা ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ পাঁচিলের মতো খানিকটা উঁচু পাথর, আর ডানদিকে সরু কঞ্চির মতো আকৃতির বাঁশ গাছের জঙ্গল, ধীরে ধীরে অনেকটা নীচে সমতল ভূমিতে নেমে গেছে। রাস্তার অনেক জায়গাতেই জল জমে কাদা কাদা হয়ে আছে। কতটা রাস্তা এরকম কে জানে, চিন্তা হচ্ছে উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি এসে হাজির হলে কী হবে। আলোর তেজ বেশ কমে এসেছে। আলো আঁধারি এই জঙ্গলে ঘেরা নির্জন রাস্তা যেন আর শেষই হতে চায়না। কিমার পাশে বসে নানারকম উদ্ভট সব চিন্তা শুরু হলো। এতক্ষণেও উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসতে দেখলাম না। ভিজে রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগও আছে, তবু আমরা ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো? কিমা আবার এ রাস্তায় কোনদিন আসেও নি। রাস্তায় কেউ গাড়ি দাঁড় করালে কী করব? এরকম নির্জন জায়গায় জঙ্গীদের কবলে পড়ব না তো? কোন কারণে গাড়ি খারাপ হলেই বা কী করব? মেয়েদের দেখছি হাসি-ঠাট্টা বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ির সামনে বসে রাস্তার কিছু ছবি তুলছিলাম, থমথমে পরিবেশ সেটা বন্ধ করতে বাধ্য করল। এইভাবে আরও বেশ কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটার পর, বড় রাস্তায় উঠে এলাম। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিমা জানাল সত্যিই অনেকটা রাস্তা শর্টকাট হয়েছে। গাড়ির ভিতর বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ, হেমন্ত, শীত টপকে একবারে বসন্তের আগমন লক্ষ্য করলাম।

এবার গাড়ি তীরবেগে ছুটল। কিমা জানাল আর ঘন্টা দেড়েক সময় লাগবে। গাড়ির ভিতর আবার হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। শরীরে কিছু ক্লান্তি অবশ্যই এসেছে, তবে আজকের মত নিরাপদ আরামদায়ক আশ্রয়ে প্রায় পৌঁছে গেছি জেনে সবাই খুশি। এমন সময় আমার মোবাইলে এই প্রথম থেনজলের গেস্টহাউস থেকে ফোন– 'আপনাদের আজ আসার কথা, আপনারা কি আজ আসছেন?' সঙ্গীরা ঠাট্টা শুরু করে দিল, "সবাই চুপ কর সুবীরদার প্রেমিকা ফোন করেছে।" আমি জানালাম আমরা রাস্তায় আছি, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার পর আমরা একটা ছোট গঞ্জমত জায়গায় নেমে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মেয়েরা কেউ গাড়ি থেকে নামল না। চা খাচ্ছি, এমন সময় আবার ফোন, আসতে আর কতক্ষণ লাগবে? জানালাম আধঘন্টা মত। গাড়ি ছেড়ে দিল। রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা থেনজল গেস্টহাউসের গেটে প্রবেশ করলাম। মেয়েরা গাড়িতেই বসে রইল, আমরা তিনজন এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দেখি দুজন যুবক বসে ল্যাপটপ নিয়ে কাজে ব্যস্ত। আমরা আমাদের আগমনের কারণ বলতে তাঁরা বললেন, বাইরে রিসেপশনে গিয়ে কথা বলতে। আমরা বাইরে আসতেই দুজন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কী প্রয়োজন। একজন যুবক ও আর একজন তার থেকে বয়সে কিছু বড়। আমাদের আজ এখানে তিনটি

ঘর বুকিং আছে শুনে যুবকটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি জানালেন আজতো এখানে কারও নামে ঘর বুকিং নেই, তাছাড়া কোন ঘর খালিও নেই। বাইরে রীতিমতো ঠান্ডা। তবু এই ঠান্ডাতেও ঘামতে শুরু করার মতো অবস্থা। তিনি আমাদের বুকিং-এর কাগজ দেখতে চাইলেন। আমরা জানালাম যে কলকাতা থেকে ফোনে আমাদের ঘর বুক করা আছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ব্যাপারে ফোনে কথাও হয়েছে। এক ভদ্রমহিলা প্রতিবার আমায় ঘর বুকিং আছে বলে জানিয়েছেন। আজও আসার পথে উনি দুবার ফোন করেছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন "আপনার মোবাইলটা একবার দিন তো দেখি কোন নাম্বার থেকে আপনাকে ফোন করা হয়েছে। এই গেস্টহাউসে তো কোন ভদ্রমহিলা কাজ করেন না, আমিই তো এখানকার ম্যানেজার। আপনি বাংলায় কথা বলতে পারেন, আমি বাংলা বুঝি, বাঙালিও বলতে পারেন।"
আমার মোবাইল থেকে ফোন নাম্বার দেখে তিনি যা বললেন, তা শুনে তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। এই ফোন নাম্বারটা রেইক গেস্টহাউসের। যা বোঝা গেল, আমরা যে ভ্রমণ পত্রিকার মিজোরামের ওপর একটা লেখা থেকে ফোন নাম্বার জোগাড় করেছিলাম, লেখক সেখানে ভুল করে থেনজয়ালের ফোন নাম্বারটা রেইক-এর ফোন নাম্বার লিখেছিলেন। কিন্তু আমি ঐ নাম্বারে ফোন করার সময় কোনবারই থেনজল গেস্টহাউসের কথা উল্লেখ করতে ভুলিনি। ওখানে যে এস.এম.এস. করেছিলাম, তাতেও থেনজলের কথা উল্লেখ করে দিয়েছিলাম।
যুবকটি আমাদের বললেন, আপনারা আইজলে চলে যান, এখানে কোন ঘর খালি নেই যে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব। আর একটা কোথাকার গেস্টহাউসের নাম করে বললেন, আপনারা এই গেস্টহাউসেও চলে যেতে পারেন, তবে এটা এখান থেকে অনেকটাই দূর।

থেনজল ট্যুরিস্ট লজ

জানুয়ারির প্রথম, খুব ঠান্ডার রাত, রাতও এই এলাকা অনুযায়ী অনেক হয়ে গেছে। বিপদের গুরুত্ব বুঝে এবার একটু রূঢ় হলাম। যুবকটিকে বললাম আইজল ফিরে যাওয়ার জন্য আমরা এতটা পথ এত কষ্ট করে, পকেটের পয়সা খরচ করে আসিনি। ফোনটা নিয়ে ওই ভদ্রমহিলাকে সরাসরি গোটা ঘটনা জানিয়ে বললাম, এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। কিভাবে করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার, তবে মেয়েদের নিয়ে এই শীতের রাত্রে আইজল ফিরে যেতে হলে, আমি তাঁর নামে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী, প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও লিখিত অভিযোগ করব। আমার মোবাইলে এখনও প্রতিটা কলের ও এস.এম.এস. এর রেকর্ড আছে। ভদ্রমহিলা এবার তাঁর 'হ' ছেড়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করতেই, আমি ফোন কেটে দিলাম।

যুবকটিকে এবার বললাম যেভাবে পারেন কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। যুবকটি উত্তরে বললেন এখানে কোন ঘর খালি নেই, একটা ভি.আই.পি. রুম খালি আছে বটে, তবে এখানে অনবরত ভি.আই.পি. দের আগমন হয়। বলা যায় না, যে কোন সময় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও এসে হাজির হতে পারেন। এরকম একটা সময় যুবকটির ফোন বেজে উঠলো। ও পক্ষের কথা শুনতে না পেলেও, যুবকটির কথা শুনে মনে হল আমাদের নিয়েই কথা হচ্ছে। ফোন ছেড়ে পুরনো প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁকে বললাম, ওই ভি.আই.পি. রুমটাই আজ রাতের মতো দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি এবার বললেন আর কিছু নয়, কাল সকালেই হয়তো কোন ভি.আই.পি. এসে হাজির হবেন, তখন আপনারা এবং আমি উভয়ই বিপদে পড়ব। এবার একটু রাগ দেখিয়েই বললাম কাল রবিবার, ছুটির দিন, কাল কেউ আসবেন না। তাছাড়া কাল সকালে আপনার মন্ত্রী আসার আগেই আমরা ঘর ছেড়ে দেব। যুবকটি আর কথা না বাড়িয়ে, সামনের একটি বাড়ির দোতলায় একটি ঘর দেখিয়ে বললেন এই ঘরটার জন্য হাজার টাকা লাগবে। ঘরটা বড়, একটা জানালার কাচ ফাটা, সেলোটেপ লাগানো। এ.সি. আছে, তবে চলে কী না বলা শক্ত, কারণ রিমোট নেই। কথা না বাড়িয়ে চারজন মহিলাকে সেই ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কোথায় থাকব? যুবকটি খানিকটা দূরে অন্য একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, এটায় আপনারা থাকুন, ছশো টাকা ভাড়া লাগবে। রাজি হয়ে গেলাম, না হয়েও উপায় নেই। মালপত্র ঘরে তুলে, গেস্টহাউসের কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান কাম হোটেলে খাবারের অর্ডার দিয়ে ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে খেতে গেলাম। গেস্টহাউসের বাইরে এটাই একমাত্র খাওয়ার জায়গা, এটা না থাকলে কী হত কে জানে। এখানেও শুয়োরের মাংসের অভাব নেই। কিমাকে দেখলাম ডেকচি থেকে একটা টুকরো তুলে মুখে ফেলল। আমরা চাপাটি, ডাল, একটা সবজি ও ডিম ভাজা, সঙ্গে গরম চা দিয়ে আহার সেরে, আমাদের ভি.আই.পি. মেয়েদের ভি.আই.পি. ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। সবার কাছেই মোবাইল আছে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করে নেওয়া যাবে। আমরা আমাদের ঘরে চলে এলাম। এখানেও দেখলাম কিমার গাড়ি, গাড়ি রাখার জায়গায় নেই। দুর্যোগ কাটিয়ে দু'জনের শোওয়ার বিছানায় তিনজন শুতে গিয়ে দেখি আর এক বিপদ। থেনজলের উচ্চতা মোটামুটি পঁচিশ থেকে ছাব্বিশশো ফুটের মধ্যে হলেও, মাসটা জানুয়ারি, খুব ঠান্ডা। দুটো সরু সরু লেপ নিয়ে তিনজন শুলে, মাঝেরজনের নিউমোনিয়া কে আটকায়? সমস্যা, সমস্যা, আর সমস্যা, কোথাও এতটুকু শান্তি নেই। এতো দেখছি "যদি দেখি কোন পাজি বসে (পড়ুন শোয়) ঠিক মাঝামাঝি, কি যে করি ভেবে নাহি পাই রে– ভেবে দেখ একি দায়, কোন্ ল্যাজে মারি তায় (পড়ুন কোন লেপে ঢাকি তায়) দুটি বই ল্যাজ (পড়ুন দুটি বই লেপ) মোর নাইরে" গোছের সমস্যা! কিছু দূর অন্তর অন্তর সেফটিপিন লাগিয়ে, দুটো লেপকে একটায় পরিণত করে শুয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে, আবার উল্টো প্রক্রিয়ায় একটা লেপকে দুটোয় পরিণত করে বাইরে বেরলাম। ভি.আই.পি. রুমে গিয়ে দেখলাম মেয়েরা তৈরি হয়ে বসে আছে। একসাথে কালকের সেই দোকানে গিয়ে গরম গরম লুচি, আলু-মটরের তরকারি, ডিমসিদ্ধ আর চা খেয়ে গতকাল রাতের সব দুঃখ ভুলে গেলাম। অল্প কিছু পরে কিমা গাড়ি নিয়ে হাজির হল। জানা গেল তার ছেলে অসুস্থ। তার কথায় মনে হল সে বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু সেটা বাস্তবে সম্ভবপর বলে মনে হল না। কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

আজ রবিবার, মিজোরাম দেখলাম রবিবারটা সত্যিই ছুটির মেজাজে কাটায়। সকালে উঠেই আমরা চলে যাব জেনেও, গেস্টহাউসের কেউ টাকা নিতে হাজির হল না। কাউকে কোথাও দেখাও গেল না। কিমার খাওয়া শেষ হলে সমস্ত মালপত্র নিয়ে ভানতোয়াং জলপ্রপাত দেখতে চললাম।

এই জলপ্রপাতটি থেনজল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটি মিজোরাম রাজ্যের উচ্চতম জলপ্রপাত। প্রায় সাতশো পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে নেমে এসেছে। ভানতোয়াং জলপ্রপাত খুব একটা চওড়া নয়, বা ভীষণ বেগে ওপর থেকে জল নেমে আসছে, তাও নয়, তবু জলপ্রপাতটির একটি আলাদা সৌন্দর্য অবশ্যই আছে। সরু সরু কঞ্চির মতো বাঁশগাছের গভীর জঙ্গলে ঢাকা। বেশ খানিকটা দূরে, কিন্তু সরাসরি নীচে নেমে কাছে যাওয়া যায় না। ঠিক যেন অনেক ওপর থেকে কুয়োর মধ্যে জল পড়ছে। অন্য পথে যাওয়া যায়, সেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ দফায় জল আছাড় খেয়ে পড়ে, একটা পুকুরের মতো সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আসা খুব কষ্টকর, ঝামেলাসাপেক্ষ ও বিপজ্জনকও বটে। মেয়েরা অনেকটা এসেও শেষপর্যন্ত জঙ্গল ও ভিজে এবড়োখেবড়ো পাথর ভেঙ্গে নামতে সাহস করল না। অথচ এখানে দেখলাম লোকে পিকনিক করতে আসে। কলাপাতা ও কাগজের তৈরি থালা বাটি ইতস্তত ছড়ানো। তবে জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। গা ছমছমে নির্জন পরিবেশে জলের আছাড় খাওয়ার শব্দে একটা আলাদা মাধুর্য আছে।

এবার ফেরার পালা। সাবধানে জঙ্গল পেরিয়ে মাঝপথ থেকে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। আরও কিছু সময় কাটিয়ে গেস্টহাউস ফিরে চললাম। গেস্টহাউসে কাউকে দেখা গেল না। ভিজে গামছাগুলো শুকনোর জন্য মেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলো ব্যাগে পুরে, পুরনো চায়ের দোকানটায় চা খেতে ঢুকলাম। দোকানদার জানাল, আজ রবিবার ছুটির দিন, কেউ আসবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, কারও না আসার পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। হয় রেইকের সেই ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে এখানকার যুবকটিকে আমাদের একটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন, যেটায় অফিসিয়ালি কোনও অসুবিধা ছিল। যুবকটি ষোলশ টাকা দাবি করলেও রসিদ দিতে পারবে না বলে পিছিয়ে গেছে। অথবা যুবক বা তার সহচর ছুটির দিনে কষ্ট করে গেস্টহাউসে আসে নি, বা আসতে ভুলে গেছে। এদের চাহিদা খুব কম, ফলে এরা একটু কুঁড়ে প্রকৃতির হয়।

থেনজল ট্যুরিস্ট লজ

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আমরা আইজলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আইজল বাসস্ট্যান্ডে এসে জানা গেল, আজ কোন বাস শিলং-এর উদ্দেশ্যে যাবে না। রবিবার, ছুটির দিন, তাই বাসস্ট্যান্ড ফাঁকা। দূরপাল্লার বাস চলাচল প্রায় বন্ধ। আগামীকাল দুপুরে বাস পাওয়া যাবে। একটা বড় নীল রঙের বাস দেখলাম শিলং যাচ্ছে। ছুটি কাটিয়ে আইজলের বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী শিলং ও গৌহাটি ফিরবার জন্য বাসটা ঠিক করেছে। আজ না ফিরতে পারলে, আজ এবং আগামীকাল, দু-দু'টো দিন নষ্ট, তাই ড্রাইভার ও হেল্পারকে অনেক বুঝিয়ে ওই বাসেই যাওয়া পাকা করে নিলাম। মিজোরাম ভ্রমণ শেষে এবারের গন্তব্য শিলং - মেঘালয়। সে গল্প আবার কখনও।

- সমাপ্ত -

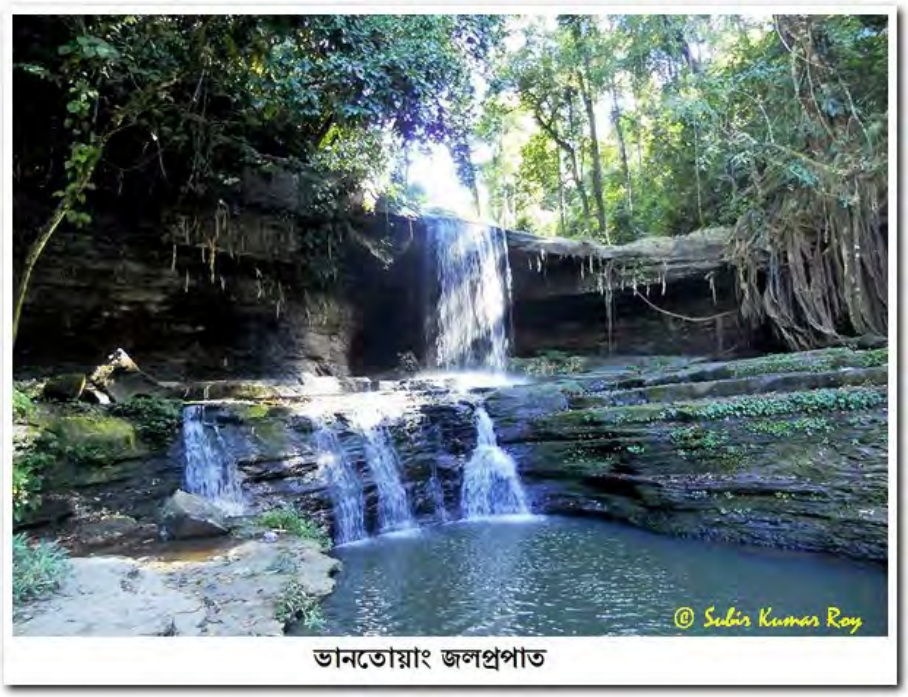

ভানতোয়াং জলপ্রপাত

~ *মিজোরামের আরও ছবি* ~

অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। সেই ভ্রমণ কাহিনি তিন দশক পরে 'আমাদের ছুটি' পত্রিকায় প্রকাশের মারফত প্রথম পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু। এখন ভ্রমণ কাহিনি ছাড়াও গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লেখালেখি করছেন বিভিন্ন জায়গায়।

জুরিখ থেকে আল্পসের তিত্‌লিস হিমবাহে

সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য

~ *সুইৎজারল্যান্ডের আরও ছবি* ~

জুরিখ আগমন

চেক প্রজাতন্ত্র-র রাজধানী প্রাগ থেকে 'স্টুডেন্ট এজেন্সি'-র বাসে স্যুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে এসে পৌঁছেছিলাম ২০১৪-র নভেম্বরের এক সকালবেলা। 'বুকিং ডট্ কম্' এর সাহায্যে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হোটেল 'লিম্মাতহফ্'-এ আগে থেকেই একখানা ঘর বুক করা ছিল। আমাদের ঘর পাঁচতলায়। ঘরটা দেখলাম ছোট হলেও ঝকঝকে এবং আরামদায়ক। হোটেলটার সবচেয়ে বড় দুটো প্লাসপয়েন্ট হল অনবদ্য স্টাফ এবং দুর্দান্ত লোকেশন। হোটেলের ঠিক সামনেই চওড়া প্রধান রাস্তা, চৌমাথা, 'সেন্ট্রাল' ট্রাম স্টপ আর রাস্তার ওপার দিয়ে বয়ে যাওয়া ছিমছাম শান্ত লিম্মাত নদী; নদীর নামেই হোটেলের নাম। চটজলদি চেক্-ইন সেরেই বেড়িয়ে পড়লাম। গন্তব্য এ শহরের প্রধান আকর্ষণ জুরিখ লেক।

হোটেল এর রিসেপশন ডেস্ক থেকে জানিয়েছিল লিম্মাত নদী জুরিখ লেক থেকেই জন্ম নিয়ে উত্তরদিকে বয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে গেছে। সুতরাং নদীটার পাশে পাশে দক্ষিণে মিনিটপাঁচেক হেঁটে গেলেই জুরিখ লেক শুরু। সেই মতোই এগোলাম। ছোট্ট ঝকঝকে লিম্মাত; স্বচ্ছ জলের নীচে ছোট ছোট নুড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপর দিয়ে সরু পায়েচলা সেতু চলে গেছে ওপারে। ব্রীজের রেলিং-এ অজস্র রংবেরঙের তালা আটকানো। হয়তো এখানে তালা বাঁধলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়! আরও কিছুটা এগোবার পর এমনই একটা সেতুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে চোখে পড়লো লিম্মাত নদীটা যেন হঠাৎই চওড়া আর বিশাল একটা জলরাশির মধ্যে গিয়ে মিশেছে। আর সেই জলের ওপারে ধূসর পাহাড়ের রেখার পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে ঝকঝকে বরফের চূড়াগুলো। বুঝতে পারছিলাম ওই ঝাঁচকচকে জলটাই জুরিখ লেক যাকে ঘিরে আছে সুইশ আল্পস্ পর্বতমালা-র সারি।

পায়ের পাতা ডুবিয়ে জুরিখ লেকে

লিম্মাতের ওপর মোটর বোটের মেলা

লেকের দিকে যতই এগোচ্ছি, জায়গাটার জমজমাটি ছবি ক্রমশ চোখের সামনে ফুটে উঠছে। লিম্মাত-এর ওপর সারিবদ্ধভাবে বাঁধা ছোট ছোট মোটর বোট; বোটগুলো বেশিরভাগই নীল, সাদা অথবা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা; বোটগুলো ভ্রমণার্থীদের লেক সফর করায়। জলের ওপর নীল-সাদা আকাশের ছায়ায় একই রঙের কাপড়ে ঢাকা বোটগুলোকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। এবার লেক শুরু; দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় শুধুই জলের বিস্তার আর জল ঘিরে গুরুগম্ভীর আল্পস্। লেকের জল যেন আকাশের রং মেখেই এত অতলস্পর্শী নীল। আর সেই নীলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট সাদা পালতোলা নৌকা। শখের মাছ-শিকারীরা বোট থেকে জলে ছিপ ফেলে বসে আছে; লেকের ধার ঘেঁসে বড় বড় লঞ্চের মধ্যে ভাসমান রেস্তোরাঁ; লেকের ধার দিয়ে বৃক্ষশোভিত চওড়া পায়ে হাঁটা পথ; জল ঘেঁসে অথবা রাস্তার একদিকে বসার জন্য কাঠের বেঞ্চ। সব বেঞ্চই ভর্ত্তি। অনেকে সপরিবারে বা যুগলে বসে ছুটিযাপন এবং খাওয়াদাওয়া করছে; কেউ বা একা জলের ধারের বেঞ্চে লম্বমান হয়ে মিঠে রোদের আমেজ উপভোগ করছে। পুরোটা জুড়ে যেন এক অনন্ত ছুটির মেজাজ।

লেকের আর এক আকর্ষণ দলে দলে ভেসে বেড়ানো বিশাল বিশাল রাজহাঁস। লেকের নীল জলে দুধসাদা ডানার দ্যুতি ছড়িয়ে গর্বিত হাঁসগুলো তরতরিয়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছে; সঙ্গে আরও অনেক জলচর পাখিও ভিড় করেছে ট্যুরিস্টদের ছুঁড়ে দেওয়া খাবারের লোভে। অনেকেই দেখছি আলাদা করে খাবার কিনে এনেছে শুধু পাখিগুলোকে খাওয়াবে বলেই। এক তিব্বতি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল; বর্তমানে কর্মসূত্রে ওরা জুরিখেরই বাসিন্দা; তারা এক বিশাল পাউরুটি কিনে এনেছে হাঁসগুলোকে খাওয়াবে বলে, এবং জানালো ছুটির দিনে এমন তারা প্রায়শই করে। জলের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে দিলেই পাখিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মারামারি করে ছিনিয়ে নিচ্ছে এ-ওর খাবার। এই লড়াইয়ে অপেক্ষাকৃত শ্লথগতি বিশালদেহ রাজহাঁসগুলোই পিছিয়ে পড়ছিল। আমার তিন বছরের কন্যা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুরো এক প্যাকেট চিপস উপুড় করে দিয়েছে জলের ওপর এবং আরও এক প্যাকেট দেওয়ারও সবিশেষ ইচ্ছা; তাকে কোনোক্রমে নিরস্ত করে লেকের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম একটু ফাঁকা জায়গায় বসার জন্য।

আমরা লেকের উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণে এগোচ্ছি; দেখছি লেকের দক্ষিণে বরফের চূড়াগুলোয় রোদ ঝলসাচ্ছে। লেকের ওপর লঞ্চ জেটি থেকে লঞ্চ ছাড়ছে রাপারস্‌উইল বলে একটা জায়গার উদ্দেশ্যে; জেটির ওপর বেশ ভীড়। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে জানলাম রাপারস্‌উইল এখান থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে লেকের পূর্বপারে অবস্থিত একটা জায়গা আর এই ফেরি সেখানে যাওয়ারই একটা মাধ্যম। হাঁটতে হাঁটতে

জুরিখ লেকের ধারে

ভীড় ছাড়িয়ে বেশ একটু ফাঁকায় এসে পড়েছি, হঠাৎ বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটলো; দেখছি লেকের ধারের রাস্তার ওপর একপাশে দুটো লালচে পাথরের ভাস্কর্য; এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বেঞ্চে বসা মূর্তি- বৃদ্ধার মাথায় টুপি, বৃদ্ধর হাতে লাঠি। এখানে পথে-ঘাটে এমন মূর্তি ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি, তাই তেমন আমল না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি; হঠাৎ দেখি লাঠির ওপর রাখা মূর্তির হাতের আঙুল নড়ছে - একবার নয়, বারংবার। হতভম্ব হয়ে দেখি এ তো মূর্তি নয়, স্যুইস ভিক্ষুকযুগলের ভিক্ষা করার আজব কায়দা! এতক্ষণে চোখে পড়লো তথাকথিত মূর্তিযুগলের পায়ের কাছে একইরকম রঙকরা একটা কৌটোও ছিল, টাকা দেওয়ার জন্য।

অনেকটা সোজা যাওয়ার পর লেক বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। এখানটায় লেকের ধারে ধারে বেশ একটা সবুজ ঘাসে মোড়া সাজানো পার্ক; জলের ধারে গাছের তলায় পছন্দের বই হাতে বসে বেশ সময় কাটানো যায়; জলের কিনারে বড় বড় পাথরের ওপর বসে পা ডুবিয়ে দিলাম লেকের ঠান্ডা জলে। সামনে চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ অথৈ লেকের কিনারাহীন প্রশান্তগম্ভীর জলরাশি; একলা বোট লেকের মধ্যে নিষ্কম্প হয়ে মাছের প্রতীক্ষায়; জলছোঁয়া হাওয়ার সঙ্গে নিস্তব্ধতা ভেঙে উড়ে আসছে পাখিগুলোর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। অপার্থিব এক শান্তি চারদিকে।

স্টেশন, অতিকায় দেবদূত এবং সুইশ চকোলেট

জুরিখ লেকের ওপর মাছশিকারীর নৌকা

বেলা অনেকটা বেড়েছে। বেশ ক্ষুধার্ত বোধ করছি সকলেই। লেকফেরত রাস্তার পাশের একটা ছোট রেস্তোরাঁ থেকে হটডগ আর স্যান্ডুইচ দিয়ে বেশ জম্পেশ ভোজন হল। এবার এগোলাম জুরিখ হাফ্টবানহফ্ বা মেইন রেলস্টেশনের দিকে। সুপ্রশস্ত রাস্তার দুপাশে চমৎকার গড়নের সব বাড়ি; পাঁচ কামরার ট্রাম চলছে রাস্তায়; জুরিখ অপেরা হাউসের মাথায় পাথরের পরী উড়ছে; চার্চ, ঘড়িঘর, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মূর্ত্তি, ফোয়ারা, রঙচঙে পতাকায় সাজানো ঝলমলে রোদমাখা শহরটাকে আগাগোড়া ভারী প্রাণবন্ত লাগছে। লিম্মাত পেরিয়েই পশ্চিম দিকে স্টেশন। সিল্ নামের আরও একটা ছোট্ট নদী স্টেশনের সামনে দিয়ে উত্তরমুখে বয়ে গিয়ে মিলেছে লিম্মাত-এর সঙ্গে। শুনলাম স্টেশনের কিছু অংশ নাকি সিল্-এর নীচে বানানো। জুরিখ রেলস্টেশন স্যুইৎজারল্যান্ডের ব্যস্ততম স্টেশনগুলোর মধ্যে একটা। এখান থেকে এ দেশের অন্যত্র এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও রেল যোগাযোগ আছে। দেখছি অজস্র প্লাটফর্ম থেকে মুহুর্মুহু বহুদিকে ছেড়ে যাচ্ছে ঝকঝকে দ্রুতগতিসম্পন্ন সব দোতলা ট্রেন। আমরাও ইনফর্মেশন কাউন্টার থেকে আমাদের আগামীকালের গন্তব্যের যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করে নিলাম। ইনফর্মেশন ডেস্কের মেয়েটি বেশ সহৃদয় এবং সহায়ক; আগামীকালের ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া আসার সমস্ত ট্রেনের পুরো সময়-সারণী, ভাড়া ইত্যাদির প্রিন্টআউট দিয়ে দিল আমাদের। আমার কন্যার দুটো বেলুনও প্রাপ্তি হল তার থেকে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে স্টেশন ঘুরে দেখছি, দেখি স্টেশনের ভেতর বিরাট হল্-এ কয়েকটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায়; সেখানে একদিকে যেমন ধূমপায়ীদের আড্ডা থেকে বেসুরো গলার গান ভেসে আসছে তেমনি আর এক দিকে একটা পথনাটক আর ক্যুইজ গোছের কিছুর পুরস্কার বিতরণ চলছে; স্টেশনের ভেতরই কাফে, রেস্তোরাঁ, গিফ্ট শপ্ থেকে শুরু করে বিখ্যাত সুইশ চকোলেটের লোভনীয় সম্ভার। শেষোক্ত দোকানটায় না ঢুকে পারা গেল না; কাচের শো-কেসে থরে থরে সাজানো রয়েছে হরেক ছাঁদের হরেক স্বাদের গাঢ় খয়েরী-রঙা অমৃত। সুন্দর সোনালীরঙা আর লাল শাটিন ফিতে বাঁধা চৌকোনা বাক্স থেকে তাদের অবিরাম হাতছানি আর উপেক্ষা করা গেল না। কিছু আস্বাদন এবং কিছু আহরণ করে স্টেশনের ভেতরের হলের দিকে এসে দেখি একদিকে ছাদ থেকে ঝুলছে এক অতিকায় নীল গার্জেন অ্যাঞ্জেল; তার চোখ মুখ নেই, মাথাটা ছোট, পরনে বহুবর্ণ খাটো পোশাক, পিঠে সোনালী ডানা, হাতে একগাছা দড়ির মতো কিছু - সেটা জ্বলছে নিভছে। ইনফর্মেশন বুকলেট দেখে জানলাম এই ভাস্কর্য্যটির স্রষ্টা শিল্পী নিকি দ্য সেইন্ট ফ্যাল; ১.২ টন ওজন এবং ১১ মিটারেরও বেশি উচ্চতার এই অ্যাঞ্জেল হল সুইশ রেলওয়ের ১৫০ বছর উপলক্ষে একটি উপহার। বলাবাহুল্য, এই বৃহদাকৃতি অ্যাঞ্জেলটিকে আমার কন্যার এতটুকু পছন্দ হল না!

বেরোবার সময় আমরা স্টেশনের অন্য দিকটা দিয়ে বেরিয়ে বানহফপ্লাটজ্ এর দিকে চলে এসেছি; এদিকটা আরও সাজানো। স্টেশনের সুউচ্চ, ভাস্কর্যমন্ডিত প্রবেশদ্বারের মাথায় সুইশ পতাকা উড়ছে; গেটের সামনের ফোয়ারা দিয়ে সাজানো গোল জায়গার শিল্পী রিচার্ড কিসলিং এর গড়া সুইশ রাজনীতিবিদ এবং শিল্পপতি আলফ্রেড এস্চার এর মূর্তি; আর তার ঠিক সামনাসামনি সোজা চলে গেছে প্রশস্ত বানহফস্ট্রাসি - এ শহরের তো বটেই, সমগ্র ইওরোপেরও অন্যতম অভিজাত শপিং আভেন্যু। এ রাস্তা মূলত পদচারীদের দখলে; আমরাও স্রোতে গা ভাসালাম আর রাস্তাটার জৌলুস দেখে চোখে ধাঁধা লেগে গেল। রাস্তার দুপাশে সারবাঁধা দোকানের কাচের ভেতর থেকে হাতছানি দিচ্ছে নামীদামী ব্র্যান্ডের অত্যাধুনিক ফ্যাশনের পোশাক থেকে শুরু করে দুর্ধর্ষ ডিজাইনের জুয়েলারি, ব্রান্ডেড সুইশ ঘড়ি থেকে বিভিন্ন কসমেটিক্স সামগ্রী অথবা সাদা পশমের আদুরে টেডি বেয়ার পরিবার; সাদা আলোর খেলায় দোকানের সুবিশাল কাচে ফুটে উঠেছে মডেলদের ক্যাট-ওয়াক; ফুটপাতে ছাতা খাটানো রেস্তোরাঁতে আছে পানভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। এরই মধ্যে দেখি একটা হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস্ এর দোকানে দুলছে আমার কৈশোরে দেখা মন উচাটন করা যশ চোপড়া মুভির বিখ্যাত 'কাউবেল!' নাগালের মধ্যে টুকটাক কিছু কেনাকাটা সেরে আমরা হেঁটে হেঁটে শহর ঘুরতে লাগলাম। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে একটা জায়গার নিজস্ব চরিত্র, রং, গন্ধ কিছুই বোধহয় তেমন করে অনুভব করা যায়না।

বিকেল গড়িয়ে রাত

কখন যেন আলতো পায়ে বিকেল গড়িয়ে গেছে রাতের দিকে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়, দোকানপাটে, লিম্মাত এর সেতুগুলোতে; নদীর জলের গোলাপী আভায় রঙিন আলোগুলোর ছায়া ঝিকমিক করছে। ক্যাবারে ড্যান্স-ক্লাব বার গুলোতে শুরু হয়ে গেছে রঙিন রাতের মাদকতাময় প্রস্তুতি। আমাদের হোটেলের কাছেই দেখি একটা বেশ বড় বার এবং পরপর আরও কয়েকটা ড্যান্স-ক্লাব; তাদের বন্ধ দরজার বাইরে অতি স্বল্পবসনা

সুন্দরীদের লাস্যময় বিভঙ্গের ছবি। আমাদের আগামীকালের গন্তব্যস্থলটি জুরিখ থেকে বেশ দূরেই; আজ রাতেই গোছগাছ সেরে নিতে হবে এবং কাল সকাল সকাল সারাদিনের জন্য বেরোনো; তাই শহর পরিক্রমায় ইস্তফা দিয়ে 'কাবাব রোল' আর মেয়ের জন্য 'নুডল্স্' দিয়ে ডিনার সারা হল হোটেলেরই কাছাকাছি একটা ছোট রেস্তোঁরায়। হোটেলের ঘরে ফিরে জানলার সামনে দাঁড়াতে দেখি সামনে বিছিয়ে আছে আলো আঁধারির রাতপোশাক পরা অন্য এক মায়াবী জুরিখ। হলদে আলোমাখা চৌরাস্তা, রাতের ঘন নীল লিম্মাত, সাদা নীল ট্রাম, গাড়ির লাল ব্যাকলাইটের মিছিল, অপেক্ষারত মানুষজন সব যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে; আর দূরে আলো ঝলমল জুরিখ ট্রেন স্টেশন ও পাহাড়ের মাথায় জ্বলে ওঠা টিপটিপ আলোয় শহরটাকে অপূর্ব মোহময় লাগছে।

জুরিখ থেকে দোতলা ট্রেনে লুসার্ন

আজ আমাদের গন্তব্য জুরিখ থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে আল্পস্ পর্বতমালার কোলে অবস্থিত ছোট্ট আল্পাইন গ্রাম এঙ্গেলবার্গ এবং সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ ফুট উঁচু আল্পস্-এরই একটি চির-বরফাবৃত চূড়া এবং হিমবাহ মাউন্ট তিত্‌লিস। প্রকৃতপক্ষে মাউন্ট তিত্‌লিস-এরই পদপ্রান্তে এঙ্গেলবার্গ গ্রামটার অবস্থান। জুরিখ থেকে ইউরোসিটি সুপারফাস্ট ট্রেন যাবে লুসার্ন পর্য্যন্ত; সেখান থেকে ছোট সাবার্বন ট্রেনে এঙ্গেলবার্গ এবং এঙ্গেলবার্গ থেকে কেবল্ কার-এ (Cable Car) তিত্‌লিস। ভেবেছিলাম জুরিখ থেকে প্রথম ট্রেনটাই ধরব; কিন্তু কার্য্যগতিকে একটু দেরী হয়ে গেলেও অবশেষে উঠে বসেছি লুসার্নগামী ট্রেনে। দোতলা ট্রেন, ভেতরটা এরোপ্লেনের মতোই তকতকে; আমরা দোতলাতেই বসেছি দৃশ্যাবলী ভালো দেখা যাবে বলে। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। আজ সকাল থেকেই আকাশ ছাই ছাই রঙের মেঘে ঢাকা ছিলো; চারদিকেও পাতলা কুয়াশার মতো আস্তরণ; এখন এত বেলাতেও সেটা কেটে গিয়ে রোদ ওঠেনি। আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেছে। জানতাম অনেক বেশি উচ্চতায় অর্থাৎ পাহাড়ের আল্পাইন অংশে নাকি এইসময় আবহাওয়া চমৎকার থাকে, আকাশ নাকি সবসময়ই সেখানে ঘন নীল; মনে সেইটুকুই ক্ষীণ আশা জাগিয়ে রেখেছি যে হয়তো এঙ্গেলবার্গ-তিত্‌লিসে গিয়ে ভালো আবহাওয়া পাবো। নচেৎ এতদূর থেকে এসে এত টাকা ট্রেন ভাড়া খরচ করে (জুরিখ থেকে এঙ্গেলবার্গ যাওয়া এবং আসায় একেক জনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন ভাড়া ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭০০০ টাকা এবং এঙ্গেলবার্গ থেকে তিত্‌লিস এর কেবল্ কার-এর ভাড়া প্রায় ৫০০০ টাকা) গিয়ে যদি মেঘ আর কুয়াশা দেখে চোখ ভরাতে হয় তবে তা বড়ই দুঃখজনক!

ট্রেন বেশ স্পীডে চলেছে - বেশিরভাগটাই টানেলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য টানেল থেকে বেরোচ্ছে; আর তখন হালকা কুয়াশার চাদর ভেদ করে আবছা দেখা যাচ্ছে রেললাইনের ধারের রংচঙে ছাদওয়ালা বাড়ি, সবুজ ঘাসে ঢাকা বড় বড় খোলা মাঠ, ফাঁকা ফাঁকা কনিফার বন, এমন কত কী! হঠাৎ একটা ম্যাজিকের মতো ঘটনা ঘটলো। ট্রেনটা একটা টানেলে যখন ঢুকেছে তখনও বাইরে কুয়াশা; কিন্তু যেই টানেল থেকে বেরোলো দেখি এপাশে ঝলমলে রোদ। ঘোলাটে আকাশ ফাঁক হয়ে কোথা দিয়ে জানিনা একটুকরো রোদঝরানো নীল আকাশ বেড়িয়ে পড়েছে। কুয়াশা গায়েব, রেললাইনের পাশে পাশে চলা ছোট ছোট পাহাড়, সবুজ জঙ্গল আর স্ফটিকস্বচ্ছ তিরতিরে নদীটা রোদ মেখে ঝকঝক করছে। এই দৃশ্যটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না; পরবর্তী টানেলটায় ঢুকে ট্রেন যখন আবার বেরোলো, আবার চারদিকে সেই বিষন্ন কুয়াশার চাদর। অবাক হয়ে ভাবছিলাম প্রকৃতির মতো জাদুকরই একমাত্র পারে এমন ম্যাজিক দেখাতে!

কুয়াশাচ্ছন্ন লুসার্ন

লুসার্ন পৌঁছেছি। লুসার্ন শহরের কেন্দ্রে এবং লুসার্ন লেকের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত এই স্টেশনটা বেশ বড় এবং নতুন। পুরনো স্টেশনটা এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে যায় ১৯৭১ সালে; বর্তমান ঝাঁচকচকে স্টেশনটা তার পরে বানানো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় ট্রেনের প্রান্তিক স্টেশন এই লুসার্ন। আমাদের ইউরোসিটি ট্রেনটাও এখান থেকেই আবার জুরিখ ফিরে যাবে। লুসার্ন থেকে এঙ্গেলবার্গ-গামী ট্রেন ছাড়ে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর। পরের ট্রেন ১১.১০-এ। হাতে খানিকটা সময় আছে দেখে আমরা স্টেশনের বাইরে এলাম লুসার্ন শহরটাকে একটু দেখার জন্য। স্টেশন থেকে বেড়িয়েই বিশাল গেট, গেটের পরে রাস্তা আর রাস্তা পেরোলেই লেক লুসার্ন। বিশাল লেকের জলের ওপর পাতলা কুয়াশা ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে আছে; জুরিখ লেকের মতো এখানেও লেকের ওপর রাজহাঁস আর অন্যান্য পাখির জটলা; সুসজ্জিত স্টীমারগুলো দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর অপেক্ষায়। পতাকা দিয়ে সাজানো লম্বা ব্রীজ লেকের এপার থেকে ওপারে পৌঁছে গেছে; ব্রীজের ওপর গাড়ি, মানুষজনের ভীড়। লেকের ওপারের ঘর-বাড়ি দৃশ্যাবলী কুয়াশার জন্য ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। শুনেছিলাম এখান থেকে নাকি আল্পস পর্বতমালার মাউন্ট পিলাটাস্ এবং মাউন্ট রিগি-র বেশ স্পষ্ট দৃশ্য দেখা যায়। লুসার্ন লেক এবং এই দুই পাহাড়ের জন্যই এই শহরটা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু খলনায়িকা কুয়াশার দাপটে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেলো মাউন্ট পিলাটাস ও রিগি।

এলোমেলো কিছুক্ষণ শহরে ঘুরে আর ফটো তুলে স্টেশনে ফিরে এসেছি। 'বার্গার কিং'-এর দোকান থেকে চিকেন বার্গার, আলুভাজা আর কোল্ড ড্রিঙ্কস্ কিনতে কিনতেই আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে প্লাটফর্মে। তড়িঘড়ি গিয়ে বসলাম ট্রেনে। এই ট্রেনটা একতলা, আগেরটার থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট, অনেকটা ট্রামের মতো; যদিও কামরাগুলোর সজ্জা, পরিচ্ছন্নতা এবং আরাম নিয়ে কিছু বলার নেই। ট্রেন ছাড়লো কাঁটায় কাঁটায় ১১.১০-এ; এঙ্গেলবার্গ পৌঁছবে ১১.৫৩-য়। অর্থাৎ লুসার্ন থেকে এঙ্গেলবার্গ অবধি পথ যেতে সময় লাগবে ৪৩ মিনিট।

সবুজ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে স্বপ্নের ট্রেনযাত্রা

লুসার্ন থেকে ট্রেন চলেছে ঝিকিঝিকি। ট্রেনে তেমন ভীড় নেই। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা চলেছি অপূর্ব সুন্দর লুসার্ন লেকটার গা বেয়ে। লেকটা যে কত বড় এবার তার আন্দাজ পাচ্ছি। শহর ছাড়িয়ে ট্রেন একটু ফাঁকায় পড়লে গুছিয়ে বসে আহার্য্য বস্তুগুলোর সদ্ব্যবহার করা হল; আমাদের তরুণী সহযাত্রীনীটির সঙ্গেও আলাপ জমল। আমার মেয়ের সঙ্গে তার হাসি আদানপ্রদান অনেকক্ষণ থেকেই চলছিল; এবার কথা বলে জানলাম সে এঙ্গেলবার্গেরই বাসিন্দা। এঙ্গেলবার্গে এখন বরফ পাওয়া যাবে কিনা, শীতে সেখানে তাপমাত্রা কত হয়, তিত্‌লিস কতদূর ইত্যাদি তথ্য তার থেকে সংগ্রহ করা গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন স্টানস্ পৌঁছেছে; স্টানস্ জায়গাটা লেকের অপর প্রান্তে অবস্থিত একটা গ্রাম, গড় উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফুট। স্টেশনটা ছোট, দুপাশে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি দেখা যাচ্ছে; ট্রেন স্টানস্ ছাড়তেই বুঝতে পারলাম আমরা প্রবেশ করতে চলেছি আল্পস্-এর একান্ত আপন জাদুরাজ্যে! প্রকৃতি কখন যেন তার কুয়াশার মুখোশ নিজে হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে; শাণিত সোনারং রোদে ভেসে গেছে চারদিক। নীল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাহাড় ও কনিফার বন আর সেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা অনন্ত প্রসারিত সবুজ ঘাসের মখমলী প্রান্তর যেন হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে গেছে রেললাইনের দুদিকে। সেই নিষ্কলঙ্ক সবুজের রাজ্যে ইতিউতি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট সাদা অথবা কালচে খয়েরীরঙা একতলা দোতলা কাঠের বাড়ি; বাড়ির বারান্দায় ঝলমল করছে লাল কমলা অথবা বেগুনীরঙা মরশুমী ফুল; গলায় ঘন্টা বাঁধা গোরু এদিক সেদিক চড়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও আবার পাহাড়ের অনেক ওপরে একলা একটা বাড়ি আর সেখান থেকে নীচে নামার ব্যবস্থাস্বরূপ হাতে দড়ি টানা ছোট্ট ব্যক্তিগত রোপওয়ে।

ট্রেন এগিয়ে চলেছে আর আমরাও জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয়েছি প্রকৃতির অপার বিস্ময়ের জগতে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম এই দিগন্তবিস্তৃত সবুজের বুক চিরে চলা আমাদের রেললাইনটার পাশাপাশি সমান্তরালে দৌড়ে চলেছে একটা সড়কও; ফাঁকা সড়ক দিয়ে মাঝেমধ্যেই হুশহাশ চলে যাচ্ছে এক-আধটা গাড়ি। দুপাশে বাড়িঘর এবার বেশ কমে এসেছে; শুধুই নিরবচ্ছিন্ন ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, পাহাড় আর পাইন-জুনিপারের বন। হঠাৎ দেখি যেন আরেক পরত পর্দা সরে গিয়ে সবুজ পাহাড়গুলোর পেছন থেকে মাথা তুলে দিয়েছে বরফের টুপি পরা ধূসর বর্ণের আকাশছোঁয়া আল্পস! এখানে এখনও বরফপাত শুরু হয়নি, তাই পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশই ন্যাড়া, ছাইরঙা; শুধু পাহাড়ের মাথা আর গিরি-শিরাগুলো বরফে ঢাকা আর সেই বরফের ওপর রোদ লেগে অভ্রের মতো চিকচিক করছে। এত কাছে একইসঙ্গে বরফঢাকা পাহাড়, তার বুকে সবুজের অক্লান্ত প্লাবন এবং তারও বুক চিরে আমাদের এমন রোমাঞ্চকর রেলযাত্রা - এই ত্রহ্যস্পর্শে যারপরনাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি; এমন দৃশ্য আগে সিনেমার পর্দাতেই দেখেছি। আর আজ স্বয়ং আমরাই এই ঘটমান বাস্তবের নায়ক-নায়িকা-শিশুশিল্পী!

পাইনের জটলা

ট্রেন খেলনাগাড়ির মতো মিষ্টি একটা সিটি বাজিয়ে একের পর এক ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম্য স্টেশন পেরোচ্ছে; অনেক উঁচুতেও উঠে এসেছে সেই সঙ্গে। এখানে আকাশ অদ্ভুত নীল। স্টেশনের নামগুলোও ভারী অদ্ভুত সুন্দর - ড্যালেনউইল, নিয়েডেরিকেনবাক্, ওলফেনস্কিয়েসেন্; এর মধ্যে আবার নিয়েডেরিকেনবাক্ স্টেশনে 'স্টপ অন রিকোয়েস্ট।' অর্থাৎ যদি কেউ ওই স্টেশনে নামতে চায় তবে সে ঘন্টা বাজালেই চালক ট্রেন থামাবে নচেৎ ওই স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে না। এঙ্গেলবার্গের দিকে যত এগোচ্ছি পাহাড়গুলোর কোলে বরফ তত বাড়ছে; বরফের রাজ্যের কাছে এসে পড়েছি যে! এতক্ষণ পাহাড়গুলো একবার ট্রেনের ডানদিক একবার বাঁদিক থেকে লুকোচুরি খেলছিল; আর আমরাও প্রায় ফাঁকা ট্রেনে এপাশ ওপাশ দৌড়ে বাকী যাত্রীদের বেশ চিত্তবিনোদন করছিলাম। এবার ট্রেনের দুদিকেই পাহাড়, দুদিকেই বরফ, দুদিকেই আল্পস্!

এঙ্গেলবার্গ-এ পা

ট্রেন গ্র্যাফেনর্ট স্টেশন পেরোলো। এর পরই এঙ্গেলবার্গ। নামার অপেক্ষায় গুছিয়ে বসেছি। গ্র্যাফেনর্ট পেরোতেই ট্রেন ঢুকে পড়লো টানেলে; টানেল বেশ লম্বা, চলছে তো চলছেই। পরে জেনেছিলাম গ্র্যাফেনর্ট থেকে এঙ্গেলবার্গ পর্য্যন্ত পথের চড়াই ঢালটি অত্যন্ত খাড়া আর তাই সেই পথকে পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের পেটের ভেতর দিয়ে এই টানেল-পথের ব্যবস্থা। টানেল শেষ হল, ট্রেন ছোটোখাটো ছিমছাম এঙ্গেলবার্গ স্টেশনে ঢুকেছে। এটাই শেষ স্টেশন; ট্রেন এখানে পুরো খালি হয়ে গেল। আমরাও ধীরে সুস্থে নেমেছি আর নেমেই বাকরুদ্ধ! দেখছি, আমরা এসে দাঁড়িয়েছি প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টির বুকের ঠিক মধ্যিখানে। যেখানটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার চারদিকে যতদূর চোখ যায়, গ্রামটাকে ঘিরে আছে আল্পসের উত্তুঙ্গ প্রাচীর; আর সেই পর্বতশ্রেণীর স্তরে স্তরে বিচিত্র রঙের খেলা। সামনের দিকের পাহাড়গুলো ঢেউখেলানো ঘাসের ঢালের রং মেখে পেলব সবুজ; তারই মধ্যে মধ্যে পাইন জঙ্গল তার ঘন কালচে সবুজ অথবা হলদে-খয়েরী রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে এখানে সেখানে। সবুজের গায়ে পাইন জঙ্গলের কোলে রূপকথার গল্পে পড়া পরীর দেশের মতো সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। পাহাড়ের গায়ে পাইন গাছেদের জটলা যেখানে শেষ হয়েছে, তার ওপরে আর কোনো বড় গাছ নেই; পাহাড় সেখানে ন্যাড়া ন্যাড়া, ধূসর সবুজ বর্ণের। সবুজ পাহাড়গুলোর পেছনে মাথা উঁচিয়ে বিছিয়ে রয়েছে বরফমাখা তিত্‌লিস এবং আরও কত নাম-না-জানা চূড়া। তারও ওপরে শুধুই দরাজ নীল আকাশের গায়ে সাদা ধোপদুরস্ত মেঘেদের চিলতে তুলির আঁচড়।

এঙ্গেলবার্গ গ্রাম

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়েছি; দুপাশে অনেক ছোট-বড় ঝকঝকে হোটেল, দু-তলা তিন-তলা বাড়ি, রেস্তোরাঁ, বসার জন্য রাস্তার ধারে বাঁধানো বেঞ্চ; সদ্য আগত আমাদের ট্রেনটার যাত্রী ছাড়া খুব বেশি মানুষজন নেই রাস্তায়। রাস্তা, যেন কুটোটি পড়ে নেই এমন তকতকে। আমরা ডানহাতি রাস্তা ধরে এগোচ্ছি; হোটেলগুলো ছাড়িয়ে একটু ফাঁকায় পড়তেই পেছন ফিরে দেখি ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে অনেক ওপর পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ছড়িয়ে আছে এঙ্গেলবার্গ গ্রামটা। এখন সূর্য মধ্য গগনে, তাই গোটা গ্রাম রোদ ঝলমল করছে; আর গ্রামের পেছনদিকে চালচিত্রের মতো সবুজ-সাদা পাহাড়ের রেখার কাছে যেন বিশাল বিশাল ডানা ভাসিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একদল লাল, কমলা, গোলাপী, বেগুনী রঙের পাখি! এই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম প্যারাগ্লাইডিং। চমৎকৃত হয়ে আরও কিছুক্ষণ মনুষ্য-পক্ষীদের উড়ান পর্যবেক্ষণ করে পা বাড়িয়েছি সামনের দিকে; সামনেই দেখি আমাদের রাস্তাটা এসে মিশেছে একটা মোম-মসৃণ চওড়া সড়কে; এটাই ট্রেনলাইনের পাশে পাশে ছুটে আসা সেই সড়কটা, এখন গ্রামটাকে লম্বালম্বি চিরে দিয়ে দুপাশে পাহাড় নিয়ে এগিয়ে গেছে সামনের গা ছমছমে গাঢ় সবুজ পাহাড়গুলোর দিকে। রাস্তার দুপাশে চওড়া ফুটপাথ, তারপর কাঁটা তারের বেড়া। রাস্তার একদিকে বেড়ার ওপাশে ঘাসের গালচে, আরও দূরে সারিবদ্ধ সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ি আর তার পেছনে ট্রেনলাইন, স্টেশনবাড়ি; রাস্তার অপর পাশে কাঁটাতার পেরোলেই খানিকটা ঘাসজমির পর গাড়ি পার্কিং এর জায়গা, একটা পায়ে চলা পথ আর তারপরই শুরু সেই মখমল সবুজ ঢালের পাহাড়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সুসংবদ্ধ পথনির্দেশ, ট্রাফিক সিগনাল। প্রায় ফাঁকা রাস্তাতেও কেউ সেই নিয়মভঙ্গ করে রাস্তা পারাপার করছে না। ছোটবেলা থেকে আমাদের মনে গ্রাম বললে যে ছবি ভেসে ওঠে তার পাশে এঙ্গেলবার্গকে রেখে সত্যিই চমকে উঠছিলাম। এ গ্রামে প্রাকৃতিক নিসর্গের সঙ্গে আধুনিক জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থার মেলবন্ধন হয়েছে; এ গ্রামে পাহাড়চূড়াকেও সহজগম্য করে দিয়েছে আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তক্ষেপ; এ গ্রাম যেন হাতের মুঠোর মধ্যে ধরতে পারা এক স্বপ্নরাজ্য!

রাস্তার ওপাশ থেকে আমাদের টানছে ওই নরম সবুজে মোড়া, পাইনের গন্ধ মাখা আলোছায়া ভূখন্ড। বড় রাস্তা পার হয়ে আমরা ছোট পায়ে চলা রাস্তায় চলে এলাম; তারপর জোরকদমে পা চালিয়ে এক্কেবারে সেই সবুজের কোলে। দূর থেকে বুঝতে পারিনি, এখন কাছে এসে দেখি ঘাসের মধ্যে ফুটে আছে কতশত নাম না জানা ছোট ছোট সাদা হলুদ বুনো ফুল; সবুজ সাম্রাজ্যের শোভা তাতে বেড়েছে বই কমেনি। ভিজে ভিজে ঘাসের নরম গালচে এখানে এত মসণ, ইচ্ছে করছে ঘাসে পা ডুবিয়ে দৌড় লাগাই বল্গাহীন। ঢালু বেয়ে বেশ কিছুটা উঠলাম; চারদিক শান্ত, নিস্তব্ধ; সামনেই একটা লালচে খয়েরী রঙের দোতলা কাঠের বাড়ি। তার কিছুটা পেছন থেকেই শুরু হয়ে গেছে পাইন জঙ্গল। আরও নানারকম গাছও আছে যদিও, দূর থেকে আলাদা করে তাদের পরিচিতি বোঝা যাচ্ছে না; শুধু তাদের হালকা সবুজ, ধূসর, হলদে আর উজ্জ্বল কমলা রং পাইনের কালচে সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে পাহাড়ের ক্যানভাসে যেন রঙের হোলি খেলেছে।

দড়ি-পথে তিত্‌লিস

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। এইবেলা তিত্‌লিস যাত্রা শুরু না করলে সেখানে পৌঁছে আর কিছুই দেখা হবে না। ফেরার পথে এঙ্গেলবার্গে আরও কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছে নিয়ে বড় রাস্তাটায় ফিরে এলাম। পথনির্দেশ দেখে এগোলাম তিত্‌লিস যাওয়ার কেবল্ কার স্টেশনের দিকে। কিছুটা হাঁটার পরই দেখতে পেলাম দড়িতে ঝুলন্ত সারবাঁধা ছোট ছোট কেবল্ কার শূন্যে দোদুল্যমান অবস্থায় পাইন গাছগুলোর মাথা টপকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের ঢালটার ওপাশে; দেখেই বুক দুরুদরু করে উঠেছে; এর আগে যে কখনো রোপ ওয়ে-তে যাইনি এমন নয়। কিন্তু ৩,৩৫০ ফুট্ (এঙ্গেলবার্গের গড় উচ্চতা) থেকে ১০,০০০ ফুট্ অবধি ভীষণ খাড়াই পাহাড় বেয়ে ৪৫ মিনিটের কেবল্ কার যাত্রা এই প্রথম। গুটি গুটি গিয়ে বসলাম কেবল্ কারে। এই কারগুলো ছোট বাক্সের মতো, দুদিকে মুখোমুখি সীটে বসে মোট ছ-জন প্রাপ্তবয়স্ক একসঙ্গে যেতে পারে। বাক্সগুলোর উর্ধ্বাংশের চারপাশ কাচের, ফলে বহির্দৃশ্য দেখার কোনই অসুবিধা নেই। নির্দিষ্ট সীমানা পেরোবার পর কার-এর দরজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো। আমাদের সামনের কার-এ ছোট বাচ্চাসহ এক পরিবার; সেখানা হুশ্ করে দড়ি ধরে দৌড় লাগাতেই আবার আমার হৃৎকম্প, এবং সে হৃৎকম্প থামার আগেই দেখি সবেগে আমাদের যান-টাও কেবল্ কার স্টেশন থেকে শূন্যে বেড়িয়ে এসে আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিয়েছে!

কেবল্ কার থেকে দেখা এঙ্গেলবার্গ

কেবল্ কার স্টেশন থেকে বেড়িয়ে এসে আমরা এখন শূন্যে ঝুলে ঝুলে চলেছি পাইনগাছের জঙ্গলটার দিকে। আমাদের সামনে দড়িতে ঝুলন্ত অনেকগুলো কেবল্ কার নির্দিষ্ট ব্যবধান মেনে লাইন করে চলেছে দেখতে পাচ্ছি। পেছনে ফেলে আসা এঙ্গেলবার্গের লাল ছাদওয়ালা সাদা সাদা বাড়ি, চকচকে সর্পিল রাস্তা, কার পার্কিং, নীল জলের একটা টলটলে লেক, সব পাহাড়ের কোলে হাতে আঁকা ছবির মতো আলস্যভরে বিছিয়ে আছে। ক্রমে পাহাড়ের ওপরের ধাপে পাইন গাছগুলোর মাথার ওপর পৌঁছে গেছি; পায়ের তলায় কালচে সবুজের ঠাসা বুনট্ পেরিয়ে একসময় জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে দড়ি-পথ। এখানটায় কিছু গাছ কেটে রোপওয়ে-র জন্য সরু রাস্তা বের করা হয়েছে। জায়গাটা ঠান্ডা, থমথমে, প্রায়ান্ধকার; সূর্যের আলো পাইনের ঠাসবুননি ভেদ করে ঢুকতে পারেনি এখানটায়। পাইনের ডাল প্রায় আমাদের কেবল্ কারের জানলা ছুঁয়ে যাচ্ছে; হাতের কাছে ঝুলছে পাইনের খয়েরী খয়েরী কোন্। পাইনজঙ্গল পার হয়ে দুটো পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা সবুজ প্রান্তরের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছি। নীচে ছাড়া ছাড়া ছোট দু একটা ঘর, একটা সরু রাস্তা, গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে কেবল্ লাইনটা একটু নীচে নেমে এসেছে। এমনিতে কার-গুলোর গতিবেগ খুব বেশি নয়, বেশ সহনীয়; শুধু কেবল্ সংযোগকারী খুঁটিগুলো পেরোবার সময় ঝুলন্ত বাক্সগুলোর গতি বেড়ে গিয়ে সেগুলো হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠছে। এখন অবশ্য ভয়ের বদলে এই দড়ি যাত্রা খুবই উপভোগ্য এবং রোমাঞ্চকর লাগছে আমাদের। ফাঁকা জায়গাটা পার হতেই পরবর্তী আরও উঁচু একটা পাহাড় শুরু আর কেবল্ লাইনটাও আচমকা প্রায় আশি ডিগ্রি কোণ করে উঠে গেছে সেদিকে। সেই উঁচুতে উঠে দেখি আমাদের পেছনে অনেক নীচে লাইন করে আসা কেবল্ কারগুলোকে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। তাদের নীচে পাহাড়ের ছায়া মেখে শুয়ে আছে দু পাহাড়ের মাঝের সেই ফাঁকা ভূখন্ড; আরও পেছনে রোদমাখা এঙ্গেলবার্গ; পাইনগাছগুলোকে এখান থেকে ঝোপের মতো লাগছে। রোদ-ছায়া'র খেলায় চারদিকের বরফশৃঙ্গ, তাদের কোলের কাছের সবুজ পাহাড় আর তারও নীচের পাহাড়তলি অপরূপ মোহময় লাগছে।

ছোট কেবল্ কার Gerschnialp স্টেশন পার হয়ে ৫৯০০ ফুট উচ্চতায় ট্রাবসী স্টেশনে নামিয়ে দিল আমাদের। এখান থেকে অন্য একটা কেবল্ কার যাবে পরবর্তী স্টেশন স্ট্যান্ড পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার অন্য আর এক ধাপে তিত্‌লিস। ঝুলন্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কিছুটা অপেক্ষা করতেই ওপরের স্টেশন থেকে লোক নিয়ে মসৃণ দ্রুতগতিতে নেমে এলো তিত্‌লিস লেখা লাল রঙের কেবল্ কারটা। এতবড় একটা যান যে শূন্যমাধ্যমে দড়িতে ঝুলে ঝুলে এত লোক বহন করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হোত না! যানটা আকৃতি এবং আয়তনে একটা বাসের সমান; লোকধারন এবং ভারবহন ক্ষমতাও সেই অনুপাতে। দেখতে পাচ্ছি ভেতরে ঠাসাঠাসি মানুষদের ভীড়; তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের পোষ্য সারমেয় এবং লম্বা লম্বা স্কী আর স্কী স্টীক। উল্টোদিকের প্লাটফর্ম দিয়ে তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের দিকের দরজা খুললো। এখন ওপরের দিকে যাওয়ার লোকজন কম, তাই আমাদের কেবল্ বাসটা বেশ ফাঁকা ফাঁকাই ট্রাবসী ছাড়লো। বাসের চারপাশটা পুরোটাই কাচের; তাই ৬০০০ ফুট উচ্চতার এই যাত্রায় চলমান আমাদের চারপাশ দিয়েই সতত সঙ্গ দিচ্ছে বরফস্নাত আল্পস্। ছোট কেবল্ কারে থাকতে থাকতেই নীচের পাহাড়ের প্রকৃতি বদলাতে দেখছিলাম; এখন দেখি পায়ের নীচে ন্যাড়া ন্যাড়া ধূসর সবজেটে পাহাড় আর তার গায়ে এখানে সেখানে ছোট ছোট বরফের ছোপ; যত ওপরে উঠছি, বরফ ততই বাড়ছে। সামনেই অনন্ত বরফরাজ্য; আর অনেক নীচে সেই বরফের ছায়া পড়েছে নীল নির্জন ট্রাবসী লেকে।

৮০০০ ফুট উঁচুতে স্ট্যান্ড স্টেশন থেকে যখন শেষ ধাপের কেবল্ কার-টায় চাপলাম তখন চারপাশে শুধুই বরফ। এটার নাম তিত্‌লিস রোটেয়ার (Rotair) আর এটার বিশেষত্ব হলো এটা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান কেবল্ কার। স্ট্যান্ড থেকে তিত্‌লিস চূড়া পর্য্যন্ত যেতে সময় লাগবে পাঁচ মিনিট। এই পাঁচ মিনিট পথ রোটেয়ার ৩৬০ ডিগ্রি কোণে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উঠবে এবং আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত করতে থাকবে চারপাশের ক্রমচলমান দৃশ্যপটের অমল ধবল রূপ। রোটেয়ার যাত্রা শুরু হল; সাদা নীল রঙের গোল রোটেয়ারটা বেশ বড়; তার কেন্দ্রস্থলে চাকতির মতো পাটাতনের ওপর ছোট্ট একফালি বসার জায়গা। সেটায় বসে স্পষ্ট বোঝা গেল নীচের পাটাতনটা ঘুরছে। আমরাও এক জায়গায় বসে বসেই পর্যবেক্ষণ করছি কখনো চারপাশের রোদ ঝলসানো বরফরাজ্য, কখনো দূরদূরান্তের অন্তহীন পর্বতশ্রেণী, আবার কখনো বা খাড়া পাথুরে প্রাচীরের কিনারে গভীর অতলান্ত খাদ। কিছুটা যাবার পর দেখি সামনেই যেন পাহাড়টা শেষ। পাহাড়ের মাথায় বরফের ওপর বড় বড় বিদ্যুতের টাওয়ার এবং অন্যান্য ধাতব নির্মাণ দেখা যাচ্ছে। ওপর দিকে তাকালে এখন শুধুই নীল আকাশ আর পায়ের নীচে, সামনে, চোখ ধাঁধানো নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা বরফের রাশি। সেই বরফের ওপর রংবেরঙের পোশাক পরা লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম তিত্‌লিসে এসে গেছি।

তিতলিস রোটেয়ার

দশহাজার ফুটে ফটো-সেশন এবং হিমবাহ গুহায় পদস্খলন

পাহাড়চূড়ায় পৌঁছলাম। এই পাহাড়চূড়োর উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১০,০০০ ফুট। রোটেয়ার থেকে তিতলিস স্টেশনে নামা হলো; পাহাড়ের মাথায় একটা বিরাট পাঁচতলা বাড়ির একতলা বা লেভেল ওয়ান-এ রোটেয়ার স্টেশনটা; স্টেশন থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে একটা বড় হলের মতো জায়গায় এসে পৌঁছলাম। একদিক দিয়ে সুপ্রশস্ত লিফট উঠে গেছে বিভিন্ন লেভেলে। প্রতিটা লেভেলে কী কী দ্রষ্টব্য তা লেখা আছে লিফ্টের সামনে যাতে ট্যুরিস্টরা সহজে তাদের পছন্দমাফিক গন্তব্য বেছে নিয়ে সঠিক লেভেলে পৌঁছে যেতে পারে। হলের অন্যদিকে বেশ সুন্দর ঝলমলে গিফট শপ; আরও অনেকগুলো করিডোর বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। পুরো জায়গাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত; যার ফলে বাইরে তাপমান শূন্যের কাছাকাছি হলেও ভেতরটা আরামদায়ক। ব্যাপারস্যাপার দেখে আমাদের তো চক্ষু চড়কগাছ! দশহাজার ফুট উঁচু পাহাড়চূড়ায় একমাত্র কোনো ময়দানবই বোধহয় এমন কান্ডকারখানা বানিয়ে রাখতে পারে।

তিতলিস

আমাদের প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ পাহাড়চূড়োর রোদমাখা সাদা বরফের রাশি। তাই অপেক্ষা না করে লিফটের সর্ব্বোচ্চ লেভেলের বাটনটা টিপে দিলাম। নির্ধারিত তলে পৌঁছে লিফট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে তাকাতেই খুশীতে প্রাণ থইথই! লিফটের সামনের করিডোরটাই ডানদিকে সোজা গিয়ে মিশেছে খোলা আকাশের নীচে বিছিয়ে থাকা বরফরাশিতে। করিডোরটা মানুষজনের পায়ে পায়ে চলে আসা বরফে ভিজে ভিজে এবং বেশ পিছল; জুতোর তলায় লাগছে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ; পা টিপে টিপে অনতিদীর্ঘ পথটা পেরিয়েই পা রাখলাম তিতলিস এর বরফমাখা মাথায়। পাহাড়ের মাথাটা বেশ ছড়ানো; এখন পায়ের নীচে শুধুই সাদা বরফ আর মাথার ওপর নীল আকাশ।পেছনে তিনদিক জুড়ে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে আছে আল্পসের অনিন্দ্যসুন্দর তুষারাবৃত সব গিরিশিখর। আর এখান থেকে সামনের দিকে তাকালে চোখে পড়ছে ধাপে ধাপে নীচে নেমে যাওয়া বরফের প্রান্তরের মধ্যে শুয়ে থাকা বরফজমা একটা লেক, তারও নীচের ঘন ছায়াচ্ছন্ন নীল পাহাড়ের সারি, কেবল কার-এর লাইন আর অনেক নীচ থেকে ওপরে উঠে আসতে থাকা ছোট্ট গোল রোটেয়ারটা।

বরফের ঢাল বেয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোচ্ছি; ঠান্ডা বেশ থাকা সত্ত্বেও খাপখোলা ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে রোদে এখনও তা টের পাইনি। দেখছি চারদিকে বহু ভাষাভাষী মানুষের আনন্দমেলা; তার মধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় পরিবারও আছে; সবাই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। ভারতীয় পরিবারগুলোর সঙ্গে অচিরেই আলাপ জমে গেছে; তারা আমাদের এবং আমরা তাদের ছবি তুলে দিলাম। সম্মিলিত ছবিও তোলা গেল। এবার দেখি ডানদিকে একটা খোলা রেস্তোরাঁ; তিতলিসের মাথায় বসে আল্পসের রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে ঠোঁট ছোঁয়ানো যাবে নরম-গরম পানীয়ে; বরাফ্ত হিমবাহর বুকে বসে স্বাদ নেওয়া যাবে পিৎজা-পাস্তার। আর একটু এগোতেই সামনে বরফের ওপর নানা রোমাঞ্চকর খেলার আয়োজন। কোথাও পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে বিদ্যুতগতিতে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে স্কি; কোথাও বা খোলা বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে আইস স্লায়ার নামক খোলামেলা রোপওয়েতে চেপে লোকজন তরতরিয়ে চলেছে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে। এবার চললাম তিতলিসের আর এক অনন্য আকর্ষণ ক্লিফ ওয়াক-এ; পায়ের নীচে তিতলিস হিমবাহ আর অতল খাদ নিয়ে ৩২০ ফুট লম্বা আর মাত্র তিন ফুট চওড়া একটা ঝুলন্ত সেতু চলে গেছে এক পাহাড় থেকে আরেকটায়। শুধুমাত্র পদযাত্রীদের জন্য তৈরি এই ব্রীজ ইওরোপের সর্ব্বোচ্চ ঝুলন্ত ব্রীজ। ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় এই দোলায়মান হন্টন অভিজ্ঞতার নামই ক্লিফ ওয়াক। ইস্পাতের মজবুত তার দিয়ে বাঁধা আর মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা কুচি কুচি বরফমাখা দোদুল্যমান ঝুলন্ত সেতুটায় পা দিয়ে একইসঙ্গে রোমাঞ্চ আর হৃৎকম্প হচ্ছিল; কিন্তু চোখের সামনে উদ্ভাসিত অপ্রতীম আল্পস্ আর পায়ের নীচের অতলস্পর্শী গিরিখাতের শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য সবকিছু ভুলিয়ে দিল।

পাহাড়চূড়োয় ফটোসেশন এবং ক্লিফ ওয়াক সেরে অন্যান্য ফ্লোরগুলোর দিকে পা বাড়ালাম। একটা ফ্লোরে দেখি বহু নামীদামী চিত্র তারকা, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি কীর্তিমান ব্যক্তিদের ছবি; এরা সকলেই তিতলিসে পা দিয়েছেন কোনো না কোনও সময়।

এবার গন্তব্য Glacier Cave বা হিমবাহ গুহা। এটি তিতলিস হিমবাহর গভীরে, বরফ-তলের কুড়ি মিটার নীচে দিয়ে বানানো দেড়শ মিটার লম্বা এবং বহু শাখাসমন্বিত এক গুহা বা সুড়ঙ্গ যার ভেতরের বরফের পরিমন্ডল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। প্রথম তলে নেমে চলমান জনস্রোতকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে; একটা স্লাইডিং দরজা পেরোতেই গা ছমছমে এক শীতল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি! সামনেই নীলাভ আলো মাখা মায়াবী এক বরফ-সুড়ঙ্গ এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে আরও গভীরে। সুড়ঙ্গে পা রাখতেই বিষম বিপত্তি ঘটল; কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার পদস্খলন এবং সশব্দ পতন। আমার কর্তা মেয়েকে সামলে বেশ কিছুটা পেছনে; সে এসে পৌঁছবার আগেই সহৃদয় এক তরুণের বাড়ানো হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছি; ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ের নীচের মেঝেটা কাচের মতো মসৃণ বরফের, এবং সেই পিচ্ছিল মেঝেই আমার পতনের কারণ। এবার সাবধান হয়ে সুড়ঙ্গের একপাশের রেলিং ধরে ধরে অনেকটা স্কেট করার ধরণে এগোচ্ছি। এখানে তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের অনেকটা নীচে; কথা বললে মুখের সামনে পাতলা মেঘের মতো ধোঁয়া জমে যাচ্ছে; নাকের ডগাটুকু মনে হচ্ছে আর স্বস্থানে নেই। হিম হিম নীল আলোয় সুড়ঙ্গের দেওয়ালে বরফের ছোট্ট ছোট্ট ক্রিস্টাল ঝলমল করছে। অবাক হয়ে ভাবছি, যে হিমবাহটার ওপর এইমাত্র বরফ ছুঁড়ে খেলা করে এলাম, এখন তারই বুকের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি এক রোমাঞ্চকর অভিযানে!

ফেরার পালা

নির্ধারিত সময় শেষ। এবার প্রত্যাবর্তন। দড়িপথে তিতলিস থেকে আবার নেমে এসেছি নীচে। এঙ্গেলবার্গ এখন শেষ বিকেলের নরম আলোয়

তিতলিস গ্লেসিয়াল কেভ

ছায়াচ্ছন্ন। শুধু চারপাশের পাহাড়গুলোর মাথায় সোনালী রোদ লেগে আছে; ঠান্ডাও দেখলাম বেশ জাঁকিয়ে বেড়েছে। লুসার্নগামী ট্রেনের এখনো কিছুটা দেরী, তাই আমরা হেঁটে চলে এলাম রোপওয়ে স্টেশনের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ী নদীটার ধারে; যদিও একে নদী না বলে ঝোরা বললেই যেন বেশি মানায়! পাহাড় থেকে নেমে আসা বরফগলা জল নিয়ে স্বচ্ছ ঝোরাটা বয়ে যাচ্ছে ঝরঝর করে। আসন্ন সন্ধ্যার আলোমাখা গুরুগম্ভীর পাহাড়গুলোর কোলে চঞ্চল পাহাড়ি ঝোরাটাকে ভারী ভালো লাগছিল।

ট্রেনের সময় হয়ে গেল। একই পথে আবার ফেরা লুসার্ন হয়ে জুরিখ। জানলার ধারে বসে শেষবারের মতো চোখ ছুঁয়ে দেখে নিলাম দিন শেষের কোমল গোলাপী রঙ-মাখা অতুলনীয় আল্পস্-কে। আগামীকাল আবার নতুন যাত্রাপথ, নতুন গন্তব্য; তবু এই দেখাটুকু পুরোনো হতে হতেও চিরন্তন থাক।

এঙ্গেলবার্গ গ্রামে প্যারাগ্লাইডিং

~ *স্যুইৎজারল্যান্ডের আরও ছবি* ~

সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য পেশায় উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও গবেষক। ভালোবাসা পরিবারের সঙ্গে বেড়ানো, গল্প-উপন্যাস ও কবিতা পড়া এবং অল্পস্বল্প লেখালেখি। মনুষ্যনির্মিত ঝাঁ চকচকে কীর্তি নয়, আকর্ষণ করে নির্জন উন্মুক্ত অনাবিল প্রকৃতি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

স্মৃতির ম্যাকলাস্কিগঞ্জ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

হাওড়ার বড় ঘড়ির তলায় জমায়েত হতে লাগলাম একে একে আমি, তাপস, শোভন আর শোভনের বন্ধু পার্থ। পার্থ ছিল একটু ফিটফাট সিরিয়াস গোছের, দেখি সে একটা এট্যাচি গোছের সুটকেস নিয়ে জুতো মোজা পরে এসছে। আমরা তো সারা কলেজ জীবনে কোনদিন জুতো মোজা পরিনি তারপর বেড়াতে যাচ্ছি বন্ধুরা মিলে তায় আবার সুটকেস, তাতে আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার। লেগে গেল তাপসের সঙ্গে। যত বোঝাই তোর কী অসুবিধে সে বুঝবে না। যাই হোক শেষমেশ দুগগা, দুগগা বলে শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। রিজার্ভেশন ছিল কিনা এতদিনে সে আর মনে নেই, না থাকার চান্স বেশি তবে ট্রেনটা বেশ ফাঁকাই ছিল সেটা মনে আছে। যাব অনেক দূর, পৌঁছব মাঝরাতে এসব জানতাম তবে থাকার জায়গা টায়গা কিছু ঠিক ছিল না আর সে আমাদের কোন এসব চটজলদি ভ্রমণে করা হত না।

ধানবাদ থেকে ট্রেন হঠাৎ করে কোথায় বেঁকে গেল আর সব নাম না জানা ষ্টেশন অন্ধকারে মাঝে মাঝে উদয় হতে লাগল - চন্দ্রপুরা, ভান্দারিদা, বোকারো, বারমো, গুমিয়া, বরকাখানা ইত্যাদি। এই রাস্তায় আগে কোনদিন আসিনি তাই ঠিকঠাক ষ্টেশনে নামতে পারব কিনা সেটা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিল। কোন এক সহৃদয় ব্যাক্তি যিনি কিনা এই রাস্তার খোঁজ রাখেন বললেন পাত্রাতু, রে, খালারি এই তিন ষ্টেশনের পরেই তোমাদের গন্তব্যস্থল। যথা আজ্ঞা বলে ট্রেন ষ্টেশনে থামতে আমরা নেমে পড়লাম,তখন রাত ১২ টা বেজে গেছে, সারা ষ্টেশনে চাঁদের আলো লুটোচ্ছে, আমরা চারজন ছাড়া আর একটা দল নামল, আর কেউ নেই। সিগন্যাল হতে ট্রেন দূরের পাহাড়, চাঁদের আলো, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আরেকটা দল তারাও ট্যুরিষ্ট মনে হয় ব্যাপক হৈ হল্লা করতে করতে ভাল্লুক আছে ভাল্লুক আছে বলতে বলতে তাদের কোন আগে থেকে ঠিক করে রাখা গন্তব্যর দিকে রওয়ানা হল। আমরা আর ওই রাত্রে কোথায় ঘর, হোটেল খুঁজতে যাব? চল ষ্টেশনমাস্টারের কাছে - আজ অব্দি গল্প, সিনেমাতে যত ষ্টেশন মাস্টার দেখছি তারা খুব ভাল মানুষ, দয়ালু, একটু প্রকৃতিপ্রেমী হন, সুতরাং ইনিও এমন হবে আশা করে গেলাম। মানুষটা সাদাসিধে, বললেন, এই রাত্রে তো কিছু পাবেন না, এ তো আর রাঁচি, হাজারিবাগ নয়, তাই রাতটা ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দিন, সকাল হলে থাকবার জায়গা খুঁজে নেবেন। খাবার পাওয়ার কোন চান্স নেই সেটা বোঝা গেল আর আমরা রাস্তায় রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম সেটাই বাঁচোয়া।

ওই একরত্তি ষ্টেশন তার রিটায়ারিং রুম! যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু আদতে দেখা গেল বিছানাপত্র না থাকলেও মোটামুটি আয়োজন ভালই। একটা হলুদ ২৫ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে, বসবার জন্য কিছু লম্বা চেয়ার, একটা টেবিল। অক্টোবর মাস, তায় ঝাড়খণ্ডের ঠাণ্ডা, কোনমতে চাদর সোয়েটার মুড়ি দিয়ে খানিক জেগে, খানিক ঘুমিয়ে হঠাৎ দেখি সকাল হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা তো অবাক, একটা ষ্টেশন, একটা রেললাইন, পরিষ্কার নীল আকাশ, একটা সিগন্যাল পোস্ট, কিছু ঝাঁকড়া গাছ, কয়েকটা পাহাড় - যেন একটা বড় ক্যানভাসে আঁকা ছবি। পেছন ফিরে দেখি আর একটা ক্যানভাস, ডানদিকে আর একটা, বাঁদিকে আর একটা।

আমাদের বেরোতে হবে, প্রথম কাজ থাকার জায়গা তারপর ব্রেকফাস্ট।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা বাঁদিকে চলে গেছে সে রাস্তায় প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে একটা বোর্ডিং স্কুল, সেটা এখন বন্ধ, তার প্রিন্সিপ্যাল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, পাশেই থাকেন,তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। জানা গেল, স্কুল ছুটির সময়টায় ওনারা এখানে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের থাকতে দেন। সুতরাং আমরাও জায়গা পেলাম। বেশ ঘরগুলো - এক এক ঘরে ছ-আটটা করে সিঙ্গেল বেড। তারই একটা ঘর পেলাম আমরা। সামনে বেশ সুন্দর একটা বাগান, ক্লাসরুম পরিষ্কার,পরিচ্ছন্ন।

সকালে গরম পুরি, তরকারি আর চা, কোথাও বেড়াতে গেলে এটা পাওয়া গেলে নিজেকে কেমন রাজা রাজা মনে হয়।

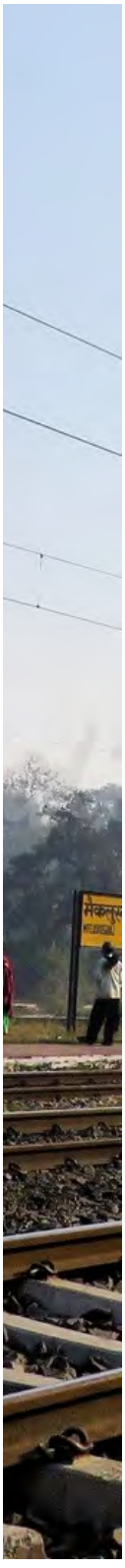

এমন স্টেশন আমি জীবনে দেখিনি। এ স্টেশনে কোন চা, পান, বিড়ির দোকান নেই, নেই কোন হকার কী ফিরিওয়ালা। আসলে যাত্রীই নেই কোনও। সমস্ত দিনে এখানে মোটে দুখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন, তার একটা আবার আমরা যে গভীর রাত্রের ট্রেনে এসেছি। স্টেশনটাও খুব মজার, বড় আপন। রেল লাইন থেকে মেরেকেটে একফুট উঁচু হবে। কিছু দূরে দূরে লাল পাথরের বসবার জায়গা তোমায় ডাকছে, আর আছে বড় বড় গাছ, তাঁদের ছায়ায় বসে খানিক জিরিয়ে নেওয়া।

সকালের ট্রেনটা যখন আসে কিংবা বিকেলের ট্রেনটা যখন যায় এই ফাঁকা স্টেশনটাই সরগরম হয়ে ওঠে, মেলা বসে যায়, কোথা থেকে ছেলে, বুড়ো, বুড়ি, জোয়ান, মরদ, মেয়ে সব হাজির হয়,কেউ পসরা সাজিয়ে বসে তাতে সবজি আছে, ফল আছে, আয়না, চিরুনি, জামা কাপড়, চাদর, খেলনা, বাঁশি সব আছে। অনেক মেয়ে আবার কোলে বাচ্চা নিয়ে, খোঁপায় ফুল টুল গুঁজে হাজির, কেউ একটা মাদুর কিনল কিংবা দেশি মুরগি, কেউ কিনছে কাঁচের চুড়ি কিংবা চুলের ক্লিপ। আমরা কিন্তু কিচ্ছু কিনছি না কিন্তু এই অসীম অনন্তের মধ্যে হঠাৎ কিছু মানুষ দেখে ভাল লাগছে খুব। আস্তে আস্তে দু একটা কেরোসিনের আলো জ্বালায় দোকানদাররা কারণ স্টেশনে যে দু একটা লাইট জ্বলে তাদের কৃপণ আলো চারপাশে পৌঁছয় না।

স্টেশনে ফিরলাম আবার, কারণ ফিরতেই হয়, এ এক অদ্ভুত টুরিষ্ট স্পট, এখানে কোন হোটেল রেস্টুরেন্ট হোর্ডিং দিয়ে বসে নেই, কোন ফাইভ পয়েন্ট ঘোরাবার জন্য গাইড নেই, স্টেশনে নামার সাথে সাথে দালাল কী রিকশাওয়ালা আপনাকে এই হোটেল চলুন সেই হোটেল চলুন বলে বিরক্ত করে না, এখানে একটা নদী, কিছু পাহাড়, একটা স্টেশন কী লেভেল ক্রসিং আর পায়ে চলার রাস্তা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে বসে আছে।
স্টেশনে পৌঁছে দেখি মহুয়ার আসর বসেছে, এদিক ওদিক চাঁদের আলোয় কিছু মানুষ দেখা যায় বটে। আমাদের সেই হস্টেলের কেয়ারটেকার সেও এসেছে,বলল বাবু খাবেন নাকি? একদম ফ্রেশ। ফ্রেশ যে সে তো গন্ধতেই মালুম হয়, মনে হয় গন্ধ সেই চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে, হাল্কা হাল্কা শীতে,সামান্য কুয়াশায় মিশে কী সেই অদ্ভুত শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশে চারদিক মাতাল করে তুলেছে, সুতরাং আমরাও বেশ একটা লাল বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

দূরে তখন সাঁওতাল গ্রামে সবাই নাচগান শুরু করে দিয়েছে, সেই অদ্ভুত গানের ধুন, সঙ্গে নানান বাজনার শব্দ ভেসে আসছে, সেই গ্রামেও লক্ষ্মী আসে। আস্তে আস্তে সেই গান, বাজনা, মহুয়ায় আমরা কখনও ভাসি কখনও ডুবে যাই, দূরে একটা মালগাড়ির হেডলাইট জ্বলে ওঠে, ঘটাং ঘটাং শব্দে চলে যায় সেই মালগাড়ি, এক, দুই, তিন, চার, একত্রিশ, বত্রিশ, উনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ আমি বগি গুনতে থাকি যেমন ছোটবেলায় গুনতাম।
আর উল্টোদিকের প্লাটফর্মে তখন এ অঞ্চলের বহুদিন আগেকার মানুষদের আত্মারা ফিসফিস করে কথা বলে...

বিশিষ্ট ছড়াকার আশুতোষ ভট্টাচার্য কলমে নামী-অনামী চেনা-অচেনা সকলের জন্মদিনেও চমৎকার ছড়া লিখে দেন। তাঁর কৌতুকময় ছড়ায় ধরা পড়ে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি। ছোটদের নিয়ে আঁকায়-লেখায় প্রতিবছর বাংলা নববর্ষে বানিয়ে ফেলেন চমৎকার ক্যালেন্ডার। ভালো গদ্যও লেখেন। আরও অনেক কাজের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন আশুতোষ, যার সব হদিস এখনও "আমাদের ছুটি' পায় নি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher